কথামৃত – চতুর্থ ও পঞ্চম পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথান

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ – 'সমাধিমন্দিরে'

এবং

সমাধিমন্দিরে - আত্মা অবিনশ্বর - পওহারী বাবা

২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ সাল, শুক্রবার; এই দিন ঠাকুর কেশব সেনের সঙ্গে জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, এই পর্বে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে আছেন। খবর দেওয়া হল কেশব সেন জাহাজে করে ঘাটে উপস্থিত হয়েছেন। জাহাজ মানে এখনকার দিনের স্টীমার। কেশবের শিষ্যরা ঠাকুরকে প্রণাম করে বলছেন, 'জাহাজ এসেছে, আপনাকে যেতে হবে চলুন'।

বর্তমান কালের যে লঞ্চ হয়, এটা তা না। তখন যে স্টীমার হত সেগুলো দোতালা তিনতলা হত। আর বড়লোকেরা ভ্রমণ করেন বলে জাহাজে কেবিনও থাকত। গঙ্গায় আগে রেলওয়ে স্টীমারগুলি চলত, তাতে প্রথম শ্রেনী, দ্বিতীয় শ্রেনী যাত্রীদের আলাদা ব্যবস্থা থাকত।

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন। সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যশূন্য! সমাধিস্থ!

ঠাকুরকে বাহ্যশূন্য দেখে কেশবচন্দ্র সেন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সকলেই ঠাকুরকে দেখার জন্য ব্যস্ত। জাহাজে ভিড় হয়ে গেছে। যাই হোক ঠাকুরকে জাহাজের কেবিনে নিয়ে বসানো হয়েছে, ঠাকুর সমাধিস্থ, কোন হুঁশ নেই, সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য। যে ঘরে ঠাকুরকে বসানো হয়েছে সেখানে অনেক লোকজনের ভিড়। আর এমনই কপাল যে, বিজয়ও সেখানে উপস্থিত আছেন। সেই সময় ব্রাহ্মসমাজে কেশব ও বিজয়ের মধ্যে একট মনোমালিন্য চলছিল। কেশবের কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্যের বিরুদ্ধে বিজয় অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন। কেশব সেন বিজয়কে সেখানে দেখে একটু অপ্রস্তুত।

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হয়েছে, সমাধি ভেঙ্গেছে কিন্তু ভাব এখনও পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। আমাদের মন যখন তার কোন প্রিয় জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আবিষ্ট থাক, সেই জিনিসটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ ওই জিনিসটারই একটা আবেশ মনের মধ্যে চলতে থাকে। একটা ভাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে গেছেন, শুনতে শুনতে আপনি ওই সঙ্গীতের মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেলেন। অনুষ্ঠান শেষে যখন বেরিয়ে আসছেন তখনও মনের মধ্যে সঙ্গীতের সুরটা ভিতরে গুণ গুণ করে উঠতে থাকবে। এই অবস্থায় ঠাকুর একটু একটু জগৎকেও নিচ্ছেন, কিন্তু মনের বেশির ভাগটা রয়েছে সেই ঈশ্বরে।

ঠাকুর আপনা-আপনি অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "মা, আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব"?

নারদ-ভক্তিসূত্রের যে আলোচনা আছে, সেখানে একটা জিনিসকে বারবার নিয়ে আসা হয়েছে – যিনি ভক্ত, তিনি যখন ঈশ্বরভাবে পুরো ডুবে যান তখন তাঁর শরীর-মনে অনেকগুলো পরিবর্তন হয়। বিশেষ করে মন, যে মন দিয়ে সংসার চলে তাতে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়। তার মধ্যে একটা যেটা পরিবর্তন হয়, তা হল, তিনি দেখেন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। যখন দেখেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তখন তিনি এই সমাধির অবস্থায় চলে যান। সেখান থেকে তিনি যখন সংসারের ভাবে নেমে আসেন, ঈশ্বরের ওই ভাবটা তখনও তাঁর চলতে থাকে, তখন তিনি দেখেন সব কিছু তাঁর ইচ্ছাতেই চলছে। অবতারাদিরা অন্য ধরণের, ব্যতিক্রম এই অর্থে – একদিকে এনারা জানেন যা কিছু হয় সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়; তাঁর ইষ্ট যেই হন, তিনি মা হন, তিনি রাম হন, যাঁর যিনি ইষ্ট তিনি দেখেন সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। অন্য দিকে আবার অবতারের বৈশিষ্ট্য হল, তিনি জগৎকে অনেকটা জগৎ রূপেও দেখতে পারেন, এই দেখাটা সবাই পারেন না। যাঁরা ঘোর বেদান্তী, যাঁদের সত্যিকারের জ্ঞানলাভ হয়ে গেছে, তাঁরা দেখেন জগৎ বলে কিছু নেই, জগৎটা মিথ্যা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজও এক জায়গায় বলছেন, শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি তো আমাদের কোন উপদেশ দেন না'; মহারাজ তাঁদের বলছেন, 'আমি কি উপদেশ দেব, আমি তোমাদের দেখছি নারায়ণ, নারায়ণকে কি উপদেশ দেব'? মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দজী) উনিও কোন দিন বক্তৃতাদি দেননি। মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, 'বলতে গেলেই সিদ্ধান্ত বাক্য এসে যায়'। তার মানে অনেকগুলো সমস্যা এসে যাচ্ছে। তার মধ্যে প্রথম সমস্যা হল, সবাইকে দেখছেন নারায়ণ। যদি সবাইকে নারায়ণ দেখেন, তখন তিনি কি আর উপদেশ দেবেন। আর যদি কথা বলতেই হয়, তখন সিদ্ধান্ত বাক্য চলে আসবে, সিদ্ধান্ত বাক্য মানে শেষ কথা।

বর্তমান সহাধ্যক্ষ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, ছোটবেলা থেকে ওনার সঙ্গে আছি। ওনার শত শত ঘটনাগুলো জানি, তাঁর কথাগুলো শুনেছি। উনি এক সময় দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, পরে সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁকে খবরের কাগজ পড়তে হত, খবরকাগজ পড়াটা একটা কাজ, খবরাখবর রাখাটা ওনাদের ডিউটির মধ্যে পড়ে। উনি বলতেন, 'খবর কাগজওয়ালারা রোজ খবর কাগজের এতগুলো পাতা ভরায় কি করে'? এটা সত্যিই একটা আর্ট। আমরাও ভাবি, যাঁরা বই লেখেন, অতটা লেখেন কি করে। কারণ আপনি দেখবেন, আপনার যখন কোন কথা বলার থাকে, তখন ওই একটা বাক্য কি দুটো বাক্যে যা বলার বলা হয়ে যায়। এখন সেটাকে এত লম্বা কি করে লিখছে? অত বাড়ায় কি করে?

এক সময় স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন, আর স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ সহাধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী কাঁকুড়গাছি আশ্রমে ছিলেন, সেখানে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল। সেই প্রোগ্রামের ব্যাপারে গম্ভীর মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। স্বামী ভূতেশানন্দজীকে জিজ্ঞেস করছেন, কে কে বক্তা ছিলেন? একজন বক্তার নাম বললেন। 'কতক্ষণ বললেন'? 'এই এক ঘন্টার মত'। 'এতক্ষণ বলে কি'? গম্ভীর মহারাজ যেখানেই কোন বক্তব্য রাখতেন, ওনার যা বলার, সেটা বলতে পাঁচ মিনিট লাগলে পাঁচ মিনিট বলবেন, পঁচিশ মিনিট লাগলে পঁচিশ মিনিট, বক্তব্য শেষ। এখন যেখানে যত অনুষ্ঠান হয় সেখানে বক্তাকে একটা টাইম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আমাদের যখন কোথাও ডাকে তখন বলে দেয়, আপনাকে তিরিশ মিনিট বরাদ্য বা চল্লিশ মিনিট দেওয়া হল। বলার মত কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, বেশির ভাগ বক্তাকে ওটাকে কমনসেন্স, ননসেন্স দিয়ে চল্লিশ মিনিট ভরিয়ে দেন। কারণ মানুষ লম্বা টানতে পারে না।

ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে ঠাকুর যেমন সবাইকে নারায়ণ দেখছেন, অন্য দিকে সিদ্ধান্ত বাক্য ছাড়া অন্য কিছু মুখে আসবে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও নারায়ণকে নারায়ণ জেনে আবার অজ্ঞানী রূপেও দেখা এবং তার অন্তর্মুখী স্বভাব যেটা সেটাকেও জানছেন আবার তার যে বহির্মুখী স্বভাব সেটাও

জানছেন। আমি আপনি সবাই আত্মা ভিতর থেকে, বাইরে থেকে না। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, খুব মজা করে বলতেন – 'স্বামীজী বলছেন each soul is potentially divine, এখনও kinetic হয় নি। যখন kinetic হবে তখন দেখ, এখন potential আছে'। Potential যতক্ষণ আছে ততক্ষণ differenciation হবে, ফিজিক্সের এটা একটা term। তার মানে ঠাকুর এই যে potentially divine, এটাকে সত্য রূপে দেখছেন। বহিঃপ্রকাশ যেটা, সেটাকেও সত্য রূপে দেখছেন – এটাই ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধান্ত বাক্যটাও বলছেন আবার বুঝিয়ে দিয়েও বলছেন। এই জিনিসটা একমাত্র অবতাররাই পারেন, সন্ত-মহাত্মারা এটা পারেন না।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, একজন মহাত্মা ও একজন অবতারে কি তফাৎ? যিনি মহাত্মা, যদি সত্যিই তিনি দেখেন সবাই নারায়ণ, যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী, তিনি কিন্তু আর শিক্ষা দিতে পারবেন না, উপদেশ দিতে পারবেন না। শিক্ষা দিতে গেলে হয় নারায়ণ দেখবেন বলে চুপ থাকবেন, যদি কিছু বলেনও, সিদ্ধান্ত বাক্য বলে ছেড়ে দেবেন। যখনই কাউকে দেখবেন অনেক কিছু বলে যাচ্ছে, তার মানে তিনি সিদ্ধান্ত বাক্যে স্থির থাকছেন না, আর দ্বিতীয় তিনি নারায়ণ রূপে দেখছেন না। নারায়ণ রূপে যদি দেখেন, তাহলে এই দুটোর মধ্যে একটি হবে – হয় চুপ মেরে যাবেন, নাহলে শুধু সিদ্ধান্ত বাক্য।

এখানে সিদ্ধান্ত বাক্য হল, সবই নারায়ণ, সবারই মুক্তি হবে; তা সত্ত্বেও তিনি দেখছনে, কেশব সেনের সঙ্গীসাথীরা, যারা কেশবের সঙ্গে ঘুরছে – সবারই বিষয়কর্মে হাত-পা বাঁধা। আমাদেরও নিজেদের এটা মনে হয়, আমরা যখন কোন সাধু, সন্ন্যাসী, মহারাজদের পিছনে ঘুরঘুর করি তখন মনে করি একটা কিছু হয়ে গেলাম, কিন্তু ব্যাপারটা তা না।

ঠাকুর বলছেন – **মা আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?** আমরা নারদ-ভক্তির কথা বললাম, যা কিছু হয় সব মায়ই করছেন, ঠাকুরের কাছে মা হলেন ইষ্ট, আমরা ঠাকুরের ভক্তরা এটাই ঠাকুরের নামে বলব – যা কিছু হচ্ছে ঠাকুরই সব করেন। আর এই জায়গাতে যেখানে ঠাকুর 'আমি' নিয়ে আসছেন, এখানে এসে তিনি একটা নিমিত্ত হয়ে যান। অজ্ঞানে যেটা রাখা হয়েছে, সেটাও মায়েরই ইচ্ছায়। ঠাকুর যে বাকিদের অজ্ঞান থেকে বার করবেন, সেটাও মায়ের ইচ্ছা। দুটোই মায়ের ইচ্ছা। এগুলো এমনিতে পড়ার সময় মনে হয়, বাঃ কি সুন্দর কথা অথবা আপনি ঠিক একমত হতে পারলেন না। কিন্তু এই ঘটনাগুলিকে যদি একটু গভীরে গিয়ে দেখা হয়, শাস্ত্রের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, তখন এই কথাগুলিই অনেক বেশি গভীর তাৎপর্য বহন করে আনে। যিনি অবতার তিনিই একমাত্র এই ভাষাতে কথা বলতে পারেন – মা আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব? একদিকে ঠাকুর জানেন, এনারা সবাই মায়েরই সন্তান, সবাই শুদ্ধ আত্মা; অন্য দিকে ঠাকুর জানেন বন্ধনটাও মা দেন, মুক্তিটাও মা দেন। তার সাথে ঠাকুর জানেন, মা ঠাকুরকে নিমিত্ত করে এদেরকে এবার মুক্তি দিতে যাচ্ছেন।

যাই হোক, ঠাকুর এখনও ভাবে মত্ত হয়ে আছেন, এখনও নিজের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ নেই। নারদ-ভক্তি সূত্রে বলছেন, *মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি*, স্তব্ধ মানে হয় নির্বিকল্প সমাধি, মত্ত মানে নির্বিকল্প থেকে একটু যেন নেমে এসেছেন। এখানে মত্ত হল, ভক্তিতে যে ডুবে যায় সে মত্ত হয়ে যায়, মাতালের মত হয়ে যায়। মদ বেশি খেয়ে নিলে মাতালের ভিতরে যে কথাগুলো চাপা পড়ে আছে, সেগুলো বেরোতে শুরু করে। ঠাকুর ভাবে গড়গড় মানে, মত্ত হয়ে যাওয়া, মদ খেয়ে মাতালের মত হয়ে যাওয়া। তার মানে, সত্যি কথাগুলো বেরোতে শুরু হয়ে যায়। সমাধিতে যখন আছেন, তখন কোন কথাই বেরোবে না। এমনি যখন কথা বলছেন, তাও একটু পর্দা রেখে দিচ্ছেন। কিন্তু যখন ভাবে গড়গড় করছেন তখন এই জায়গাতে বলছেন, মা আমায় কেন নিয়ে এলি? তার মানে মা আসল কর্তা, মা নিজেই সব করান। দ্বিতীয় সত্য, এখনি সবাইকে তিনি মুক্ত করে দিচ্ছেন না, তৃতীয় সত্য, ঠাকুরকে নিমিত্ত করে করাচ্ছেন। এখানে ঠাকুর অবতার রূপে না, ভক্ত রূপে বলছেন। কথামৃতে আমরা যখন

দেখি, বেশির ভাগই আমরা দেখি ঠাকুর একজন ভক্ত রূপে কথা বলছেন, কদাচিৎ কখন তিনি অবতার রূপে কথা বলেন। কারণ ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তিনি একটা ভাব আশ্রয় করে নেন, ওই ভাবকে তিনি কখনই লঙ্ঘন করেন না। এই জায়গাতে ঠাকুরের ভাব হল ভক্তের ভাব। এই অবস্থায় যখনই তিনি কথা বলবেন, তখন তিনি একজন শ্রেষ্ঠতম ভক্ত, এই ভাব নিয়ে কথা বলবেন।

ধীরে ধীরে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসছে। সেখানে একজন গাজীপুরে ভক্ত আছেন, তিনি পওহারী বাবার কথা বলছেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি) – মহাশয়, এঁরা সব পওহারী বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজীপুরে থাকেন। আপনার মতো আর-একজন। আজকে আমরা ঠাকুরকে অবতার বলছি, অথচ পওহারী বাবার নাম লোকেরা জানেন না। অল্প যা একটু জানে, স্বামীজীর কথা, ঠাকুরের কথা দিয়ে জানে। কিন্তু তখনকার দিনে লোকেরা পওহারী বাবাকে ও ঠাকুরকে একই দৃষ্টিতে দেখছেন, যেটা আমরা কথামৃতেই দেখতে পাচ্ছি – আপনার মতো আর-একজন। ইনি অবতার কিনা এতেই বোঝা যায়। সময় যত এগিয়ে যায় অবতারের প্রকাশ তত বাড়তে থাকে, প্রভাব তত বিস্তার করতে থাকে। সন্ত-মহাত্মাদের, যাঁরা সত্যিকারের ঈশ্বরের কৃপা পেয়েছেন, যত সময় যায় তাঁর প্রচার তত বেশি হয়। ইদানিং কালের বাবাজী যাঁরা, যাঁরা ঈশ্বরের একটু অল্প শক্তি পেয়েছেন, তাঁর সময়ে তিনি খড়ের আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু যেমনি তিনি অবর্তমান হয়ে যান, আস্তে আস্তে ওই আগুনটাও স্তিমিত হয়ে এনাদের সব কিছু ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে যায়। সেইজন্য এগুলোকে আমাদের তফাৎ করা খুব মুশকিল, তখনকার দিনে ঠাকুরকে কে কিভাবে দেখেছেন, এখন এর কোন দাম নেই।

কয়েকদিন আগে একটা লেখা পড়ছিলাম, খুব ভাল লেখা। সেখানে লেখক বলছেন, যীশু কোথাও যখন বলছেন না যে তিনি ঈশ্বর, বাইবেলেও সরাসরি তিনি কিছু বলছেন না, যদিও I and Father in Heaven are one এই ধরণের কথা বলেছেন। কিন্তু তাহলে হঠাৎ খ্রীশ্চানরা এভাবে কেন নিচ্ছেন? এইজন্য নিচ্ছেন, তিনি বাইবেলে বলেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর বিশেষ শিষ্য যাঁরা, তাঁদের তিনি ওই রূপটা দেখিয়েছেন – দেখ আমি ঈশ্বর। শিষ্যরা তখন এই ভাবটাকে ধরে তাঁদের শিষ্যদের দিলেন, তা নাহলে এই শক্তি বেশি দূর চলতে পারবে না। বাইবেলকে যদি আমরা খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে, যীশু অনেকবার এই ধরণের কথা বলছেন যে, ভগবান আমাকে যেভাবে নিমিত্ত করছেন, সেভাবে আমি তোমাদের নিমিত্ত করছি, আমি যেভাবে সবাইকে ক্ষমা করে দিচ্ছি, তোমরাও সবাইকে সেভাবে ক্ষমা করবে, ইত্যাদি। কিন্তু মূল কথা হল, যিনি এটা লিখছেন, তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে, ভগবান এভাবে বলেন না। তিনি বাছাই করা কয়েকজনকেই শুধু নিজের স্বরূপের কথা বলেন, আর একমাত্র তাঁরাই অবতারকে চিনতে পারেন। তাঁর জীবদ্দশায় যদি তিনি খুব প্রচার পেয়ে যান, ইনি ভগবান, ইনি ঠাকুর; তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, তাঁর পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট খুব শক্তিশালী। যে কোন লোকের জীবদ্দশায় যদি খুব নাম হয়, তখন বুঝতে হবে তাঁর পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট জোরাল, বেশি দিন চলবে না।

ঠাকুরের সমাধি ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও তিনি স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারছেন না, শোনার পর সামান্য একটু হাসি দিলেন। তখন ব্রাহ্মভক্ত বলছেন –

ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)–মহাশয়, পওহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া, নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'খোলটা'।

ঠাকুরের এটা একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য। এর পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আমাদের দেখতে হবে। একটু গভীরে গিয়ে যাঁরা ঠাকুরের জীবনী পড়েছেন, দেখবেন ঠাকুর নিজের ছবিকে অত্যন্ত সম্মান দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ছবি নিজের ঘরে পূজা করছেন, কাউকে জানতে পর্যন্ত দেননি। ঠাকুর কিভাবে জেনে গেছেন, জানতে পেরে সেখানে এসে নিজে ফুল দিয়ে ছবিতে পূজা করছেন। মা যখন আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন, তখন ঠাকুর বলছেন – একদিন ঘরে ঘরে এই ছবির পূজা হবে। অথচ তখন ১৮৮২, প্রায় ওই সময়েই, 'ঈষৎ হাস্য' অর্থাৎ যেন একটা বিদ্রুপ ভাব নিয়ে বলছেন 'খোলটা'।

একদিকে বলছেন ঘরে ঘরে এই ছবির পূজো হবে আর পওহারী বাবার ঘরে ঠাকুরের ফটোগ্রাফ রাখার কথাতে একটু যেন তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলছেন 'খোলটা'; এই বিরোধ কেন? এই বিরোধের কি কোন দরকার আছে? পুরো দরকার আছে। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা যদি দেখা হয় তখন এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। জাহাজে কেশব সেন ও তাঁর দলবল আছে, বিজয়ও আছেন কিন্তু এখনও আলোচনার মধ্যে আসেননি, একটু পরেই আসবেন। ওই দলে কেশব সেনই একমাত্র আছেন যিনি ঠাকুরকে একটু বোঝেন। বাকিরা কেশব সেনের লেখা আদি পড়া হুজুগে। কথামৃতে দেখবেন কয়েক পাতার পরে পরেই ঠাকুর এই ধরণের লোকদের নিয়ে হাসাহাসি করছেন। কক্ষণ এদের প্রতি যে তিনি অসম্মানের ভাব রাখছেন তা না, খুব হলে একটু করুণার দৃষ্টি। এই করুণাবশতই মাকে বলছেন, লোকেরা অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে, তুমি কি এদের দেখবে না?

এখন এই ধরণের লোকজনদেরই একজন বলছেন, 'আপনার ফটোগ্রাফ রেখেছেন', একটা সম্মান দেখাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটু ঈষৎ হাস্য করে 'খোলটা' বলে ওকে নামিয়ে দিলেন। ঠাকুর হলেন পরমহংস, যদি কেউ এই ধরণের লোককে মিথ্যা প্রশংসা করতে যান, সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে তিনি তাঁকে নামিয়ে দেবেন। এনারা কেশব সেনের ভক্ত, কেশব সেন ঠাকুরকে মানেন, সেইজন্য এনারাও একটু প্রশংসা করতে চাইছেন। তাহলে কি ওনাদের ভিতর ঠাকুরের প্রতি কোন সম্মান নেই? সম্মান পুরো আছে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট না। যখনই আমরা কাউকে সম্মান করি, কাউকে যখন আমরা ভালবাসি – তখন তিনটে স্তরে এই ভালবাসা হয়। প্রথম, সাধারণ মানুষ অপরকে নিয়ে আলোচনা করে, দ্বিতীয়, যারা একটু ভাল মানুষ তারা ঘটনাগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে, আর তৃতীয় যাঁরা মহৎ তাঁরা আদর্শকে নিয়ে আলোচনা করেন।

আমরা যখন কাউকে সম্মান করি, তখন এর শব্দটা আমাদের ভাষায় অন্য রকম হয়ে যায় – Persons, Personality and Principles। কাউকে সম্মান করার সময় আমাদের দেখতে হয়, আমরা কাকে সম্মান করছি। আমরা কি ব্যক্তিকে সম্মান করছি, তাঁর ব্যক্তিত্বকে সম্মান করছ, নাকি সিদ্ধান্তগুলিকে সম্মান করছি। কি রকম? আমরা যদি ঠাকুরের ক্ষেত্রে আসি তাহলে প্রথমে দেখছি ঠাকুর একজন ব্যক্তি। কেশব সেনের সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন মানুষ, কালী মন্দিরের পূজারী, কেশব সেন তাঁকে সম্মান দেন, তিনি একজন পুরুষ। এই যে বলছেন, গাজীপুরের পওহারী বাবা, একজন ভাল মানুষ, একজন সন্ত, এখানেই শেষ। এনারা হলেন অত্যন্ত ordinary types of admirers। এনারাই মানুষের সর্বনাশ করেন। যাঁদের সমাজে নামডাক আছে, নামযশ হয়েছে, এনাদের সর্বনাশের কারণ হয় ঠিক এই দলটা, যারা এনাদের মানুষ রূপে দেখে।

দ্বিতীয় দল হল, যারা তাঁর ব্যক্তিত্বকে দেখে আকর্ষিত হয়। কি রকম – আহা শ্রীরামকৃষ্ণ কি সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। কেশবচন্দ্র সেন, ইনি হলেন এই দ্বিতীয় শ্রেনীর। ইনি ব্যক্তিত্বকে সম্মান করছেন। নরেন আদিরা প্রথম যখন ঠাকুরের কাছে গেছেন, তখন ওনারা পার্সনসের কাছে যাননি, পার্সোনালিটির কাছে গেছেন। ঠাকুরের শিষ্যরা যাঁরা তাঁর কাছে গেছেন, সবাই পার্সোনালিটির দিকে গেছেন। পার্সোনালিটি মানে, এই লোকটির কিছু গুণ আছে, যে গুণের প্রতি আকর্ষিত হয়ে মানুষ সেই লোকটির কাছে যাচ্ছে। আমরা বেশির ভাগই যখন কাউকে ভালবাসি, কাউকে যখন সম্মান করি তখন

এই দুটোর মধ্যে বাচ খেলা হয়। কখন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্বে চলে যায় আবার কখন ব্যক্তিত্ব থেকে ব্যক্তিতে নেমে যায়। আমাদের সময় সুনীল গাভস্কার খুব বিখ্যাত ক্রিকেটার ছিলেন। আমরা কোন দিন দেখিনি কে সুনীল গাভস্কার; কিন্তু তাঁরা খেলার যে নৈপুণ্যতা, দক্ষতা এতে আমরা মুগ্ধ, তার মানে ব্যক্তির মধ্যে যে গুণ আছে সেটা দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। এবার কেউ কোন ভাবে যোগাযোগ হয়ে সুনীল গাভস্করের বন্ধু হয়ে গেল, সেখান থেকে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল, এবার সেই লোকটিকেও সে ভালবাসবে।

আবার এর উল্টোটাও হয়। স্কুলে বা কলেজে আপনার যাঁরা সহপাঠি ছিলেন, তাঁরা সবাই মানুষ, সেই মানুষদের মধ্যে একজনের সাথে আপনার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মেলামেশা করতে করতে দেখছেন বন্ধুটির মধ্যে অনেক গুণ। আমরা প্রায়ই এই কথাটা তখন বলে থাকি – ভাই তোমার মধ্যে এত গুণ আমি কোন দিন কল্পনাও করিনি। ব্যক্তিকে মানুষ যে ভালবাসে, এই ভালবাসা অত্যন্ত ক্ষণিক, যে কোন সময় এই ভালবাসা ছিটকে যেতে পারে। আগামীকালই আপনি অন্য একজন ভাল কাউকে পাবেন, তখন ওই ভালবাসাটা ছিটকে যাবে। ব্যক্তিত্বকে যদি মানুষ ভালবাসে, তাহলে ওই ভালবাসাটা স্থায়ী হয়, সেই লোকটা ডানদিক বামদিক কিছু হয়ে গেলেও তাকে ছাড়বে না।

কিন্তু ঠাকুর ব্যক্তিত্ব নন, ঠাকুর কিছু সিদ্ধান্তের মূর্তরূপ। কি সিদ্ধান্ত? উপনিষদের যে শেষ কথা 'অহং ব্রহ্মাস্মি', সেই সিদ্ধান্তের তিনি মূর্তরূপ। ব্যক্তিত্বে মানুষ পাল্টে যায়, ব্যক্তির গুণ পাল্টে যায়, সিদ্ধান্ত কক্ষণ পালটায় না। 'ঈশ্বরই সত্য বাকি সব মিথ্যা' বা 'ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু' এগুলো এক-একটা সিদ্ধান্ত – এই সমস্ত সিদ্ধান্তের মূর্তরূপ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এটাকেই বলা হয় ভাব। আমরা যখন বলছি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব মানে হল, শ্রীরামকৃষ্ণ যে মানুষ, ওই মানুষ ভাব থেকে বেরিয়ে আসা; শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্যক্তিত্ব সেটা থেকে বেরিয়ে আসা। বেরিয়ে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সিদ্ধান্তের মূর্তরূপ, সেটাকে ধরা। যীশু হলেন কিছু সিদ্ধান্তের মূর্তরূপ, ভগবান বুদ্ধ তিনি হলেন কিছু সিদ্ধান্তের মূর্তরূপ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম এনারা সবাই এক-একটা সিদ্ধান্তের মূর্তরূপ। ঠিক সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু সিদ্ধান্তের সাকাররূপ। শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি ধরতে হয়, তাহলে মানুষরূপে তাঁর যে চারিত্রিক গুণগুলো আছে, সেই গুণগুলিকে প্রথমে ধরতে হবে। কিন্তু উদ্দেশ্য এটা না, উদ্দেশ্য সব সময় হল, এই চারিত্রিক গুণগুলিকে ধরে সিদ্ধান্তরূপী শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরা, অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধান্তে যাওয়া।

ঠাকুর যখন নিজের ছবির পূজা করছেন, তখন তিনি সেই সিদ্ধান্তের যে মূর্তরূপ, সেটার পূজা করছেন। ব্রাহ্মভক্ত যখন বলছেন, গাজীপুরে পওহারী বাবা আপনার ফটোগ্রাফ রেখেছেন, তখন তিনি মানুষের ছবির কথা বলছেন। সেইজন্য ঠাকুর 'খোলটা' এই কথা বলে ওই কথাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। রামকৃষ্ণ মঠ থেকে যাঁরা দীক্ষা নিচ্ছেন, তাঁদের এই জিনিসটাকে মনে রাখতে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তিনটে রূপই আছে – ব্যক্তি রূপে আছেন, ব্যক্তিত্ব রূপে আছেন আর সিদ্ধান্ত রূপে রয়েছেন। যাঁরা ব্যক্তি রূপে ঠাকুরকে ভালবাসছেন, তাঁদের কাছে ঠাকুর মানে তিনি কামারপুকুরে জন্ম নিয়েছিলেন, জিলিপি খেতে ভালবাসতেন। এখান থেকে উঠে আসে ব্যক্তিত্বে – মা কেমন বলতেন, আমজাদও আমার ছেলে শরতও আমার ছেলে, সেখান থেকে কিছু গুণ আপনার ভিতরে আসতে শুরু হয়। কিন্তু এনারা সবাই হলেন, আধ্যাত্মিক যে সত্যগুলি আছে, সেইসব সত্যের এনারা মূর্তরূপ। আমাদের ওই জিনিসটাকে ধরতে হয় এবং জীবনটাকেও সেইদিকে নিয়ে যেতে হয়। মা ঠাকুরের নামে বলছেন, তিনি ছিলেন ত্যাগের বাদশা, এটা হল সিদ্ধান্ত। তার মানে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হল ত্যাগকে সম্মান করা, জীবনের উদ্দেশ্য হল ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ঠাকুরকে নিয়ে অন্য যা কিছু আছে সবটাই secondary, এটা important।

ঠাকুর বলছেন, 'মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না', এটা আরেকটা সিদ্ধান্ত, এটাই ঠাকুরের ভাব; ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এটাই আসল ভাব। এই যে কথাগুলো ঠাকুর পর পর বলছেন, এগুলোই হল শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব। ব্যক্তি ভাল, ঠাকুরকে নিয়েই তো থাকছে, ভালই তো। মানুষের তো অত সূক্ষ্ম বুদ্ধি নেই, কিছু করার নেই যেখানে, সেখানে ঠাকুরকে নিয়েই থাকুক। ব্যক্তিত্বকে নিয়ে

আছে, আরেকটু ভাল। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দেশ্য একটাই – যতক্ষণ সিদ্ধান্তে না যাওয়া যায়, ওই সিদ্ধান্তের সাথে এক যতক্ষণ না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আধ্যাত্মিক উত্থান হবে না। ব্যক্তি নিয়ে যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ আপনি এমনি বস্তুবাদী লোক; ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আছেন, আপনি একজন ভদ্রলোক; সেখান থেকে আপনি এবার সিদ্ধান্তে চলে এলেন, আপনি এবার আধ্যাত্মিক পথের মানুষ। আপনাকে সব সময় বিচার করে দেখতে হবে, আপনি যখন কাউকে ভালবাসছেন, যে কোন মানুষকে, আপনার বাবাকে, আপনার মাকে, যাকেই ভালবাসুন, তাকে মানুষ রূপে ভালবাসছেন, নাকি তার গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভালবাসছেন, নাকি সিদ্ধান্ত রূপে ভালবাসেন। বেশির ভাগ মানুষ তো সিদ্ধান্তের মূর্ত রূপ নন। সিদ্ধান্তের মূর্তরূপ যেমন মহাত্মা গান্ধী – ত্যাগ, অহিংসা, এই সিদ্ধান্তের তিনি মূর্তরূপ। আমরা যখনই বলি, তুমি এখানে গান্ধীগিরি করছ? গান্ধীগিরি করছ মানে সত্যাগ্রহ, অহিংসা। তুমি যাই অত্যাচার করার কর, আমি সহ্য করব; তিনি একটা সিদ্ধান্তের মূর্তরূপ হয়ে গেলেন। সেইজন্য জীবনে যদি উঠতে হয় সব সময় চেষ্টা করতে হয় – ব্যক্তির উপরে কোন মতেই না, পারলে ব্যক্তিত্বও না, প্রাণপণ চেষ্টা থাকবে সিদ্ধান্তকে নিয়ে থাকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়

"বালিশ ও তার খোলটা" – দেহী ও দেহ। এরপর মাস্টারমশাই নিজের মত বলছেন। ঠাকুর আস্তে আস্তে প্রকৃতিস্থ হতে হতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছেন, এবার তিনি উপদেশ দেবেন। সমাধি অবস্থায় তাঁর নিজের হুঁশ থাকে না, ভাবাবস্থায় ভিতরের কথাগুলো বেরিয়ে আসে, আর এখন প্রকৃতিস্থ। এই যে ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব ও সিদ্ধান্তের কথা বলা হল, ঠাকুর এবার চেষ্টা করছেন কিভাবে যাঁরা শুনছেন তাঁরা যে অবস্থায় আছেন, সেখান থেকে তাঁদের টেনে সুন্দর করে সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবেন।

"**তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন**।"। একটু আগে বলছিলেন, মা আমাকে এখানে কেন নিয়ে এলি, আমি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব? সেখান থেকে এবার কিন্তু কথা পাল্টে যাচ্ছে, বলছেন, সবার ভিতর তিনি আছেন। তিনিই যখন আছেন, তখন আপনি যে মনে করছেন, বেড়ার ভিতর থেকে আমি কি এদের রক্ষা করতে পারব, আপনি রক্ষা করার কে? বাইরের যে কোন লোক এই অংশটা পড়ার পর বলবে, 'ঠাকুরের কথার মধ্যেই তো বিরোধ আছে, একটা কথার সাথে আরেকটা কথার কোন মিল নেই, সব এলেমেলো'। কিন্তু না, একেবারেই এলেমেলো নেই। ঠাকুর যখন ভাবের অবস্থা থেকে বলছেন, তখন তিনি সত্যগুলি বলছেন। ভাবের অবস্থা থেকে নেমে এসেছেন, এবার তিনি আচার্য হয়ে যাচ্ছেন। এই যে তাঁর ভাব পরিবর্তন হচ্ছে, সেখান থেকে ঠিক ঠিক আচার্যের দিকে যাচ্ছেন, তাই কথাগুলোও তাঁর অন্য রকম হবে। এই কথাগুলোও যেমন সত্য, আগে যেটা বলেছিলেন ওটাও সত্য। ওই জায়গাতে তিনি উচ্চ অবস্থা থেকে দেখেছেন এরা সবাই কোথায় আছে। এবার তিনি অনেকটা নীচে নেমে এসেছেন, এবার তিনি হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

বলছেন – **যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানেই থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা**। (সকলের আনন্দ)

আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি দেশের যেখানে খুশি যেতে পারেন, থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি, তাঁদের যে ঠিকানা, যেখানে তাঁর কার্যালয় সেখানে তাঁকে বেশি পাওয়া যায়। ভগবান সব জায়গায় আছেন, তিনি মন্দিরেও আছেন, তিনি মূর্তিতেও আছেন, ছবিতেও আছেন, পিঁপড়েতেও আছেন, হাতিতেও আছেন। যারা খুনি, চোর, লম্পট, বদমাইশ, ঠগ, এদের সবারই ভিতরেও তিনি আছেন। কিন্তু

ভক্তের হৃদয়ে অজ্ঞান আবরণটা সরে গেছে, অজ্ঞান আবরণ সরে যাওয়াতে ভগবানের আলোর প্রকাশ ওখানে বেশি দেখা যাচ্ছে। অগ্নি যেমন সব কিছুতেই আছে, কিন্তু উচ্চমানের যে দাহ্য পদার্থগুলি আছে, সেখানে একটা স্ফুলিঙ্গ পড়লেই সেগুলো জ্বলে উঠবে। ভক্তের হৃদয় অনেকটা সেই রকমই।

আমাদের ভক্তিশাস্ত্রে সেইজন্য বলে, ভগবানকে তো দেখা যায় না, কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত সেখানেই ভগবানের আবির্ভাব। আবির্ভাব বলতে এই নয় যে, ভগবান সেখানে আসেন; অর্থ হল অন্তর্যামী রূপে তিনি সবারই ভিতরে আছেন কিন্তু বাকিদের উপর অজ্ঞানের আবরণ, কামিনী-কাঞ্চনের আবরণ, কামনা-বাসনার আবরণ। ভক্তের হৃদয়ের আবরণগুলো অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভক্তিশাস্ত্রে এটাকে ওনারা আরও এগিয়ে নিয়ে যান। বলেন যে, সন্ত-মহাত্মারা যাঁরা আছেন, তাঁদের ভিতরে ভগবানের আবির্ভাব অনেক বেশি। আবির্ভাব মানে এই নয় যে তাঁর ভিতরেই আছে, অন্যের ভিতর নেই। এই অর্থে আবির্ভাব বলা হয় যে, সেখানে তাঁর প্রকাশ বেশি। সেইজন্য বলা হয়, এইসব সন্ত-মহাত্মাদের সব সময় ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করতে হয়। সন্ত-মহাত্মার পূজা করলে সেই একই ফল পাওয়া যায়, যে ফল ভগবানের পূজা করলে পাওয়া যায়। ঠাকুর এখানে এটাই বলতে চাইছেন – ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তার মানে শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন ভক্ত, সত্যিকারের ভক্ত। ভক্তিশাস্ত্রের যেখানে শ্রেষ্ঠতম ভক্তের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই ভক্তের যে হৃদয়, সেই হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা। কিছুক্ষণ আগে বললেন 'খোলটা', তিন-চার মিনিটের মধ্যে পালটে অন্য রকম কথা বলছেন। কেন? ওই জায়গাটায় তিনি ব্যক্তি রূপে নিন্দা করছেন, এখানে সিদ্ধান্ত রূপে ছবিটাকে রাখতে বলছেন।

ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখান, এখান থেকে ঠাকুর এবার ঈশ্বর তত্ত্বের উপর নেমে আসছেন। ঈশ্বর বলতে কি বোঝায়। এই জায়গাতে একটা জিনিস আমরা আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি, আবারও করব। এখানে ওই আলোচনাটাই আবার একটু করা দরকার।

একটু গভীরে গিয়ে যদি আমরা ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করি, ঠিক ঠিক ধর্ম বলতে যেটা বোঝায় সেটারই কথা বলা হচ্ছে; বিজ্ঞানের ধর্ম, মানবিকতার ধর্ম, এগুলোকে নিয়ে বলা হচ্ছে না। ধর্ম মানে যেখানে ঈশ্বরতত্ত্বই প্রধান, সেই ধর্মকে দেখতে গেলে মোটামুটি আমরা আটটি মূল ধর্ম পাই। এর মধ্যে দুই প্রকার ধর্ম – একটা হল যে ধর্ম একজনের কথার উপর দাঁড়িয়ে আছে; যেমন ইসলাম, খ্রীশ্চানিটি, বৌদ্ধ, জুরুষ্ট্রিয়ান আর শিখ ধর্ম, যদি শিখ ধর্মকে আলাদা ধর্ম রূপে দেখা হয়। এইসব ধর্মে যদিও অনেক সন্ত-মহাত্মারা আছেন, যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ধর্মে বিভিন্ন ভাবে অনেক অবদান রেখে গেছেন; বিশেষ করে খ্রিশ্চানিটি ও বৌদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল, যদিও একজন যেটা বলেছেন সেটার উপর ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু পরে পরে তাঁদের মধ্যে যে চিন্তকরা এসেছিলেন, তাঁরা জিনিসটাকে অনেক গভীরে নিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু সেগুলোকে শাস্ত্র রূপে না দেখে দর্শন রূপে দেখা হয়। যেখানে ধর্মের মধ্যে অনেকজনের অবদান আছে, এর মধ্যে প্রধান হল জুদাইজিম, জৈন ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম।

এর মধ্যে জুদাইজিম ধর্মে যে ওল্ড টেস্টামেন্ট আছে তাতে অনেক ঈশ্বরীয় কথার সাথে সাথে অনেক কিছুই আছে আবার সমাজের কথাও অনেক আছে। ওনাদের মধ্যে যাঁদের প্রফেট বলা হয়, ওনারা ঠিক অবতার নন। যদিও আমরা 'প্রফেট' শব্দের বাংলা অর্থ অবতার করি আবার অবতারকে ইংরাজীতে অনুবাদ করার সময় প্রফেট করে দিই। প্রফেটরা হলেন অনেকটা আমাদের উচ্চমানের সন্ত ধরণের। কারণ এই ধর্মগুলো ঈশ্বর নিজে অবতার হয়ে আসবেন, এটাকে কোন মতেই মানবে না। এই ধর্মগুলিতে, বিশেষ করে জহুদি ধর্মে বিভিন্ন যে প্রফেটরা এসেছেন, তাঁরা কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে নূতন কিছু বলছেন না। তাঁরা সব সময় এটাই বলে যাবেন – ঈশ্বর তাঁদের থেকে কি চান, যাঁরা ভক্ত, যাঁরা ধর্মাবলম্বী তাঁদের থেকে ঈশ্বর কি চান? এটাকে বলে কভেনেন্ট বা বলা যেতে পারে ঈশ্বরের সঙ্গে ট্রিটি।

জৈন ধর্ম অন্য ধরণের। জৈন ধর্মে কি হয়, ওনারাও ঈশ্বরতত্ত্ব নূতন করে কিছু বলেন না। ওনাদের কাছে মহাবীর জৈনের যে উপদেশ বা নির্দেশাবলী রয়েছে সেটাই শেষ কথা, কিন্তু ওনাদের

জোর ত্যাগের উপরে। জৈনদের বাকি তীর্থঙ্কররা যা বলেছেন, সেখানেও ত্যাগের মহিমা বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে, ত্যাগটাই প্রধান। মূল বক্তব্য ঈশ্বর, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, এই জিনিসগুলিকে কোন ধর্মই বিভিন্ন ভাবে দেখে না।

এই ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম একেবারে বিশেষ ধর্ম। যার জন্য হিন্দুদের সংসারের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি, ধর্মের প্রতি যে দৃষ্টি, এটা পুরো আলাদা, কারুর সাথে মেলে না। কি রকম? আমাদের এখানে প্রচুর সন্ত-মহাত্মারা আছেন, চিন্তকরা আছেন, যাঁরা প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করেছেন যার প্রতিফলন আমাদের ষড়দর্শনে পাই; বড় বড় ঋষি-মুনিরা রয়েছেন, তার থেকেও বেশি অনেক অবতার রয়েছেন। এই জিনিস অন্যান্য ধর্মে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন ধর্ম-দর্শন বা ধর্ম-তত্ত্বকে নিয়ে আসা হবে, সেখানে হিন্দু ধর্ম প্রত্যেক ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। কারণ একমাত্র হিন্দুরাই অনন্ত ঈশ্বরকে অনন্ত ভাবে দেখে, বাকিরা অনন্ত ঈশ্বরকে এক ভাব দিয়ে দেখে।

আমাকে যদি ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে আমি এটাই বলব যে, আমার কাছে এটা খুব contradictory মনে হয়। যুক্তিটা অত্যন্ত সহজ সরল, সবাই তাঁকে অনন্ত রূপে মানছেন। তাহলে যিনি অনন্ত তাঁকে আমরা এক ভাব দিয়ে কি করে ব্যাখ্যা করব। ঈশ্বর অনন্ত, খ্রীশ্চানরা তাঁকে বলছেন, তিনি গড্, এরপর তাঁরা যেমনটি পূজা করছেন অমনটিই সবাইকে করে যেতে হবে। জিনিসটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ঈশ্বর যদি অনন্ত হন, তাঁর অনন্ত ভাব হবে, তাঁর পূজাও অনন্ত ভাবে হবে। অনন্ত তাঁর রূপ হবে, এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো যুক্তিতে দাঁড়ায়। যাই হোক, আমরা অন্য ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছি না, আমরা আলোচনা করছি হিন্দুদের মত।

অনন্ত মত মানে এই নয় যে, আমাদের গণতন্ত্রে যে খুশি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে যাবে, যত লোক তত পার্টি, যত মন তত ঈশ্বর – ঈশ্বর এই অনন্ত নন। ঈশ্বরকে আমি যেভাবে সাক্ষাৎ করেছি। যখন হিন্দুদের নিন্দা করা হয়, আমরা হিন্দুরা যখন হিন্দু ধর্মকে নিয়ে আলোচনা করি, আমরা বারবার এটাকে নিয়ে ভুলভাল কথা বলি, ভুল চিন্তা-ভাবনা করি। কানপুরের একজন বড় ডাক্তার আমার ভাল বন্ধু ছিলেন। যা হয়, ডাক্তারিটুকু জানেন তার বাইরে আর কিছু জানেন না। ঠাকুরের নামও আগে শোনেননি, আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর জানলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরের ব্যাপারে কি ধারণা'? আমি বললাম, 'আরে, ঠাকুরের ঈশ্বর সম্বন্ধে কি ধারণা হবে, তিনি তো প্রত্যক্ষ করছেন ঈশ্বরকে'। ধারণা মানে, আমরা যেমন অনেক সময় বলি, তুমি আমার ব্যাপারে কি ভাবো? তার মানে মন দিয়ে আপনি কি ভাবছেন। ঈশ্বরের ব্যাপারে ঠাকুরের মন দিয়ে কোন ভাবনা কি করে হবে? তিনি তো প্রত্যক্ষ করেছেন।

ইদানিং কালের বিভিন্ন প্রবন্ধাদি যদি দেখেন, দর্শনের কোন বই যদি দেখেন, দেখবেন সেখানে লেখকরা বিচিত্র বিচিত্র সব টাইটেল দিচ্ছে। একটা টাইটেল দেখলাম, Idea of God according to Sri Ramakrishna, তোমার টাইটেলটাই তো ভুল। ডাঃ সরকারকে ঠাকুর বলছেন, তোমার কথা আমি কি শুনব, আমি তো এ-রকমই দেখেছি। যেখানে ঠাকুর বলছেন, 'আমি এই রকমই দেখেছি', সেখানে ঠাকুরের আইডিয়ার তো কোন প্রশ্নই নেই। ঠাকুর ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করছেন। 'ঠাকুরকে আমি কি রূপ ভাবছি', এটা একটা আর্টিক্যাল হতে পারে? আসলে কি হয়, দর্শন জিনিসটা, যুক্তি জিনিসটা যে কত নীচু থেকে যায়, বোঝান খুব মুশকিল। আমাকে যদি কোন পণ্ডিতদের সভার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেন, আমাকে কচুকাটা করে শেষ করে দেবে। তাঁদের সামনে দাঁড়াতেই পারব না, আমি দুটো বাক্য বলতে পারব না। কিন্তু আমরা জানি যে ওনারা ফালতু বকে যাচ্ছেন। ধর্ম জিনিসটা তাঁদের জন্য নয়।

হিন্দুদের যে এই অনন্তকে অনন্ত ভাবে দেখা, এটা তাঁদের ধারণা নয়, এটা তাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন, জিনিসটাকে ওই রকমই দেখছেন। ঠাকুর যখন বলছেন, একটা গাছে গিরগিটি আছে, সে তার রঙ পালটায়, যে ওই গাছের তলায় থাকে সেই এই জিনিসটাকে জানে। ঋষিরা সেই বৃক্ষের তলায়

থেকেছেন, তাঁরা সব দেখেছেন। তাঁরা যে রঙ দেখেছেন, সেই রঙের বর্ণনা করেছেন। আমরা তাও দেখিনি বলে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। সাত হাজার, আট হাজার বছরের এই সভ্যতা পুরোপুরি ঈশ্বরে সমর্পিত।

ছোটবেলা আমি চোখের সামনে আমাদের গ্রামের কালচার দেখতাম, সেখানে খাওয়ার কালচার এই রকম, পরার কালচার এই রকম, পূজোর কালচার এই রকম। বড় হয়ে যখন ভারতে ঘুরছি, দেখছি সব জায়গায় সেই একই কালচার। কোন সেন্ট্রাল বুক নেই, কোন সেন্ট্রাল চার্চ নেই, অথচ সব জায়গায় একই কালচার চলছে। কি করে চলছে? এই যে একটা অনন্ত জিনিস, অথচ একসূত্রে বাঁধা। আমরা ছোটবেলা শুনেছিলাম, গয়াতে পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষদের জন্য পিণ্ডদান করতে হয়। আপনি পিতৃপক্ষ চলাকালীন গয়াতে চলে যান, দেখবেন ভারতের সব প্রান্ত থেকে লোক ওখানে পিণ্ডদান করতে আসছে। অশিক্ষিতরাও যাচ্ছে, উচ্চশিক্ষিতরাও যাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে সারা ভারতের লোকেরা একই জিনিস করে যাচ্ছে। এটা কি করে হয়? এই যে অনন্ত ভাব, অনন্ত পথ, অনন্ত ঈশ্বর; এটাকে synthesize করা হয়েছে, এক সুরে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মূল গ্রন্থ বেদ দেখুন, কিভাবে ওনারা হিন্দু ধর্মের সব চিন্তা-ভাবনাকে একটা জায়গায় সংগ্রহিত করে একটা প্ল্যাটফর্মে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু যেটা এনেছেন, সেটাও অনেক বেশি। ব্যাসদেব ওটাকেই গীতাতে সাতশ শ্লোকে একটা জায়গায় নিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন। এটাকেই সামনে রেখে শঙ্করাচার্য পুরো জিনিসটাকে সমন্বয় করলেন অন্য ভাবে।

ভারতের যে আধ্যাত্মিক ভাব, সবাই যে একই কথা বলছেন, যদিও সেই অনন্তের বর্ণনা, এটাকে সবচেয়ে ভাল তুলে এনেছেন অধ্যাত্ম রামায়ণ। গীতাতে দর্শনগুলিকে এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য, এনারা হলেন ভারতের ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক আত্মা। এনারা সকলেই হলেন সেই বেদপুরুষ, এনারা সব কিছুকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। গীতাতে বলছেন, তুমি যে পথেই যাও, সেই একই। শঙ্করাচার্য একই কথা বলছে, তবে একটু অন্য ভবে। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্যাসদেবরই দৃষ্টিভঙ্গীটা নিচ্ছেন। ঠাকুরের কথাগুলো, ব্যাসদেবের কথা যেটা মহাভারত ও গীতাতে পাই, অধ্যাত্ম রামায়ণে পাই, ঠাকুরের কথাতেও তাই পাই। ঠাকুর এই জায়গাতে বলছেন তিনটে যে মূল পথ – জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ এই তিনটে কিভাবে এক। কর্মযোগ ঠিক এই অর্থে পথ নয়, কারণ শরীর দিয়ে যেটাই করা হয় সেটাই কর্ম আর মন দিয়ে যেটাই করা হয় সেটাই যোগ। কিন্তু ঠাকুর এখানে যোগকে আলাদা ভাবে বলছেন। যখন আমরা ওই জায়গাতে আলোচনা করব তখন বিস্তারে ব্যাখ্যা করব।

এই জায়গাতে ঠাকুর বলছেন জ্ঞানীরা যেটা উপলব্ধি করে, ভক্তরা যেটা উপলব্ধি করে আর যোগীরা যা উপলব্ধি করে তিনটেই এক। এখানে আবার কয়েকটা কথা বলার আছে। বেদ হল মন্ত্রের সমুদ্র আর সুক্তগুলি প্রার্থনার সমুদ্র। আমাদের পক্ষে সব কটার আলোচনা করা সম্ভব না। কিন্তু বেদের দুটি সুক্ত ব্যক্তিগত ভাবে আমি খুব পছন্দ করি, যখনই সুযোগ পাই তখন এই দুটোর উপর আলোচনা করি – একটা হল নাসদীয় সুক্ত, আরেকটি হল পুরুষসুক্ত। নাসদীয় সুক্ত ঈশ্বর জিনিসটাকে তত্ত্ব হিসাবে নিচ্ছেন। সেখানে খুব সুন্দর শব্দ যুগল আসে *'স্বধয়া তদেকম্'*। সৃষ্টির আগে কি ছিল? *স্বধয়া তদেকম্, তদ্ একম্* সেই এক ঈশ্বর আর *স্বধা*, নিজে যেটা ধারণ করে আছেন, তার মানে তাঁর শক্তিকে ধারণ করে আছেন। নাসদীয় সুক্ত স্বামীজীরও খুব প্রিয় সুক্ত ছিল। এই সুক্ত থেকে হিন্দু ধর্মের নামকরা কয়েকটা দর্শন বেরিয়ে আসে, যেমন সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন। সেখানে ওনারা সৃষ্টির উপর বেশি জোর না দিয়ে জোর দেন ঈশ্বরের উপরে – ঈশ্বরই বস্তু যেন।

পুরুষসুক্তমের দৃষ্টিভঙ্গী পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। পুরুষসুক্তমে সেই যে পুরুষ, ভগবান যিনি, তিনি নিজেকে নিজের অগ্নিতে আহুতি দেন এবং নিজের প্রতিই আহুতি দিচ্ছেন। গীতাতে যেমন আমরা

পাই *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ*, এখানেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। ঈশ্বর নিজেকে নিজের প্রতি নিজের অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছেন যাতে সৃষ্টি হয়। ফলে সৃষ্টিতে কি হচ্ছে? সৃষ্টিতে যা কিছু হচ্ছে সব সৃষ্ট পদার্থ ঈশ্বরেরই রূপ।

নাসদীয় সুক্ত আর পুরুষসুক্তম, দুটোর দৃষ্টিভঙ্গী একদিকে যেমন আলাদা, আবার অন্য দিকে দুট সুক্ত একই কথা বলছেন। বলতে চাইছেন, তত্ত্ব সেই এক। সৃষ্টির দিক থেকে দাঁড়াবে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গী যেমন সৃষ্টি তেমন। যার জন্য নাসদীয় সুক্তে বলছেন – সৃষ্টি কিভাবে হল? বলছেন, এটা কে বলবে, তখন তো দেবতারা যাঁরা সবার উপরে, তাঁদেরই সৃষ্টি হয়নি, ঈশ্বর ছাড়া এটা কে বলতে পারবেন! কিন্তু যদি *স্বধয়া তদেকম্*, এই শব্দ যেটা বেদে বলছেন, ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি এটাই ছিল, তাছাড়া আর কিছু নেই। তখন অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না। তাহলে মূল সত্যটা কি? মূল সত্য ওটাই – সৎও না অসৎও না। সৎ মানে যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায়, অসৎ মানে এটা বলা যাবে না যে ওখানে কিছু নেই। ওখানে কিছু নেই যদি বলা না যায়, তাহলে বলতে হবে সেখানে কিছু আছে? না, তাও বলা যাবে না। কারণ আপনি যে বলবেন সেখানে কিছু আছে, এটা বলার জন্য ইন্দ্রিয় লাগে, মন লাগে। সৃষ্টি যখন হয়নি তার মানে সেখানে মন নেই, ইন্দ্রিয় নেই, তাই আপনি কি করে বলবেন কিছু আছে? বেদান্তে এই দৃষ্টিভঙ্গীটাকে ধরা হয়।

নাসদীয় সুক্তের প্রথম যে বাক্য, *নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ*, এটাই তাঁদের কাছে সত্য, এটাই শেষ কথা। ভক্ত যাঁরা, তাঁরা পুরুষসুক্তমকে ধরে এগিয়ে যান। ওনারা নিত্য বলে যাচ্ছেন *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ*, সেই ঈশ্বর, তাঁর হাজারটা মাথা, হাজারটা চক্ষু, তাঁর হাজারটা বাহু, হাজারটা পা; তার মানে তিনি সর্বব্যাপী, সব জায়গাতে তিনিই আছেন। এই যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গী, এই দুটি মত হিন্দু ধর্মের সব কিছুতে ছেয়ে আছে। তখন প্রশ্ন উঠবে যে, আমরা এর আগে ধর্মকে নিয়ে যে আলোচনা করলাম, সেখান থেকে হিন্দু ধর্মকে নিয়ে আমরা বলতে পারি যে, এই দুটোতেই হিন্দু ধর্ম কি শেষ? এই দুটোকে যখন আমরা ব্যাখ্যা করতে যাব, এই দুটোকে যখন বোঝাতে যাব, তখন দেখা যাবে যে এই দুটো আসলে অসংখ্য হয়ে যায়। ঈশ্বর যিনি অনন্ত হন, তাঁর রূপও অনন্ত হবে, তাঁর ভাবও অনন্ত হবে, তাঁর কাছে পৌছানর জন্য যে পথ নিতে হবে, সেই পথও অনন্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যেটা আরও বেশি, যখন সৃষ্টির দিকে তাকাচ্ছি, সংসারের দিকে তাকাচ্ছি, এটাকেও যে ব্যাখ্যা করা হবে, সেটাকেও অনন্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। এই দুটো সরাসরি বেদ থেকে আসছে। এর কোনটাই কল্পনা না, কোনটাই বুদ্ধির খেলা না। মনকে একটু শান্ত করে যদি বোঝার চেষ্টা করা হয়, জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর এই জিনিসটাকে এবার এখানে বলছেন।

''**জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তের তাঁকেই ভগবান বলে**''।

বেদে যখন বলছেন, *নাসদাসীন্নো সদাসীৎ*, তখন অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না, আর যখন বলছেন, *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ*, এই দুটো যে আলাদা কথা নয়, আমরা এটা মানতে রাজী না। ব্যাসদেব আর শঙ্করাচার্যকে যদি বলা হয়, এই দুটো মন্ত্র একেবারেই আলাদা, ওনারা চমকে যাবেন, কি বলছ কি তুমি? দুটো মন্ত্রে একই কথা বলছেন। একজন সৃষ্টির আগের কথা বলছেন, আরেকজন সৃষ্টির পরের কথা বলছেন। নাসদীয় সূক্তমে ওই রকম বলছেন, যখন সৃষ্টি শুরু হল তখন শেষে যখন ভগবানকে দেখা যান, যোগীরা ওই রূপটাকে ধ্যানের অবস্থায় দেখেন। সেই রূপটাই হল *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ*। তাহলে কি একটা লোয়ার আরেকটা হায়ার? না, ওই দিক থেকেও না। একজন সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত, আরেকজন সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত নন। এটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে আপনি কোন ভাবটাকে নিতে চাইছেন।

তাহলে শেষ কথা কোনটা? রাজযোগে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মন যেমন যেমন শান্ত হয়, যেটা চিত্তবৃত্তি নিরোধের মাধ্যমে হয়, আবার যেটা ভক্তির মাধ্যমে

ভালবেসে হতে পারে, আর তার সাথে নেতি নেতি বিচার করে হতে পারে। মোটামুটি এই তিনটে। কর্ম যখন হয়, সেখানে সমস্ত জগৎকে আপন ভেবে নিয়ে, একটা inclusive wayতে করা হচ্ছে। এখন শেষ জায়গাটা যেটা, রাজযোগ একেবারে পরিষ্কার করে দেখাচ্ছে, কিভাবে মন যখন খসে পড়ে যায় আত্মা তখন কিভাবে নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। উপনিষদেও এটাই বলছেন, *যতো বাচ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ,* তার মানে মনটা যদি খসে পড়ে যায়, তবেই তোমার স্বরূপকে জানতে পারবে। যতক্ষণ মন থাকবে ততক্ষণ তত্ত্বকে তত্ত্ব রূপে জানা যাবে না। যেখানে তুমি-আমি ভাব আছে সেখানে ভালবাসা হয় না। ভালবাসা তখনই হয়, যখন তুমি-আমি এই ভেদটা মিটে যায়। পরে আমরা দেখব ঠাকুর তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক সত্য আর মন, এই সব কিছুকে ব্যাখ্যা করছেন। এটা যে ঠাকুর নিজের বুদ্ধি লাগিয়ে করছেন তা না, সত্যটাকে সত্য রূপে আমাদের সামনে রেখে দিচ্ছেন।

এবারে ঠাকুর ব্রাহ্মণের উপমা দিচ্ছেন। আগেকার দিনে যাঁরা উচ্চবংশের ছিলেন, তাঁরা বাড়ির রান্নাবান্না করার জন্য ব্রাহ্মণ নিয়োগ করতেন। মজা করে বলা হত – ব্রাহ্মণ তিনটে ফুঁ মারে, একটা কানে ফুঁ মারে, আরেকটা শাঁকে ফুঁ মারে আর উনুনে ফুঁ মারে। উনুনে ফুঁ মারা মানে রান্না করে, শাঁকে ফুঁ মারা মানে পূজারী হয় আর কানে ফুঁ মারে মানে মন্ত্র দেয়, গুরুগিরি করে।

একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনী বামুন। দুটো বলছেন, তৃতীয়টা ঠাকুর বলছেন না, ব্রাহ্মণই উপনয়নের সময় কানে মন্ত্র দেন। বলছেন, ব্রাহ্মণ সেই এক, যখন পূজা করছেন তখন পূজারী আর যখন রান্না করছেন তখন বলছে রাঁধুনী বামুন। একজন মা, স্কুলে যখন পড়াচ্ছেন তখন তিনি একজন শিক্ষিকা, একই ব্যক্তি কিন্তু তার বর্ণনাটা পাল্টে যাচ্ছে।

যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি – এই বিচার করে। ঠাকুর যখনই জ্ঞানযোগের কথা বলবেন, স্বামীজীও যখন জ্ঞানযোগের কথা বলছেন তখন তাঁরা এটাই বলবেন – নেতি নেতি, এটা নয় এটা নয়। রাজযোগের সাথে তফাৎ কোথায়? রাজযোগ কি করে, মনে যত বিকার বা বৃত্তি আসছে সেটাকে আটকে দেয়। নেতি নেতিতে বলছেন, না, ওটার দিকে আমি মন যেতে দেব না। একটু তফাৎ যেটা, সেটা হল, যোগে একটা জিনিসকে আলম্বন করে মনকে ওখান থেকে নড়তে দেয় না। এই আলম্বন যে কোন জিনিস হতে পারে। জ্ঞান যোগে বলেন, যেটা দেশ, কালে, সীমায় আবদ্ধ সেটাকে আমি ত্যাগ করব, সেটার দিকে আমি দৃষ্টিই দেব না। ঠাকুর যে জ্ঞানযোগের কথা বলছেন, যেখানে নেতি নেতি আসে, তার মানে সবটাই উড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

কিভাবে নেতি নেতি বিচার করে? **ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়; জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান**।

মাঝে মাঝে ভাবি, আমরা এমন এক যুগে জন্ম নিয়েছে, যে যুগে অবতারের ছবি নেওয়া হয়েছে, অবতারের কথগুলিকে লিখে রাখা হয়েছে। আমাদের অন্য যত শাস্ত্র আছে, কোথাও এ-ভাবে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা নেই। হয়ত উপনিষদ আদি একই কথা বলছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য অদ্বৈত বেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন জোর উঠেপড়ে লেগেছিলেন, সেটা করতে গিয়ে তিনি বাকি সব কিছু উড়িয়ে দিয়েছেন। অন্য ভাবে কোথাও বলেছেন, কিন্তু তখন উড়িয়ে দিয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, বিচার করতে করতে 'না' করে যাচ্ছে, 'আমার এটা চাই না, এটা চাই না'। ঠাকুর পরে উপমা দেবেন, অন্ধকারে বাবুকে খুঁজছে, হাতড়াচ্ছে, যেখানেই হাত দিচ্ছে বলছে 'এটা না', 'এটা না'; এই করে করে একটা জায়গায় এসে বলছে – 'এইটা'। নাসদীয় সূক্তে যেটা বলা হল, যখন সৃষ্টি আদি হচ্ছে, আপনি এখন খুঁজছেন *স্বধয়া তদেকম্,* সেই ঈশ্বর এক, যিনি নিজের শক্তির সঙ্গে বিরাজ করছেন, তার বাইরে আমার আর কিছু লাগবে না। আমার ওই শক্তিটাও লাগবে না, আমার ওই যে *একম্,* আমার ওটাই লাগবে। বাকি সবটাই শক্তির খেলা, আমার লাগবে না। জ্ঞানীদের এই approach, বলছেন, যে জায়গাতে মন স্থির হয়ে যায়, সেই অনন্তের ভাবে যেখানে যায়, ওটাকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান।

ঠাকুর বলছেন, **ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এ-সব স্বপ্নবৎ**। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই শব্দটা ঠাকুর আবার বলবেন, শব্দটা আবার আসবে। 'মিথ্যা' শব্দটাকে আমরা অনেক সময় ভুল বুঝি, বৌদ্ধ দর্শন থেকে আমাদের এই ভুল ভাব এসেছে, যেখানে আমরা মনে করি মিথ্যা মানে এটা যেন নেই। যেমন বন্ধ্যা পুত্র বলে কিছু হয় না, সেই রকম জগৎ বলে কিছু হয় না। শাস্ত্র এভাবে বলেন না। শাস্ত্রের বক্তব্য হল, যেটা মায়া, যেটা মিথ্যা, তার পরিষ্কার পরিভাষা হল – যেটা দেশ, কাল, পাত্রের মধ্যে বাঁধা। যদি কোন কিছু দেশ, কাল, পাত্রে বাঁধা থাকে, তাহলে সেটা মায়া, সেটা মিথ্যা, সেটাই অনিত্য, সেটাই অসৎ – নানান রকমের শব্দ ব্যবহার হয়। সৎ তাহলে কোনটা? যেটা দেশ, কাল ও বস্তুর পারে। নেতি নেতি সাধনার উদ্দেশ্য হল, দেশ, কাল ও বস্তুতে যিনি সীমিত নন, তিনিই একমাত্র ইতি, তাঁর বাইরে সব নেতি নেতি।

একটা উপমা যদি আমরা কল্পনা করতে পারি, তাহলে কিছুটা ধারণা করতে পারব, যদিও এই উপমাটা বোঝানো একটু কঠিন হবে। মনে করুন ক্লাশে যে ব্ল্যাকবোর্ড থাকে, কল্পনা করা যেতে পারে তাতে একটা বিরাট ছবি আছে। ক্লাশে যে কজন বসে আছে, তাদের সবারই চোখে একটা টেলিস্কোপের মত যন্ত্র লাগানো আছে আর তাতে একটা খুব ক্ষুদ্র একটা ছিদ্র আছে, যে ছিদ্র দিয়ে একটা পয়েন্ট সাইজের জিনিস দেখা যাবে। যখন তারা পুরো ব্ল্যাকবোর্ডকে দেখার চেষ্টা করবে, তখন মনে করছে আমি এই পুরো ছবিটাকে নেব। চোখে যে যন্ত্রটা লাগানো আছে আর তাতে যে ছোট্ট একটা ছিদ্র, সেই ছিদ্র দিয়ে তখন তারা একটু একটু করে দেখবে। যে যতটুকু ছবিটা দেখতে পেল তার ততটুকুই জ্ঞান হবে। চোখে যে ঠুলিটা দেওয়া আছে ওটাকে সরানোর কোন পথ নেই, কেউ ওই ঠুলিটাকে খুলে ফেলে দিতে পারবে না। সাপ লুডো খেলার মত, কেউ হয়ত অনেকটা উপরে চলে গেল, সেখান থেকে আবার নীচে চলে এলো। তত দিনে হয়ত ভুলেই গেছে যে, আমি আগে এই ঘরে ছিলাম। কারণ এটা এত বিশাল, সৃষ্টি যবে থেকে চলছে, ভগবান জানেন কত লক্ষ কোটি বছর ধরে চলছে, তত দিন ধরে তারা সবাই অনুভব করে যাচ্ছেন। এটা তো ব্ল্যাকবোর্ড, সৃষ্টিটা তো ব্ল্যাকবোর্ডের মত এতটুকু নয়।

কোন কারণে যদি ওই ঠুলিটা সরিয়ে দেওয়া হয়, চোখটা পুরো খুলে গেল। এবার সবাই কি দেখবে? পুরোটাই দেখবে। এবার আপনি কল্পনা করুন, আপনি ছবির কোন একটা পয়েন্টে আছেন, সেই পয়েন্টের উপরের কোন একটা পয়েন্ট আপনার জন্য ভবিষ্যত আর তার নীচের দিকে কোন পয়েন্ট আপনার অতীত কাল। তাহলে অতীত আর ভবিষ্যত কি আছে? যে পুরো ব্ল্যাকবোর্ড দেখছে তার কি ভূত, ভবিষ্যত বলে কিছু তখন থাকবে? থাকবে না। যার চোখে ঠুলি বাঁধা সেই কিন্তু ভূত ভবিষ্যত দেখছে। যার চোখে ঠুলি নেই, সে ভূত ভবিষ্যত দেখবে না। ঠুলি বাঁধা অবস্থায় যে একটা পয়েন্টে আছে তার কাছে অন্য অন্য পয়েন্টগুলি আলাদা আলাদা দেখাবে। যে পুরোটাই দেখছে, তার কাছে কোনটাই আলাদা না। ঈশ্বর এর পুরোটাই দেখেন, সেইজন্য যখন বলা হয় তিনি ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান তিনটেই জানেন, তার মানে এই নয় যে তিনি ভবিষ্যত জানেন, আসলে তিনি পুরোটাকেই জানেন। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত আমার আপনার জন্য, কারণ আমাদের চোখে ঠুলি লাগানোর জন্য আমরা পিঁপড়ের মত একটা একটা পয়েন্টকে ধরে এগোচ্ছি। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি ঈশ্বরের মত সমস্তটাই দেখতে পান। সেইজন্য তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ মানে পুরো ছবিটাকে তিনি দেখছেন।

উপমাটা হয়ত একশ ভাগ ঠিক না, অবশ্যই ঠিক না, কিন্তু পুরো আইডিয়াটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যখন নেতি নেতি করছে, তখন এর উদ্দেশ্য হল, ঠুলির জন্য এই যে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত যেগুলো দেখছে, এটাকে কিভাবে উড়িয়ে দিয়ে পুরো জিনিসটাকে এক সঙ্গে দেখা যায়। এখন আপনি যে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত টুকরো টুকরো দেখছেন, এটা কি মিথ্যা? মিথ্যা কেন হবে, এটা তো পুরোপুরি সত্য। চোখে যদি ঠুলি থাকে তাহলে এটা পুরো সত্য। তাহলে সময় বা কাল কি মিথ্যা? কেন

মিথ্যা হতে যাবে, চোখে যতক্ষণ ঠুলি আছে ততক্ষণ টাইম সত্য। চোখে যদি ঠুলি না থাকে তাহলে কি মিথ্যা? মিথ্যা না, তখন ওই সত্য-মিথ্যার ব্যাপারটাই আসে না।

ব্রহ্মজ্ঞান, ঈশ্বর দর্শন, এর অর্থ মানে, ওই ঠুলিটা চলে গেছে। পুরো জিনিসটাকে এক সঙ্গে দেখছেন। ফলে ভূত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যত নেই, ইহকাল নেই, পরকাল নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। যদি আবার চোখে ঠুলি লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন কি হবে? আবার ভূত, বর্তমান, ইহকাল, পরকাল সব এসে যাবে; কিন্তু সে জানবে, এগুলো এই রকম দেখাচ্ছে বটে, আসলে কিন্তু সত্যটা এই; আমি কিন্তু এটাকে এ-ভাবে দেখছি। তখন বলবে, দৃশ্যটা মিথ্যা না, ঠুলিটা মিথ্যা, তার মানে মনটা মিথ্যা। ফলে কি হয়? সে বর্তমানে থাকে, অতীতের কথা তার মনে থাকে, ভবিষ্যতের আশায় সে দৌড়াচ্ছে। যারা বলে ভবিষ্যত অতীতের কথা ভুলে যাও, বর্তমানে থাক, তারা এটা জানে না যে, বর্তমান বলেও কিছু নেই। আগে পিছনে বলে কিছু নেই, তুমি এগুলো সব কল্পনা করে নিচ্ছ। জ্ঞানী সেইজন্য কি করে, এটাকে পুরোটাই উড়িয়ে দেয়। পরে যখন ভক্তের কথা আসবে, তখন ভক্ত বলে, না না ওটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক, আমার কোন সমস্যা নেই। ব্ল্যাকবোর্ডের উপমাটা যদি মাথায় থাকে, আপনার পুরো জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে।

ঠাকুর বলছেন, "**ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এ-সব স্বপ্নবৎ**"। এই জিনিসগুলো যে রয়েছে, বলছেন, তুমি যে মনে করছ এগুলো সত্য, আসলে এগুলো সত্য না, স্বপ্নবৎ। স্বপ্নবৎ আর স্বপ্ন দুটো আলাদা জিনিস। আমরা দেখেছি, যাঁরাই অদ্বৈত নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা দুটোকে প্রায়ই মিশিয়ে ফেলেন। তাঁরা স্বপ্নবৎকে স্বপ্ন বলে চালিয়ে দেন। আসলে এটা বৌদ্ধ দর্শন থেকে এসেছে। বৌদ্ধ দর্শনে সব সময় তাঁরা এখানে স্বপ্ন শব্দের ব্যবহার করেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে তা না, তাঁর কাছে ব্ল্যাকবোর্ড যেমন সত্য, তেমনি বিষয়গুলিও (object) সত্য। কিন্তু সত্যকে আমি যেভাবে দেখছি, তাতে নাম আর রূপ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নাম আর রূপ যেমন দেওয়া হল, আপনার কাছে মনে হচ্ছে এটাই যেন শেষ সত্য। এটা বলছেন না যে, এটা মিথ্যা; এর যে অস্তিত্ব নেই, সেটা বলছেন না। বলছেন, নাম আর রূপ যখন দিয়ে দিলেন; আপনি একে বলছেন রাম, তাকে বলছেন শ্যাম, ওকে যদু, তাকে মধু; এবার রাম, শ্যাম, যদু, মধু, এগুলো সব কটা হয়ে গেল একটা অস্তিত্ব। বেদান্ত বলবে, না, এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই।

বোঝাবার জন্য আরও সহজ অন্য উপমা আনা হয়, যে উপমা আমরা প্রায়ই নিয়ে আসি – সোনার গয়না। সোনা দিয়ে প্রচুর ধরণের গয়না হয়, নেকলেসই কত রকম হয়, কোনটা মোটা, কোনটা পাতলা, এটা দামী, এটা কম দামী, সোনা যেমন ভরা আছে সেই অনুসারে গয়না কোনটা পাতলা, কোনটা মোটা, কোনটা বেশি দামী, কোনটা কম দামী। এবার সেই চোখে ঠুলি দিয়ে আপনাকে চালানো হচ্ছে। আপনার ঠুলির কাছে একটা নাকের নথ দেখছেন, আর বলছেন, আগের গয়নাটা কত ভাল ছিল, এটা তো ছোট্ট একটুখানি। তারপর কানের দুল, যাক এটা তাও একটু ভাল হয়েছে। কিন্তু যার চোখে ঠুলি নেই, সে দেখেই বলবে এগুলো সোনার। সে সব গয়না আলাদা আলাদা করে দেখতে যাবে না, কারণ সে জানে পুরোটাই সোনা। ঠুলি নিয়ে যিনি দেখছেন, তাঁর কাছে এগুলো সত্য। যিনি পুরোটা দেখছেন, তাঁর ছোটতে কোন আগ্রহ থাকে না, তাঁর কাছে স্বপ্নবৎ, হ্যাঁ আছে, এর কোন দাম নেই। আসলে এগুলো সবটাই সোনা।

ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে ব্যক্তি (Personal God) তাও বলবার জো নাই। আমরা আগে আগে এগুলো আলোচনা করেছি। মনে ঠুলি লাগানো আছে, এরপর আপনি পুরো ছবির কথা কি করে বলবেন, বলা সম্ভবই না, theoretically, practically impossible, সব দিক থেকে অসম্ভব। কোন মতেই বলা যাবে না যে, এটা কি। ঠাকুর কি করে বলছেন? ঠাকুর এইজন্য বলছেন, তিনি পুরোটাকে দেখে নিয়েছেন; কিন্তু যেমনি এই জগতে নেমে আসছেন, তখন আবার মন

এসে যাচ্ছে। ঠুলি দিয়েই দেখছেন, কিন্তু আগের জ্ঞানটা এমন জোড়ালো ভাবে বসে গেছে যে, তিনি ওটাকেও জানেন, এটাকেও জানেন। যখন ছোটটাকে দেখছেন, তখন বলছেন, হ্যাঁ এটা আছে ঠিকই, কিন্তু এটা শেষ সত্য নয়। সেইজন্য তখন যে আপনি বলবেন, শ্রীরামচন্দ্র ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর, এটাও বলা যাবে না। কারণ সবটাই মনের বাইরে।

জ্ঞানীরা ওইরূপ বলে – যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে – জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীবজন্তু – এ-সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয়মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব – জীবজগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হতে ভালবাসে না। (সকলের হাস্য)

এই যে আমরা আলাদা আলাদা দেখি, চিত্র একটাই কিন্তু চিত্রের প্রত্যেকটি অংশকে আলাদা আলাদা করে দেখছি। আমরা ব্ল্যাকবোর্ড, সোনার গয়না উপমা নিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু এগুলো দিয়ে বিচার হয় না। আসলে শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন, সত্তা একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যের। বলছেন সেই শুদ্ধ চৈতন্যই সব কিছু হয়েছেন। এটা একটা approach, কি রকম? আমরা প্রথমে নাসদীয় সূক্ত আর পুরুষসূক্তমের কথা বললাম। পুরুষসূক্তম এই পন্থা নিচ্ছে যে, পুরুষই সব কিছু হয়েছেন; নাসদীয় সূক্ত এই পন্থা নিচ্ছে যে, সৃষ্টির আগে এবং সংহারের পরে তিনিই একা থাকবেন। জ্ঞানী আর ভক্তের ঠিক এই জায়গাতেই তফাৎ। জ্ঞানী ও ভক্তের যে তফাৎ, এটা যে শুধু সাধনা ও সিদ্ধির তফাৎ তা না, বেদেও এই তফাৎটা থেকে যায় নাসদীয় আর পুরুষসূক্তমের জন্য। কারণ এগুলো ঋষিদের কথা, ওনারা যেমন উপলব্ধি করেছেন তেমনটা বলেছেন। এটা নির্ভর করে যার যার মানসিকতার উপর, আপনার যে রকম মানসিকতা আপনি সেই রকম দেখবেন। আপনার মনের ভাব যদি এই রকম হয়, ঈশ্বর বই আমি কিছু জানি না, ঈশ্বর ছাড়া আমার কিছু লাগবে না।

বেলুড় মঠে অনেক রকম ভক্ত আসছেন। অনেক ভক্তরা আছেন, যাঁরা মহারাজদের জানেন না, চেনেন না; বেলুড় মঠে এলেন, এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, ঠাকুরের ধ্যান করলেন, চলে গেলেন। আবার অনেক ভক্ত আছেন যাঁদের মহারাজদের সঙ্গে পরিচয় আছে, বেলুড় মঠে এসে ভাবছেন, এত দূর এলাম একবার অমুক মহারাজের সঙ্গে দেখা করে নেব, তমুক মহারাজের সঙ্গে দেখা করব। এই তফাৎ। যাঁদের ভক্ত মন, তাঁরা সবাইকে নিয়ে চলেন; যাঁদের জ্ঞানীর মন, তাঁরা ঈশ্বর বই আর কোন কিছুকেই জানেন না। কে ঠিক? দুজনই ঠিক। আপনার মন কি রকম, সেটার উপর নির্ভর করে আপনি কি রকম ব্যবহার করবেন। ঠাকুর জ্ঞানীদের বলছেন শুষ্ক; কারণ বাকিদের সে গ্রাহ্য করে না। ভক্ত রসে-বশে, সবাইকে নিয়ে চলে, একেও দাম দিচ্ছে, তাকেও দাম দিচ্ছে।

আর চিনি হতে না চাওয়াটা, এটা বেদান্তের কথা, আগে আমরা এর আলোচনা করেছি, পরে যেখানে এই প্রসঙ্গ আসবে আবার আলোচনা করব। আসলে এই জ্ঞান, আমরা বস্তুজ্ঞানে যেভাবে কোন বস্তুকে জানি, এই জ্ঞান সেই রকম বস্তুজ্ঞান না, এই জ্ঞান বোধ করা। বোধ তখনই হয় যখন মানুষ তার সমস্ত আলম্বন, যে যে জিনিসের সাথে সে জুড়ে আছে, সব কিছুকে ছেড়ে দেয়। সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার পরই বোধে বোধ হয়, আপনি সেটাকে মনের ভিতরে বোধ করেন। সেইজন্য আপনি নিজে শুদ্ধ চৈতন্য না হলে চৈতন্যকে জানতে পারবেন না। ভক্ত বলেন আমি তো চৈতন্য হতে চাই না, আমি ভক্ত আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি। আমার মনে যত অঙ্কট-বঙ্কট আছে এগুলো সব পরিষ্কার হয়ে যাক, পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আমি ঈশ্বরকে ভালবাসব। ঈশ্বর ছাড়া আমি কিছু জানি না। মানে, আমি শুদ্ধ চৈতন্য হব না। আমার মনে ময়লা যদি থাকে, আর সেটা যদি পর্দা হয়ে থাকে থাকুক। যেমনি মনের পর্দাটা থেকে যায়, সচ্চিদানন্দ তিনি তখন ঈশ্বর রূপে দেখান, যিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, সমস্ত ক্ষমতা যাঁর রয়েছে।

ভক্তের ভাব কিরূপ জানো? হে ভগবান, 'তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান', আবার 'তুমি আমার পিতা বা মাতা'। 'তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ'। ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম'।

এটা খুব আশ্চর্যের দেখবেন, যাঁরা নির্গুণ নিরাকার নিয়ে খুব আলোচনা করেন, তাঁরা হিন্দুদের পৌত্তলিক দেখেন, ওনারা একদিকে বলে পৌত্তলিক আবার অন্য দিকে ভগবানকে ফাদার, মাস্টার রূপে বর্ণনা করে। অন্য ধর্মকে নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য না। যদি যুক্তি দিয়ে দেখেন, তবে অনেক গোলমাল পাওয়া যাবে। তবে কি সেই ধর্মগুলি ভুল? কোন ভাবেই না। যিনি সেটা দেখেছেন, একেবারে ঠিক দেখেছেন। কিন্তু যারা লম্বা লম্বা কথা বলে, ঠাকুর যেমন বলছেন, একদিকে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা; একদিকে তোমার understanding এত দুর্বল আবার লম্বা লম্বা কথা - হিন্দুরা পৌত্তলিক; জ্ঞান না থাকলে যা হয়।

এই যে বলছেন, ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম', ভক্তিশাস্ত্রে এটাকে বলা হয় সাযুজ্য, ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া। সাযুজ্য ভক্ত কোন ভাবেই চায় না, কারণ প্রথম থেকেই সে সবাইকে ভালবেসে বেড়ে উঠেছে কিনা। জ্ঞানীরা সবাইকে ত্যাগ করে, ভক্তরা সবাইকে নিয়ে চলে কিনা। সেইজন্য সে ওই আমিত্বটুকুটা ছাড়তে চায় না, ভালবাসাটাকে সে হারাতে চায় না।

এই দুটো কথা বলার পর ঠাকুর এবার যোগীর কথা বলছেন। ঠাকুরের এই কথা সরাসরি পতঞ্জলি যোগদর্শনের সাথে মিলবে না। রাজযোগের যে পন্থা তা হল, মনকে নিয়ন্ত্রণে এনে মনটা যখন খসে পড়ে যায়, আত্মা তখন স্বরূপে অবস্থান করেন; এ-ছাড়া আর কিছু বলেন না। কিন্তু যোগসূত্রে ঈশ্বরকে পরিভাষিত করছেন – *স পূর্বেষামপি গুরুঃ*, তিনি গুরুরও গুরু, কারণ *কালেনানবচ্ছেদাৎ*, ঈশ্বর সময়ে বাঁধা থাকেন না, গুরু সময়ে আবদ্ধ। তাহলে যোগ মতে স্বরূপে যখন অবস্থান হয় তখন সেই জায়গাতে কি হয়? এই জায়গাতে যোগ নীরব, পরিষ্কার করে কিছু বলেন না। ঠাকুর সেখানে বলছেন –

যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য – জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। রাজযোগে আমরা এটা পাই না। **যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে**। রাজযোগের যে অনুশীলন, সেটাকে ঠাকুর পুরোপুরি বলছেন। তবে ঠাকুর যে বলছেন, পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে, এটাকে যোগে বলছেন স্বরূপে অবস্থান। স্বরূপে অবস্থান করাকে ঠাকুর পরমাত্মা বলছেন। কারণ ঠাকুর নিজে ওই সাধনা করেছেন কিনা, তিনি ভক্তি পথে যেটা পেয়েছেন জ্ঞান পথে একই জিনিস পেয়েছেন, যোগ পথেও একই জিনিস পেয়েছেন। **তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যানচিন্তা করে**। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে ধ্যানযোগের কথা বলা হয়েছে – এটাই হল যোগ। কিন্তু গীতার এই ষষ্ঠ অধ্যায়েও যোগকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, রাজযোগের বর্ণনা কিন্তু তার থেকে আলাদা। এই জায়গাতে ঠাকুর যেটা বলছেন, গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেভাবে যোগের বর্ণনা করা হয়েছে, তার সাথে এটা পুরোপুরি মেলে। এই সব বলে, ঠাকুর পুরো জিনিসটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন।

"**কিন্তু একই বস্তু। নাম-ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান**"।

নাসদীয় সূক্ত যেটা বলছেন, পুরুষসূক্তম্ যেটা বলছেন, ব্যাসদেব পুরো জিনিসটাকে গীতাতে এক জায়গায় নিয়ে এলেন, আবার শঙ্করাচার্য এক জায়গায় নিয়ে এলেন, অধ্যাত্ম রামায়ণ ওটাকে এক জায়গায় নিয়ে এলেন আর ঠাকুর আরও বিস্তারে পুরো জিনিসটাকে এক জায়গায় নিয়ে এলেন – **কিন্তু একই বস্তু। নাম-ভেদমাত্র**। জ্ঞানীরা যেমন নাম-রূপের খেলা বলে সংসারকে উড়িয়ে দেয়, ঠাকুর ঈশ্বরের প্রতি যে নানা রকমের অভিব্যক্তি, এটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন – নাম-ভেদমাত্র বলে। নাম-রূপ বলছেন না,

বলছেন নাম-ভেদ। জ্ঞানীরা সংসারকে নাম আর রূপের খেলা বলেন, ঠাকুর বিভিন্ন ধর্মকে নাম-ভেদমাত্র বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন এই বলে – **যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান** – এখানে উদ্দেশ্য সমন্বয় করা না, উদ্দেশ্য হল, ওখানে ব্রাহ্মভক্ত যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অনেক সময় মনে হত এটা ভাল, এটা মন্দ।

ঠাকুর এই কথার মাধ্যমে দেখাচ্ছেন – তোমার পথ যাই থাকুক, তুমি যদি নিষ্ঠাবান হও, তোমার যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানপ্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তাহলে তুমিও সেখানেই পৌঁছাবে, কাউকে তুমি ছোট মনে করো না, কাউকে বড় মনে করো না। আর নিজেকে নিয়ে একটুও ভাবতে যেও না। ঈশ্বরের প্রতি যদি তোমার নিষ্ঠা থাকে, শেষ অবস্থায় পৌঁছে দেখবে সেই একই জিনিস। এটাকে নিয়ে বিভিন্ন পরম্পরায় বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে কিভাবে যাঁরা নিষ্ঠাবান তাঁরা ঈশ্বরকে পান। এখানে মূল হল, একদিকে যেমন ঠাকুর সমন্বয় করে দেখাচ্ছেন, সবটাকে এক জায়গায় এনে দেখাচ্ছেন, ঠিক ঠিক নিষ্ঠাবান হও, ভালবাসা যদি জাগে, সেই একই জায়গায় তুমি পৌঁছাবে, বক্তব্য এটাই।

অনেকে এসে বলেন, 'আমি চণ্ডী পাঠ করব, চণ্ডী পাঠের বিধি কি'? কি বিধি তোমাকে বলব, তোমার মধ্যে যদি ভালবাসা জেগে যায় তখন আর কিসের বিধি। আগেকার দিনে বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত ছেলে মেয়েকে জানত না, মেয়ে ছেলেকে জানত না। ঘটককে দিয়ে একটা ভাল মেয়ে বা ভাল ছেলেকে খুঁজে বার করা হল। এরপরে সম্বন্ধাদি দিয়ে দুই পরিবারের সম্পর্ক স্থাপিত হত, তারপর বিভিন্ন উপাচার করে ছেলে আর মেয়েকে কাছে নিয়ে আসা হত। বর্তমান কালে সবাই আধুনিক হয়ে গেছে, ছেলেমেয়ে প্রেম করে, প্রেম করার পর বাড়িতে বাবা-মাকে বলে, তোমরা একটু নিজেদের মধ্যে পরিচয় করে নাও। আগেকার দিনে উল্টোটা ছিল, এখন ছেলেমেয়েরাই বলে দেয়, আমাদের সব ঠিক হয়ে গেছে, এবার তোমরা অভিবাবকরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে নাও। যেখানে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হয়ে যায়, সেখানে উপাচার লাগে না। জগন্মাতাকে ভালবাসি, তাঁকে খুশি করার জন্য আমি চণ্ডী পাঠ করছি। ভগবানকে ভালবাসি, তাই নিজের মত গীতা পাঠ করছি। যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে উপাচারের ব্যাপার আসে। উপাচার করতে করতে একটা প্রীতি জন্মায়। এখানে ঠাকুরের উদ্দেশ্য এটাই বলা যে, আসলে সব এক; পথে চলতে শুরু কর, যেখানে পৌঁছাবে তখন জানতে পারবে একই বস্তু। তারপরে যদি আরও সাধনা করতে থাক, তাহলে সাক্ষাৎ তুমি দেখবে – একই বস্তু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয় – আদ্যাশক্তির ঐশ্বর্য

এই পরিচ্ছেদে ঠাকুর বেদান্তের যে ব্রহ্ম আর তন্ত্র মতে যে শক্তি, এই দুটোর সমন্বয় করছেন। আগের পরিচ্ছেদে ঠাকুর জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ এই জিনিসগুলির সমন্বয় করেছিলেন। এবার ঠাকুর ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, কিভাবে অভেদ সেটাকে নিয়ে আলোচনা করছেন, তার সাথে কালী তত্ত্ব নিয়ে কিছু আলোচনা করবেন।

স্টীমারের বাংলা আগ্নেয়পোত, স্টীমার কলকাতার দিকে যাচ্ছে। স্টীমারে ঠাকুর আছেন, আরও অনেকে আছেন, সবাই ঠাকুরকে দেখছেন, ঠাকুরের শ্রীমুখে ভগবদতত্ত্বের কথা শুনছেন, কারুর বোধ নেই জাহাজ কোন দিকে যাচ্ছে, চলছে কি চলছে না। ঠাকুর বলে যাচ্ছেন, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – বেদান্তবাদীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব, জগৎ - এ-সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে, এ-সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।

এর আগে যেখানে আমরা জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ওই জায়গাতে বলা হচ্ছিল কিভাবে নাসদীয় সূক্তে বলা হচ্ছ *স্বধয়া তদেকম্*, সেই তিনি যে এক, তিনি নিজের শক্তিকে নিয়ে

আছেন। জগৎ মানেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়; তাহলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই যে তিনটে জিনিস, এটা কি? আদৌ কি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আছে, নাকি নেই? যদি আছে বলি, তাহলে কে এটাকে চালাচ্ছেন? হিন্দু ধর্মে যে একটা অনন্ত ভাব, এই অনন্ত ভাবের আলোতে হিন্দু ধর্মও জগৎ, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কে অনন্ত ভাবে দেখা হয়, অনেকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

পুরুষসূক্তমে বলছেন, পুরুষই অর্থাৎ ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। অন্য দিকে বেদান্তীরা সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কে দু-ভাবে দেখেন – একটা হল নাম-রূপের খেলা, আসলে যার অর্থ কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, শুধু একটা জিনিসের নাম আর রূপটা পাল্টে যাচ্ছে। যেমন মাটি দিয়ে যখন পাত্র তৈরী করা হচ্ছে, তখন সেই মাটিরই নাম আর রূপটা পাল্টে যাচ্ছে। সোনা দিয়ে কত রকম গয়না তৈরী করা হচ্ছে, কিছুই না, আসলে সোনারই নাম আর রূপ পাল্টে যাচ্ছে। কানের দুল, সেই সোনা কিন্তু রূপটা পাল্টে গেল আর নাম পাল্টে গেল। আসলে সোনা জিনিসটার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। সেইজন্য এই নাম-রূপের যে পরিবর্তন, এটাকে বলে মায়া। মায়া মানে, আসলে এর অস্তিত্ব নেই। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা এটাকে শক্তির খেলা বলেন। যে মনকে আপনি বোঝার জন্য বলছেন, দেখ এগুলো মিথ্যা; সেই মন দিয়েই না ঈশ্বরকে জানা হবে। খুব সাধারণ ব্যাপার। গুরু বলে দিয়েছেন, তুমি এগুলো যা দেখছ সব ভুল, ঈশ্বরই সত্য। খুব সুন্দর কথা। যে মন দিয়ে সে জানবে ঈশ্বরই সত্য, সেই মনই তাকে বলছে জগৎ সত্য। পরিবর্তনটা তাই মনকে করতে হবে, সেইজন্য জগৎকে না করা যায় না। যিনি জগৎকে সত্য দেখছেন, তাঁকে আপনি হাজার বার বলুন, আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর কথা বলছেন, আমি প্রত্যক্ষ যেটা করছি সেটার ব্যাপারে যদি হাজারটা শ্রুতি বাক্য অন্য রকম বলে, সেটাকে নেওয়া যাবে না। আমি জগৎকে প্রত্যক্ষ করছি, কি করে জগৎকে নাকচ করে দেব!

কিন্তু হিন্দু ধর্মের দুর্ভাগ্য, ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে, যাঁরা অদ্বৈতের শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা দেশের যা ক্ষতি করে গেছেন কল্পনা করা যায় না। কারণ অদ্বৈতকে বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিন। আচার্য শঙ্কর যখন মায়া বলছেন, তখনই তিনি বলতে চাইছেন – এর পারমার্থিক সত্তা নেই। পারমার্থিক সত্তা নেই, এর মানে হয় – শেষ পর্যায়টা সত্য নয়। কিন্তু অন্য দিকে যে এটা একেবারে অলীক, সেটাও না। অদ্বৈতকে নিয়ে যাঁরা কথা বলেন, তাঁরা কোথাও এটাকে মিশিয়ে ফেলেন। আচার্য তাই এটাকে বলছেন শক্তি, একটা শক্তির খেলা। কিন্তু সেই শক্তিকে শেষ পর্যায়ে যদি নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দেখা যায় শক্তির অস্তিত্ব নেই। কেন শক্তির অস্তিত্ব নেই? কারণ পরমার্থতঃ শক্তির আলাদা অস্তিত্ব নেই; অর্থাৎ সাংখ্য বা যোগদর্শনের যেভাবে বলা হয় যে পুরুষ আর প্রকৃতি এই দুটো আলাদা সত্তা। বেদ এটাকে নাকচ করছেন। তার মানে শক্তির স্বাধীন সত্তা নেই। স্বাধীন সত্তা নেই মানেই এটা মায়া। মায়া একটা টেকনিক্যাল শব্দ, যতবারই আলোচনা করা হবে দেখা যাবে ততবারই আমরা এটা ভুলে যাই। মায়া মানে মিথ্যা নয়, মায়া অলীক নয়, অলীক মানে যে জিনিসটার কোন অস্তিত্বই নেই, মায়া মানে তা না।

মায়া মানে এর পারমার্থিক সত্তা নেই। পারমার্থিক সত্তা নেই মানে, যেটা দেশ বা কাল বা বস্তুতে সীমিত। শক্তি কেন সীমিত? দুটো কারণে সীমিত – প্রথমটা হল, যিনি ধ্যান করেন, তিনি নির্বিকল্প অবস্থায় দেখেন শক্তি নেই। ঠাকুর অদ্বৈত সাধনা করার সময় ধ্যান করছেন, কিন্তু মন লয় হচ্ছে না, ঘুরেফিরে মা কালীতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে। তোতাপুরী কপালে কাঁচ দিয়ে আঘাত করে বললেন, এই জায়গাতে ধ্যান কর। এরপর মা কালী ধ্যানে এলেন, তিনি জ্ঞান অসি দিয়ে মা কালীর মূর্তিকে খণ্ডিত করে দিলেন। তার মানে ওই জায়গাতে এসে শক্তির এলাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সীমিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ, বেদে বলছে *স্বধয়া তদেকম্*, সেই এক, তিনি নিজের শক্তিকে নিজে ধারণ করে আছেন। আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় বলচেন, শক্তিমান আর শক্তি এক। যিনি শক্তিকে ধারণ করে আছেন, তখন শক্তি আর শক্তিমান এক হয়ে যান। তার মানেই দাঁড়ায় – এই শক্তির স্বাধীন সত্তা নেই।

হিন্দুদের ধর্ম হল অদ্বৈত, আমরা যারা হিন্দু, সবাই অদ্বৈতী। অদ্বৈতী মানে দুটি সত্তা নেই। কিন্তু সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী, কারণ তাঁরা পুরুষ আর প্রকৃতিকে দুটি পৃথক সত্তা বলে মানেন। যোগেও তাই, পুরুষ আর প্রকৃতির সত্তা মানেন, দ্বৈতবাদী। রামানুজাচার্য দ্বৈত ও অদ্বৈতের মাঝামাঝারি অন্য একটা পথ বার করলেন। কিন্তু মাধ্বাচার্য ঘোর দ্বৈতবাদী, কারণ তিনি চৈতন্যকেই দুটো স্তরে নিয়ে নিচ্ছেন। সাংখ্য ও যোগ দর্শন তাও পুরুষ আর প্রকৃতি বা জড় আর চৈতন্য এই দুটো সত্তাকে নিয়ে আসছেন। মাধ্বাচার্য জড়েতেও যাচ্ছেন না, চৈতন্যরেই দুটি আলাদা অবস্থা নিয়ে আসছেন – একটা বিরাট, আরেকটা সরাট, সরাট মানে ছোট্ট করে; আত্মা আর পরমাত্মা দুটোকে আলাদা করে দিচ্ছেন। মাধ্বাচার্য বলুন, রামানুজ বলুন, কপিল মুনি বলুন, এনারা সবাই ঈশ্বরীয় শক্তি সম্পন্ন; আমাদের কোন অধিকারই নেই এনাদেরকে নিয়ে আলোচনা করার।

কিন্তু স্বামীজী বারবার বলেছেন, শাস্ত্র যদি বুঝতে হয় তাহলে ঠাকুরের জীবন, ঠাকুরের কথা দিয়ে বুঝতে হবে। ঠাকুরের জীবনই হল বেদের ঠিক ঠিক ভাষ্য। বেদ যদি আপনাকে বুঝতে হয়, তাহলে আপনাকে কিন্তু কথামৃত বুঝতে হবে। তার মানে আজ পর্যন্ত যত ভাষ্য লেখা হয়েছে, যেমন মহাভারত, মহাভারত কোন গ্রন্থ নয় এটা একটা ভাষ্য, বেদের ভাষ্য। তেমনি পুরাণ একটা ভাষ্য, বেদের ভাষ্য। গীতা একটি ভাষ্য, বেদেরই ভাষ্য। বেদের বক্তব্যটা কি, সেটাকে এনারা বলে দিচ্ছেন। আচার্য শঙ্কর যখন ভাষ্য লিখেছেন, তিনি শ্লোক বা মন্ত্রকে ধরে ধরে ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু এনারা বেদের পুরো জিনিসটাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন।

ঠাকুরের যে জীবন, যা আমরা লীলাপ্রসঙ্গে পাই আর ঠাকুরের যে কথামৃত, এই দুটোকে আমরা পুরো বেদের ভাষ্য রূপে পাই। যদি আপনাকে বুঝতে হয় হিন্দু ধর্ম কি, হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদে কি আছে, তাহলে আপনাকে এই দুটি বই পড়তে হবে – লীলাপ্রসঙ্গ আর কথামৃত। আমরা ঠাকুর-স্বামীজীর চেলা; স্বামীজী আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের বলে দিয়েছেন বেদ যদি বুঝতে হয় ঠাকুরের জীবন দিয়ে বোঝ। ঠাকুরের জীবন দিয়ে বেদকে বুঝতে গেলে তখন দেখা যাবে, ঠাকুর কোন স্তরেও, কোথাও দ্বৈতবাদী নন, সব জায়গায় তিনি অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদী মানে, যেমন ঠাকুর বলছেন, আমি ঈশ্বর বই কিছু জানি না – এটাই অদ্বৈত কথা। এক বস্তু যখন বলছেন, তার মানেই অদ্বৈত। আবার বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু – অদ্বৈত কথা। অদ্বৈত মানে, সত্তা যখন এক হয়ে যায়। সত্তা যখন দুই হয়ে যায়, তখন এটাই দ্বৈতবাদী। আজকে আমরা জানি ঠাকুর অবতার, তিনি সাধক রূপে সাধনা করলেন, তাঁর অদ্বৈত জ্ঞান হল, তারপরেও কিন্তু মা কালীর পূজা চিরদিন করতে থাকলেন। এর অর্থটা হল, আপনার জীবন-যাপন এক রকম চলতে পারে, তত্ত্ব কোন দিন পাল্টাবে না। ঠাকুর তত্ত্বদর্শন করলেন অদ্বৈত রূপে, তাঁর কথাগুলো অদ্বৈতের, অথচ জীবন চালালেন মা কালীকে মেনে।

শঙ্করাচার্যও তাই করে গেছেন। শঙ্করাচার্য ভারতের যত জায়গায় মঠ স্থাপন করলেন, প্রত্যকে জায়গায় একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। আর বিভিন্ন দেবদেবীর উপর তিনি সুন্দর সুন্দর সব স্তোত্র রচনা করে গেলেন। তার মধ্যে একদিকে যেমন নির্বাণষটকম্ আছে, তেমনি আবার মায়ের বন্দনা আছে। এক-একটা স্তোত্র পাঠ করলে বিশ্বাস হতে চায় না যে তিনি একজন ঘোর বেদান্তী। এক্ষুণি ঠাকুর এই জিনিসটাকে বলবেন। যখন শেষ কথায় নিয়ে যাবেন, সেখানে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু থাকে না। সেই সচ্চিদানন্দকে ঠাকুর ঈশ্বর বলছেন, বা যেটাই বলে থাকুন তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের বেদে শেষ কথা পুরুষ, শেষ কথা সচ্চিদানন্দ, সেইজন্য আপনি শক্তি বলুন, মা বলুন, যাই বলুন সবটাই সেই পুরুষ বা সচ্চিদানন্দের নীচে। কারণ নাসদীয় সূক্তেই বলছেন, *স্বধয়া তদেকম্*, নিজের শক্তিকে নিজের মধ্যে ধরে আছে, তখন আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই, সাপ আর সাপের বিষ এক হয়ে আছে। ছোবলটা যখন মারবে তখন বিষটা আলাদা হয়ে যাবে। এরপর থেকে ঠাকুর এবার আলাদা হতে শুরু হলেন। ঠাকুর এবার যেটা বলছেন, এই কথাতে সব পরিষ্কার করে দিচ্ছেন।

কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নাই। যাঁদের কাছে কথামৃত আছে, তাঁরা ঠাকুরের এই বাক্যটাকে দাগ দিয়ে রাখবেন আর মাথায় বসিয়ে রাখবেন। শক্তির এলাকা মানেই মনের এলাকা। যতক্ষণ মনের এলাকা আছে, শক্তির এলাকা আছে, আপনি সমাধিস্থ হচ্ছেন না; সমাধিস্থ মানে নির্বিকল্প সমাধির কথা বলা হচ্ছে। **'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি' – এ-সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে**। যতক্ষণ আপনার বোধ আছে, 'আমি সাধনা করছি', 'আমি সমাধিতে আছি', 'আমার মায়ের দর্শন হচ্ছে', 'আমার ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে'; আবার আমরা যেমন বলি, আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার পরিবার সেই রকম বলি আমার ঈশ্বর, আমার ইষ্ট – সব শক্তির এলাকা। যতক্ষণ আপনি শক্তির এলাকায় আছেন, ততক্ষণ শক্তি পুরোদমে সত্য। এই তত্ত্বটা একবার যদি কোন রকমে ধারণা করে নেওয়া যায়, আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, সাথে সাথে আমাদের অনেক ভুলভাল ধারণাগুলিও মিটে যাবে। আমরা যখন আলোচনা করছি, যখন গ্রন্থ পড়ছি, যখন বোঝার চেষ্টা করছি; এই সব কটা অবস্থায় মন থাকছে, এবং মন যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ ব্রহ্ম আর মন সত্য। ব্রহ্ম যতটা সত্য শক্তিও ততটা সত্য। শেষ কথা জেনে আমার কি হবে, নির্বিকল্প সমাধিতে গিয়ে আমার কি হবে, আমার তো এখন লাগবে। বিল গেটসের কত টাকা আছে জেনে তাতে আমার কি হবে, আমার তো এতটুকু দরকার, আমার এতেই চলবে।

তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। কারণ আপনি যত উচ্চ অবস্থায় চলে যান, শুধু নির্বিকল্প অবস্থা ছাড়া সব অবস্থা শক্তির এলাকা। মাধ্বাচার্য বলবেন, নির্বিকল্প সমাধি হল একটা স্বপ্নাবস্থা, স্বপ্ন যেমন হয়, ওটাও তেমনি একটা অবস্থা। কারণ স্বপ্নাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার মত নির্বিকল্প অবস্থা থেকে মনটা নামিয়ে এই জগতে সবাইকে আসতেই হয়। বলছেন, তুমি যাই কর, এই যেমন একটু আগে বলা হল, সমাধি থেকে নেমে তাঁকে আবার এই জগতেই আসতে হচ্ছে। তাই শক্তি পুরো দমে সত্য।

এককে মানলেই আর-একটিকে মানতে হয়। এই যে আমরা একটু আগে ব্যাখ্যা করছিলাম, আপনি ভাল গুরু পেলেন, গুরু আপনাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি', এগুলো বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাই আমি তো পরিষ্কার দেখছি এই জগৎ আমার সামনে আছে, আমি পরিষ্কার অনুভব করছি যে, আমার খিদে পাচ্ছে, আমার তেষ্টা পাচ্ছে, আমার এই সমস্যা, সেই সমস্যা, আমার ইমোশানগুলো আমাকে নাচিয়ে দিচ্ছে; এগুলো তাহলে কি? গুরু বলছেন, 'ব্যাটা ইয়ে সব্ ঝুট্ হ্যায়'। কিসের ঝুট্? যে মন দিয়ে আমি ঈশ্বরকে সত্য বলছি বা যে মন দিয়ে আমি নিজেকে আত্মা বলে জানব, সেই মন তো আমাকে বলছে এগুলো সত্য। বেদান্ত কক্ষণ এগুলোকে মিথ্যা বলবে না।

শঙ্করাচার্যের পরবর্তি বেদান্তী যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা অন্যান্যদের সঙ্গে তর্কে পেরে উঠতে পারছিলেন না বলে এমন এমন সব ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন যে, ব্রহ্মকে ছেড়ে মায়াকেই ব্যাখ্যা করতে নেমে গেলেন। বেদান্ত হল ব্রহ্মবাদী, সেখান থেকে বলা হয়, যাঁরা ব্রহ্মকে নিয়ে থাকেন তাঁরা ব্রহ্মবাদিন, যাঁদের কাছে মায়ার কোন অস্তিত্ব নেই। আচার্য শঙ্কর হলেন ব্রহ্মবাদী আর শঙ্করাচার্যের পর যাঁরা এলেন তাঁরা সবাই হলেন মায়াবাদী। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। ঈশ্বরই বস্ত এই জ্ঞান কিভাবে হবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর। বক্তারা, ভক্তরা শুধু কামিনী-কাঞ্চনেরই ব্যাখ্যা করে যান। আপনারা ঈশ্বরকে নিয়ে বলুন, ঈশ্বরের উপর জোর দিন, সেটা না করে কামিনী-কাঞ্চনেই কেন নামছেন? আচার্য বলছেন মায়াকে ছেড়ে ব্রহ্মের উপর জোর দাও, ঠাকুরও তাই বলছেন, কামিনী-কাঞ্চনকে ছেড়ে ঈশ্বরে মন দাও। আমরা এর উল্টোটা করছি, ঈশ্বরকে ছেড়ে কামিনী-কাঞ্চনের কাঁটাছেঁড়া করতে নেমে পড়ছি, শঙ্করাচার্যের পরবর্তিকালের বেদান্তীরাও ব্রহ্মকে ছেড়ে মায়ার ব্যাখ্যাতে নেমে ব্রহ্মবাদী না হয়ে মায়াবাদী হয়ে গেলেন। ফলে বিভিন্ন রকম সংশয় হয়ে যায়।

এক-কে যদি মানেন, যদি আপনি মনে করেন ঈশ্বরই আছেন তাহলে আপনাকে শক্তিকেও মানতে হবে। যদি বলেন, আমি শক্তিকে মানি না, তাহলে ঈশ্বরকেও মানা যাবে না। অনেকে যেমন

মনে করে, এই জগৎ বস্তু থেকে জন্ম নিয়েছে বস্তুতেই লয় হয়, এরা হল বস্তুবাদী, এরা ঈশ্বরকেও মানে না, শক্তিকেও মানে না; শক্তিকেও মানে না, ঈশ্বরকেও মানে না। কিন্তু যদি একটাকে মানেন, তাহলে অন্যটাকেও মানতে হবে। আবার অনেকে মনে করেন শক্তিই শেষ। একবার একজন আমার কাছে এসে বলছেন, আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করলাম, করে দেখলাম ঈশ্বরই শক্তি। আমি বললাম, ঠিকই বলছেন, কিন্তু এরপরেও আরেকটি অবস্থা আছে। যখন বিচার করবেন, তখন মনে হবে শক্তিই শেষ কথা, তার মানে আপনি শক্তিকে মানছেন, ঈশ্বরকে মানছেন না। ঠাকুর বলছেন, ''এককে মানলেই আর-একটিকে মানতে হয়''। যদি শক্তিকে মানো, ঈশ্বরকে মানতে হবে। শেষ অবস্থায় দুটো মিলে এক হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এখন এটা তোমার জন্য নয়।

একটা মজার কথা বলতে হয়, যদিও এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যখন আমরা এইট নাইনে পড়তাম, তখন একটা বিষয় হয়ত বুঝতে পারছি না। কোন পরিচিত কেউ এসে গেলেন, তিনি ওই বিষয়টা জানেন। তিনি যদি নিজে থেকে বলেন, 'আচ্ছা তোমার কি কিছু বোঝার আছে'? তখন আমরা অবশ্যই যেটা খুব কঠিন বিষয়, সেটাকে নিয়ে গিয়ে বলব – এই সাবজেক্টটা একটু বুঝিয়ে দিন। তিনি বুঝিয়ে দেবেন ঠিকই, কিন্তু আমরা বুঝতে পারব না। কারণ যেটা সহজ জিনিস সেটা আমি নিজেই বুঝি। ঠাকুরকে যেমন একজন এসে বলছে, মহাশয় আমাকে সমাধিটুকু বুঝিয়ে দিন। অজ্ঞান যখন থাকে, তখন কি হয়, যেটা শেষ কথা, সেটা কোথাও শুনেছে, সেটাকেই আমাদের বলবে শিখিয়ে দিতে। ইংরাজীতে এটা একটা খুব সুন্দর শব্দ আছে – Technical questions of religion। Technical question জেনে আপনার কি হবে? শেষ অবস্থায় কি হয়, আপনার জেনে কি হবে? আপনার সমস্যাটা কি, সেটা বলুন। নির্বিকল্প সমাধিতে কি হয়, অদ্বৈত ভাব কি রকম, এসব জেনে আপনার কি হবে? এগুলোকেই বলা হয় Techncial question। এই টেকনিক্যাল প্রশ্ন হল সময় কাটানো, খোশ গপ্পের মত। রাস্তায় যেতে যেতে, ট্রেনে করে চলতে থাকলে কথা বলে যেমন সময় কাটানো হয়, এও যেন সেই রকম। ক্লাশ থ্রী ফোরের কোন ছেলে যদি জিজ্ঞেস করে, শুনেছি থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি আছে, আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন তো জিনিসটা কি। আপনি তাকে কি বোঝাবেন? আবার ইক্যুইশান দিয়ে বোঝাতে হবে তাকে। আমাদের ঠিক এই সমস্যাটা হয়। যখনই কেউ এসে এই ধরণের উঁচু প্রশ্ন করেন, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিই যে কিছুই জানে না। যিনি জানেন তিনি কিন্তু ঠিক যেই জায়গাতে আটকে আছেন, তারপরে একটা স্টেপ নেবে। যারা জানে না, তারা শুরুই করবে – আমাকে অদ্বৈত বেদান্তটা একটু বুঝিয়ে দেবেন? আমরা বুঝে যাই যে, কিছুই জানে না। আপনার কি সমস্যা সেটা বলুন। যদি বলেন যে, আমি জপ করার চেষ্টা করছি, মন লাগে না; এটা আপনার একটা মূল সমস্যা। তখন আমরা ওটাকে নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তা তো হবে না, শুরুই করবে একেবারে শেষ থেকে। ঠাকুর এই কথাগুলিই এখানে পর পর উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন।

যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি – অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।

দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। প্রথমে ঠাকুর বোঝালেন এবার পর পর উপমা দিচ্ছেন।

তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না। যদি নিত্য না থাকে, *স্বধয়া তদেকম্* যেটা বলা হল, সেটা যদি না থাকে সৃষ্টি হবে না। ঈশ্বরের শক্তি যদি না থাকে সৃষ্টি হবে না। তার সাথে এটা মনে রাখতে হবে, শক্তি কখনই তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা হতে পারে না। চৈতন্য যদি না থাকে, এই জগতে চৈতন্য আসতে পারে না।

আর সমাধিবান পুরুষরা সেই একই কথা বলেছেন। বেদের আগেকার ঋষিরা সেই একই কথা বলেছেন, সেইজন্য এই কথাকে কোন ভাবেই না করা যাবে না।

এবার ঠাকুর ধীরে ধীরে, কালী বা শক্তির যে রূপ, সেই দিকটার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। শক্তির যে কত রূপ হতে পারে বুঝতে হলে আপনাকে শ্রীশ্রীচণ্ডী বইটা একবার খুলে দেখতে হবে। সেখানে প্রথমেই দেখবেন কবচ, শুধু কবচটা পড়লেই দেখবেন শক্তির যে কত রকমের রূপ হতে পারে, একটার পর একটা রূপের বর্ণনা করেই যাচ্ছেন – পূর্বে ইনি রক্ষা করুন, পশ্চিমে ইনি রক্ষা করুন, দক্ষিণে ইনি রক্ষা করুন, উত্তরে ইনি রক্ষা করুন, মস্তকে ইনি রক্ষা করুন – প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা নাম নিয়ে বলছেন, আর সব কটা নামই সত্য। এবার *স্বধয়াটা* বলা হল, সেই আদ্যাশক্তির কথা পরের প্যারাগ্রাফে ঠাকুর বলছেন।

"**আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী**"। এই দেখুন যাঁকে আদ্যাশক্তি বলছেন, তাঁকেই ঠাকুর কালী বলছেন। "**কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী**"। ঈশ্বরের শক্তি আর ঈশ্বর এক, আচার্য শঙ্করও বলছেন, যেটা এর আগে আমরা বললাম, শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। আপনি বলবেন আমি কালী মানি না। ঠিক আছে কালী মানতে হবে না, শক্তিকে তো মানতে হবে। সেই শক্তিকে আদ্যাশক্তি বলুন, আদ্যাশক্তি যদি না বলেন, শুধু শক্তিই বলুন, শব্দ আপনার। তার মানে পুরুষ আর প্রকৃতি এক। আমরা জানি এই কথা সাংখ্য মানবে না, যোগ মানবে না। কিন্তু গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, আমারই পরা প্রকৃতি চৈতন্য, আমারই অপরা প্রকৃতি হল জড়। তার মানে পুরুষ আর প্রকৃতিকে ব্যাসদেব purify করে একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন।

"**একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয় – সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না – এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপভেদ**"। এই জিনিসটাকে এর আগে আলোচনা করা হয়েছিল, যেখানে ঠাকুর বলছেন, যখন ব্রাহ্মণ পূজা করে তখন তাকে পূজারী বলছে, আর যখন সেই ব্রাহ্মণ রান্না করে তখন বলছে রাধুনি বামুন।

এরপর ঠাকুর জলের উদাহরণ দিচ্ছেন। বলছেন, একই জল তাকে কেউ ওয়াটার বলে, কেউ পানি বলে ইত্যাদি। সেইরকম তাঁকে কেউ আল্লা বলে, কেউ গড্ বলছে, কেউ বলছে ব্রহ্ম। সেখান থেকে কেশবচন্দ্র সেনের হঠাৎ মনে হল, কালীকে নিয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে আগে কিছু কথা শুনেছিলেন, ঠাকুরকে সেটা আবার বলার জন্য অনুরোধ করছেন।

কেশব (সহাস্যে) – কালী কতভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন। কেশব সেন যে কথাটা বলছেন, একটু আপত্তিজনক কথা। কারণ এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কেশব সেনের কোন ধারণা নেই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন স্তরের লোক। একটা partly spiritual entertainment, আর partly তাঁর সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদেরকে একটা impress করার জন্য, দেখো আমি যাঁকে নিয়ে আছি, তিনি কত কিছু জানেন, কত রকমের কথা বলেন। বাবা-মায়েরা ছোট্ট সন্তানকে আমাদের কাছে এনে বাচ্চাকে বলেন, 'সোনা বাবা মহারাজকে এটা একটু শুনিয়ে দাও তো'। নরেন যদি কোন বন্ধুকে নিয়ে যায়, নরেন কখন ঠাকুরকে বলবেন না যে, 'আপনি আমাকে ওটা যে বলেছিলেন আমার বন্ধুকে একটু বলুন তো'। যদি বলতে হয় নরেনই বন্ধুকে বলবেন, 'জানিস ঠাকুর এই রকম বলেন'। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটা সমাবেশ, সেখানে ঠাকুরকে এ-ভাবে বলা মানে, 'আপনি আমার গুরু আপনার কাছে আমি শিক্ষা গ্রহণ করব', এই ভাবটা নেই। এই ভাব থাকলে কক্ষণ এ-রকম কথা আসবে না। ঠাকুর কোন entertainer নন। আমাকে যদি এ-ভাবে কেউ বলতে আসে, আমি একটা ধমক দিয়ে বন্ধ করে দিই। ঠাকুর হলেন গুরু, তিনি আচার্য, ঠিক আছে; সুযোগ পেলেন, বললেন; সেটা আলাদা জিনিস।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – **তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাইঃ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী – মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন**''।

তন্ত্র মতে, বেদের *স্বধয়া তদেকম্* যে শব্দটা বলা হল, এটাকে ওনারা এভাবে নেন না। এখানে মহাকাল বলতে ব্রহ্মকে বোঝাচ্ছেন, শক্তি বলতে কালী বোঝাচ্ছেন; চৈতন্য আর শক্তি, জড় না; চিজ্জড়গ্রন্থি যেটা বলা হয়, এটা চিজ্জড়গ্রন্থি না, আসলে চৈতন্য আর শক্তি। চৈতন্যের একটা শক্তি থাকে, যাকে বলা হয় ক্রিয়াশক্তি, তাঁকে কালী বলছেন।

শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব – বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থবাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। আমাদের বেলুড় মঠে যে কালী পূজা হয়, এই শ্যামাকালীরই পূজা হয়। **যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় – রক্ষাকালীর পূজা করতে হয়**। আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য রক্ষাকালীর পূজা করা হয়। এটা যে সব জায়গায় একই ভাবে করা হয় তা না, বিহার, ইউপিতে এই ধরণের বিপদ হলে হরিনাম সঙ্কীর্তন করে, রামধূন করে; বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে আরাধনা করার রীতি আছে।

শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। এই জায়গাতে বেদান্তের মত এসে যাচ্ছে। বেদান্ত মতে যখন সংহার হয়, তখন সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সব কিছু বীজ রূপে থেকে যায়। পরের কল্প যখন শুরু হয় তখন ওই বীজ থেকেই আবার সৃষ্টিতে সব কিছু চলে আসে। **গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে**। মজার কথা, তাই সবাই শুনে হাসছেন। বর্তমান দিনে গিন্নীরা এই রকম করেন না, আগেকার দিনে গিন্নীদেরই সব কিছু সামলাতে হত কিনা।

হ্যাঁ গো! গিন্নীদের ওইরকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট-ছোট পুঁটলি বাঁধা শশাবিচি, কুমড়াবিচি, লাউবিচি – এই সব রাখে, দরকার হলে বার করে। এখনও দেখবেন আমাদের এখানে মায়েরা, আমেরিকাতেও যারা এত নারীর সমান অধিকার নিয়ে কথা বলে, সেখানেও মায়েরা রান্নাঘরটা সামলায়। পুরুষরা অনেক সময় গিয়ে রান্না করে দেয় ঠিকই, কিন্তু রান্নাঘরের সব কিছু গুছিয়ে রাখা, সবাইকে এক করে বেঁধে রাখা, এই কাজগুলো মায়েরাই পারেন।

মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি-নাশের পর ওইরকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। এখন আমরা জগতে যত শক্তির প্রকাশ দেখছি, আদ্যাশক্তি এর সব কিছুর ভিতরেই আছেন। এই যে কালীপূজা করা হয়, দূর্গাপূজা করা হয়, লক্ষ্মীপূজা করা হয়; কালী, দূর্গা, লক্ষ্মী শক্তিরই রূপ। এই আদ্যাশক্তি জগতের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে বিরাজিতা। উনি যদি প্রসন্না থাকেন, তখন জগতের সব কিছুই ঠিক মত চলে। আমাদের একজন মহারাজ মজা করে বলতেন, ঠাকুর সমাধিতে লীন হয়ে আছেন, যার যা প্রার্থনা করার মাকে কর। সৃষ্টির মধ্যে মা আছেন। সেইজন্য চণ্ডী পাঠ আদি নিত্য করতে হয়। স্নানের পরে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে প্রতিদিন অন্তত এক অধ্যায় পাঠ করতে হয়, শেষ হয়ে গেলে আবার প্রথম থেকে শুরু করা, এটাকে বলে পারায়ণ করা। স্নানাদি করে যদি সময় না থাকে তখন যখন খুশি পাঠ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি সময় সুযোগ থাকে, তাহলে স্নানাদি সেরে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে, আসনে বসে নিবিষ্ট মনে পাঠ করতে হয়। মানুষের ভিতর যেমন কুণ্ডলিনী শক্তি থাকে, ঠিক তেমনি মা এই সৃষ্টির কুলকুণ্ডলিনী। তিনি জাগ্রতা হলে, তিনি প্রসন্না হলে সব কিছুই আসে।

জগৎপ্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্ণনাভির' কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই। মুণ্ডকোপনিষদে মাকড়সার কথা আসে। এই দেখুন, ঠাকুর কালীর কথা বলছেন, শক্তির কথা বলছেন, সেখান থেকে চলে এলেন আবার ঈশ্বরে। সেই ব্রহ্মকে যখন শক্তির পর্দা দিয়ে দেখা হয়, আমরা তখন সেটাকে ঈশ্বর বলি, ওটাকেই আমরা কালী বলি। ঠাকুর যেমন বললেন, কোন ধর্মে ওটাকে 'গড্' বলে, কোন ধর্মে 'আল্লা' বলে।

কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়। এখানে আসলে অর্থটা কালোকে নিয়ে না, অর্থটা হল, আমরা আমাদের মনের যে ভাব, সেই ভাবকে আমরা ঈশ্বরের উপর আরোপিত করি। কিন্তু ঈশ্বর সব ভাবের বাইরে। পরে আবার ঠাকুর বলবেন, দেখছে কালীকে পৈতে পরান হয়েছে। একজন বলাতে সে বললে, 'ভাই তুমিই চিনতে পারলে, আমি তো চিনতে পারিনি'। এখনও শ্রীকৃষ্ণের পূজো যেভাবে হয়, ঠাকুরের পূজো সেভাবে শুরু হয়নি। যখন হবে, তখন কোথাও কোথাও ঠাকুরকে গদাই রূপেও পূজা করা হবে। শ্রীকৃষ্ণের যে এত রকমের লীলা, লীলাপ্রসঙ্গে আমরা তার অনেক কিছু পাই, সেখানে আছে গদাই রূপে লীলা, তারপর সেখান থেকে হয়ে যাবে গদাই রূপে পূজো, যেভাবে নাড়ুগোপাল, রামলালার পূজো হয়। তখন যিনি পূজা করছেন, তাঁর যে ভাব, সেই ভাবটা তাঁর উপর দিতে শুরু করবেন। ঠিক তেমনি কালীকে যে আমরা কালো দেখছি, এটা আমাদের ভাব। কিন্তু সেখান থেকে যখন আস্তে আস্তে আরও গভীরে যাচ্ছেন, তখন দেখছেন, তিনি সেই শক্তি, যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ।

আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোন রঙ নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোন রঙ নাই। আসলে ঠাকুর বলতে চাইছেন, আমাদের নিজের যেমন ভাব, ঈশ্বর আমাদের কাছে সেই ভাব অনুযায়ী রূপেই দেখান। এটাকে কিন্তু আমরা মনের কল্পনা বলতে পারিনা। যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি ব্রহ্ম, আমি তাঁকে আমার মনের আয়না দিয়ে দেখি, ফলে ওই রকমই দেখি। যেমন যেমন মনের আয়না পরিষ্কার হবে তেমন তেমন দেখাটাও পরিষ্কার হবে আর শেষে যখন আয়নাটা খসে যাবে, তখন কোন কিছুই নেই – তখন নির্গুণ নিরাকার।

এই কথা বলে জাহাজের মধ্যে ঠাকুর গান শুরু করলেন –

মা কি আমার কালো রে।
কালোরূপ দিগম্বরী, হৃদ্‌পদ্ম করে আলো রে।।

এখানে এই পরিচ্ছেদ শেষ। এরপর পঞ্চম পরিচ্ছেদ, সেখানে ঠাকুর বলবেন, কিভাবে এই যে শক্তি, ঠাকুর যাঁকে মা কালী বলছেন তিনি বন্ধন ও মুক্তি দুইই দেন। কেশব সেন ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে এই হল ঠাকুরের কালীপ্রসঙ্গ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
এ সংসার কেন?

মাষ্টারমশাই এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন 'এ সংসার কেন'। এ সংসার কেন? এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর যদি পেতে চান তাহলে বলতে হয় – এর একটিই উত্তর আছে – কেউ জানে না। সংসার কেন, এই প্রশ্নের উত্তর কারুর কাছে নেই। স্বামীজী শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে গেছেন। তার আগে তিনি যেখানে যেখানে ছিলেন সেখানে কিছু কিছু কথা বলতেন। সেই রকম একটা জায়গায় স্বামীজী কথা বলছেন, যখনই আমরা 'তাঁর ইচ্ছা' বা 'God's will'বলছি, তার মানে আমরা বলতে চাইছি, আমার কাছে উত্তর নেই। তারপর স্বামীজী বলছেন, এই ব্যাপারে হিন্দুরা সৎ, হিন্দুরা পরিষ্কার

বলে দেয়, আমার কাছে উত্তর নেই। তবে স্বামীজী এই কথা বেদান্তের দিক থেকে বলছেন। বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখলে, তখন এই কথাই বলা হয় যে, আমার কাছে উত্তর নেই। 'উত্তর নেই' এই শব্দটাকেই বলেন মায়া। মায়া মানে, আমার কাছে জানা নেই, যিনি অখণ্ড, তিনি খণ্ডিত হয়ে কি করে দেখাচ্ছেন? যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি এত জন হয়ে এখানে বসে আছেন। আর আত্মার যে স্বরূপ, সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিনটের কোনটাই জগতে কোথাও দেখতে পাইনা। সব সময় দেখছি চারিদিকে মৃত্যু দেখছি। দেখছি, অজ্ঞানে আমরা ডুবে আছি আর সংসারে সুখের গন্ধ পর্যন্ত নেই। এটা কেন? বলেন, এটাই রহস্য।

যাঁরা ভক্ত, ভক্ত মানে যাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেছেন আর ভক্তিকে আশ্রয় করে আছেন। এই ধরণের ভক্তদের কথা প্রসঙ্গে কথামৃতে ঠাকুর বারবার বলছেন, সাধনা করে যখন সিদ্ধির অবস্থায় চলে যান, তখন আর তিনি সেখান থেকে ফেরেন না, বিশেষ করে নির্বিকল্প সমাধি যদি হয়ে থাকে, আর ফেরেন না। তবে কোন একটা কারণে, এটাও যে ঈশ্বর কেন করেন কারুর কাছে কোন উত্তর নেই, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ফিরে আসেন। ফেরত যখন আসেন, তখন এই সংসারের কোন একটা কিছুকে আলম্বন বানিয়ে সংসারে অবস্থান করেন। এই আলম্বন জ্ঞান হতে পারে, ভক্তি হতে পারে; যেমন নারদ, তিনি ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন এটা নিয়েই আছেন। ঠাকুর শঙ্করাচার্যের নামে অনেকবার বলছেন, শঙ্করাচার্য বিদ্যার আমি রেখে দিয়েছিলেন। বিদ্যার আমিতে তিনি জ্ঞানকে আলম্বন করে আছেন। ঠাকুর নিজে জ্ঞান আর ভক্তি দুটোকে নিয়েই আছেন। ভাগবতে আমরা যে শুকদেবের চরিত্র পাই, সেখানেও তাই, শুকদেবের মধ্যে জ্ঞান আর ভক্তি দুটোই আছে। জ্ঞান আর ভক্তি আলাদা কিছু না – তফাৎ শুধু ভাবের। হিন্দু শাস্ত্র এত বৃহদাকারে আছে যে, সব শাস্ত্র আমাদের পড়া সম্ভব না। ভাসা ভাসা যেটা বড়দের কাছ থেকে শুনে এসেছি, কিছু শুনে, কিছু নিজে পড়ে সেটা দিয়ে একটা আইডিয়া দাঁড় করিয়ে নিয়েছি, ওই দিয়েই আমাদের কাজ চলে।

আসলে তা নয়, হিন্দু ধর্ম অনেক গভীর ধর্ম, সত্যিকারের অনেক গভীর ধর্ম। যখন এই গভীরতায় কেউ ঢুকবে, তখন জ্ঞানমার্গের এই কথাগুলো, যেখানে আত্মাই সত্য, সচ্চিদানন্দই সত্য, এই জিনিসগুলিই ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। তা আপনি রাজযোগেই যান, কর্মযোগেই যান, ভক্তিযোগেই যান, এগুলোই ঘুরে ঘুরে আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। আগে আগে আমরা আলোচনা করেছি, পরে যখন আমরা সুযোগ পাব আবারও আলোচনা করব। ভগবান যখন নরদেহে আসেন, তখন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যাতে তাদের আধ্যাত্মিক উত্থান হয়, এটার জন্য জ্ঞান ভক্তি দরকার। ঠাকুর বারবার বলছেন, অবতার আসেন জ্ঞান ভক্তি শেখাতে। আমাদের মন কাঁচা, এই কাঁচা মনে আমাদের একটা ধারণা হল – জ্ঞান আলাদা, ভক্তি আলাদা। আমাদের কাছে ভক্তি মানে হরিনাম করা, আর জ্ঞান মানে বেদান্তের বিচার করা; জ্ঞান আর ভক্তি একেবারেই তা নয়।

এবার জ্ঞানকে যখন ভক্তিতে নামাবেন, তত্ত্বকে যখন ভক্তিতে নামাবেন, তখন জিনিসটা কেমন হয়ে যায়? সেই সচ্চিদানন্দই বস্তু, সচ্চিদানন্দই আছেন, তাছাড়া কিছু নেই। এই জগতে থাকার সময় সচ্চিদানন্দের সঙ্গে আরেকটা জিনিস অবশ্যই এসে যায়, অন্য আর কিছু নাও হতে পারে। যেমন ধরুন, যদি আপনি বিচার করেন এই টেবিলটা আছে কিনা, এই মাইক্রোফোনটা আছে কিনা, পেনটা আছে কিনা, আমি আপনি আছি কিনা; এগুলোকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। জীবনকেও যদি দেখা হয়, দেখছে জীবন এই আছে এই নেই। আবার দেখা যায়, প্রত্যেক ক্ষণে সব কিছু পাল্টাচ্ছে। একটা জিনিস আছে, যেটা সবারই মধ্যে সাধারণ, সেটা হল মন। সংসারকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয় বা সংসারের বৈশিষ্ট্যকে যদি বলতে হয়, তাহলে সেখানেও একটাই শব্দ আসছে 'মন'। মন আছে বলে সংসার আছে। মন যদি না থাকে, তাহলে কি থাকবে বলা যায় না। আমরা যখন গভীর নিদ্রায় যাই, তখন আমরা জানি না কি আছে। সমাধিবান পুরুষরা বলেন, মন যখন থাকে না, মন যখন

লয় হয়ে যায়, তখন তাঁরা দেখেন সচ্চিদানন্দই আছেন। বৌদ্ধরা সেটাকে বলেন নির্বাণের অবস্থা, শূন্য, কিছু নেই। কিছু নেই কোন অর্থে বলেন? ওনাদের এর উপর নিজেদের তর্ক আদি আছে; কিন্তু আবার কিছু আছেন যাঁরা এটাকে মানেন। স্বামীজী এই পয়েন্টে বৌদ্ধ দর্শনকে প্রচুর আক্রমণ করেছেন।

তাহলে এখন দুটো জিনিস এসে যাচ্ছে। বেদান্ত যেমন বলে ব্রহ্ম আর মায়া, তেমনি যাঁরা শক্তি সাধনা করেন তাঁরা বলেন, ব্রহ্ম আর শক্তি। ঠাকুরও বারবার অগ্নি আর দাহিকা শক্তির কথা বলছেন, এও বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। আমরা ব্রহ্মকেও বুঝি না, শক্তিকেও বুঝি না, আমরা একটা জিনিসকে বুঝি; আমাদের আচার্যরা, গুরুজনরা বারবার একটা কথা বলে এসেছেন, ঈশ্বর আছেন। এটাকে নাকচ করা যাবে না। আরেকটা যেটা দেখছি তা হল, আমি তুমি হাজারটা জিনিসের মধ্যে একটা যেটা সাধারণ; সেটা হল মন। যে কোন শাস্ত্রে, এমনকি বিজ্ঞানেও দেখা যায়, সব ঘুরে কোথাও মনের একটা সাংঘাতিক গুরুত্ব চলে আসে। সংসার মানেই মন। মন যদি না থাকে, সংসার নেই। আমরা সবাই এই সংসারে আছি, সংসারে আমরা যা কিছু চাইছি, চাঁদে মানুষ পাঠাতে চাইছি, তাতেও মন লাগবে; ভারত পাকিস্থানের সীমান্তে যুদ্ধ লাগাতে চাইছে, তাতেও মন লাগবে; দুটো টাকা আয় করতে গেলে তাতেও মন লাগবে আবার ঈশ্বর দর্শন যদি করতে চাই, তাতেও মন লাগবে। ভাল জীবন-যাপন করতে চাই, তাতেও মন লাগবে; যে আত্মহত্যা করতে চাইছে, তাতেও তার মন লাগবে; মন ছাড়া এই সংসারে কোন গতি নেই। তাই বলেন, সংসার মানে মন।

তার মানে জীবনে যত সাধনা হতে পারে, যত রকমের সাধনা করতে হয়, তার জন্য ছোটবেলা থেকে যত ট্রেনিং নিতে হয়, সব কিছু হয় মনকে নিয়ে। আমরা যে ঈশ্বর উপলব্ধির কথা বলি, আমি ঈশ্বর দর্শন করতে চাই; আরে আপনিই তো ঈশ্বর, কি ঈশ্বর দর্শন করবেন! যদি বলেন, আমি নিজেকে দেখতে চাই; আরে আপনি তো নিজেই আছেন, আর দেখার কি আছে। ঠাকুর তো কৃপা করছেন না – এর থেকে বেশি বোকা কথা আর হয় না, ঠাকুর তো আপনার ভিতরে। কবীর দাস খুব সুন্দর বলছেন, মোঁকো কাঁহা ঢুঁঢো ম্যায় তো তেরে পাস্ হুঁ, আমি তো তোমার ভিতরে, কোথায় তুমি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। সমস্যাটা ঈশ্বরকে নিয়ে না, সমস্যাটা 'আমি'কে নিয়েও না, সমস্যাটা মনকে নিয়ে। ঠাকুর এবার শুধু মনকে নিয়ে বর্ণনা করে যাচ্ছেন। ভক্তির যে মত, সেখানে ঈশ্বর আছেন আর এই মন আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদির প্রতি)–বন্ধন আর মুক্তি–দুয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি 'ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী'।

আমাদের প্রচলিত যত ধর্মীয় কথাগুলো আছে, এই কথাগুলো সব জায়গাতে ঘুরে ঘুরে আসে; যার একটা পরিণতি হল – সবই তাঁর ইচ্ছা। বেদান্ত এটাকে খুব সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করে। বেদান্ত বলছে, সেই সচ্চিদানন্দই আছেন, তাছাড়া আর কিছু নেই। কোন একটা কারণে তিনি যখন বলেন, আমি এক আমি বহু হব, তখন বিশ্বমনের সৃষ্টি হয়ে যায়। সেখান থেকে হয়ে হয়ে এক-একজনের মন, বিশিষ্ট মন হয়ে যায়। সেই সচ্চিদানন্দকে যদি সমষ্টি মন দিয়ে দেখি, তিনি তখন ঈশ্বর রূপে দেখান। আর যখন ব্যষ্টি মন, বিশেষ মন দিয়ে দেখছি, তিনি তখন আপনার ভিতরে আত্মা হয়ে দেখান। আত্মাই একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য, যাঁর সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত ক্ষমতা আছে। কিন্তু মনে কেন আমরা আবদ্ধ?

একটা ছোট্ট উপমাতে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। একটা ব্ল্যাকবোর্ডে ছক কেটে দিন – লম্বা লম্বা অনেকগুলো লাইন একদিকে আর আড়াআড়ি পাঁচশ খানা লাইন অন্য দিকে। এবার প্রত্যেক খোপে আপনি আলাদা আলাদা জিনিস দিলেন। এইভাবে পুরো ব্ল্যাকবোর্ডটা একটা ছবি হয়ে গেল। সেই ছবিটাকে এখন নানা যে খাঁজ খাঁজ আছে, তাতে ভেঙে দিলেন। এবার আপনার চোখে একটা ঠুলি লাগিয়ে দেওয়া হল, ঠুলিকে সরানো যাবে না, যা দেখবেন ওই ঠুলির মাধ্যমে। এবার আপনি নীচ থেকে দেখতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে ঠুলি সমেত আপনি ঘাড়টাকে নাড়াতে থাকলেন। প্রথম খাঁচায় আপনি দেখলেন কিছু একটা লেখা আছে। সেখান থেকে আপনি একটু ডানদিকে সরলেন, আরেকটা খাঁচা এসে

গেল, সেটাকে দেখলেন। ওখান থেকে আরেকটু সরলেন, তিন নম্বর খাঁচা এসে গেল, এই করে করে আপনি চার নম্বরে এসে গেলেন। পিছনে আপনার যাওয়ার উপায় নেই, আপনি শুধু সামনেই যেতে পারেন। এবার যখন মোটামুটি পাঁচ নম্বর খাঁচায় চলে এসেছেন, আপনি যদি এখন এক মিনিটের জন্য বোঝার জন্য দাঁড়ান; আপনি দেখবেন চার নম্বর, তিন নম্বরে কি ছিল সেটা আপনার স্মৃতিতে দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এক নম্বরে কি ছিল, সেটা আপনার মনে নাও থাকতে পারে। কিংবা আরও বেশি খাঁচা এগিয়ে যান, আপনার আগের খাঁচাগুলো মনে নাও থাকতে পারে। এখানে এসে সব সময় আপনার মনে হতে থাকবে, এরপর কি। এই যে একটু একটু করে নড়ে এগিয়ে আসছেন, পিছনের যা খাঁচাগুলো পড়ে থাকল, এটাই হল অতীত। আর পুরো একটা খাঁচাকে ছেড়ে দেওয়া, এটা হল যেন পুনর্জন্ম।

বাচ্চা বয়সে আমরা বায়োস্কোপ দেখতাম, বায়োস্কোপে অনেকটা এই রকমই হয়। বায়োস্কোপে একটু ফুটোর মধ্যে চোখ বাঁধা আছে। ভিতরে ছবিগুলো ঘুরছে। যে ছবিটা চলে গেল, সেই ছবিটা আপনার মনে আছে, এই ছবিটা ছিল। কিন্তু পুরো দৃষ্টিটা থাকে এখন যে ছবিটা এসেছে তার উপর; এরপর কি ছবি আসছে, একটা উত্তেজনা থাকে। এই করে করে আপনি সামনের দিকে যাচ্ছেন, পিছনে আর কখনই আপনি যেতে পারবেন না। গতিও বাড়াতে পারবেন না, বায়োস্কোপে যেমন গতি বাঁধা থাকে। আর এর কখনই শেষ নেই, এটা বৃত্তাকার।

কোন ভাবে যদি এবার ঠুলিটা খুলে দেওয়া হয়, তার মানে বায়োস্কোপ থেকে আপনি দৃষ্টিটা সরিয়ে দিলেন, আর ছবির রিলটা বার করে দিলেন। এবার আপনি কি দেখবেন? পুরো ব্ল্যাকবোর্ড এক সঙ্গে দেখবেন। তখন কি দেখবেন? না আছে ভূত, না আছে বর্তমান, না আছে ভবিষ্যত। না আছে পরিবর্তন, না আছে আমি, না আছে তুমি, কিছুই নেই। আছে এক। সেই এক যদি আপনিই থাকেন, তাহলে এবার সেই একের কি হবে? সেটাও নেই, কি আছে বলাও যাবে না। তাহলে তখন যে জায়গাটায় ছিলেন, যেখানে আনন্দ বোধ করছিলেন, সেটা কি ছিল? সুখ ছিল। যে জায়গাটায় ভাল লাগছিল না, সেখানে দুঃখ ছিল। এখন কিছুই নেই, সুখও নেই দুঃখও নেই। কি আছে? যা আছে তাই আছে। যে ঠুলিটা ছিল, সেই ঠুলিটা আর নেই। কারণ ওই ঠুলিটাই সব বর্ণনা দেয়, তাই মুখে বলা যাবে না কি আছে। বায়োস্কোপের মত লেন্স দিয়ে আপনি যখন সামনে দেখছেন, এটাই হল জীবন, যেটা আমরা মন দিয়ে দেখছি। দেখছি আমরা সেই সচ্চিদানন্দকেই, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই তো।

আমরা যে সংসার বলছি, যে সংসারকে আমরা দেখছি, এটা কিছুই না। আমাদের চোখে যে ঠুলি দেওয়া আছে, সেই ঠুলি দিয়ে একটা বিশেষ জায়গা দেখছি। দেওয়ালে স্বামীজীর ছবি আছে। এই ছবিকে গ্রীড দিয়ে ছোট ছোট হাজারটা টুকরো করে দেওয়া হল। এবার কি দেখবেন? কখন দেখছেন, আরে এতো স্বামীজীর পাগড়ির একটা টুকরো, পুরো ছবি কক্ষণ আসবে না। একবার যদি চোখ থেকে ঠুলি সরিয়ে দেওয়া হয় তখন পুরো ছবিটা চলে আসবে। তখন না থাকে ভূত, না থাকবে বর্তমান, না থাকবে ভবিষ্যত। না থাকবে জন্ম, না থাকবে মৃত্যু, কিছুই থাকবে না। সমস্যাটা ঈশ্বরকে নিয়ে না, সমস্যাটা দুইকে নিয়েও না, সমস্যাটা হল – চোখে যে ঠুলিটা লাগানো আছে। এই ঠুলিটার জন্য যিনি এক, তিনি বহু হয়ে দেখান। আর যখন বহু হয়ে দেখান, তখন ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান এসে যায়; জন্ম, মৃত্যু এসে যায়, বাকি সব কিছু এসে যায়।

আজকে আমরা জীবনে যা কিছু দেখছি, সেই সীমিত মন অসীমকে দেখছে। মন বাঁধা, পিছনের জিনিসকে মনে রাখতে পারে, সামনের জিনিসকে শুধু কল্পনা করতে পারে, থাকে বর্তমানে। সেইজন্য আমাদের কাছে বর্তমানের খুব দাম। যার জন্য এখন যদি খুব কষ্ট হয়, মনে হবে আমি শেষ হয়ে গেলাম, আমি ভেঙে গেলাম। পিছনের যদি একবার তাকানো যায়, তখন দেখবে – ধুস্ কতবার এই রকম আমার সাথে আগে আগে হয়েছে। খালি ভেবে যাচ্ছি, সামনে কি হবে। কিছুই হবে না, এটা এভাবেই চলবে। আসলে কিছুই চলার নেই, পুরো জিনিসটা একক, একই আছে। এখন এই যে মন

জিনিসটা এসেছে, কোথা থেকে এসেছে? নিজে থেকে উৎপত্তি হবে না, কারণ মন স্বাধীন নয়, মন তো আসলে জড়। বেদান্তীরা বলে, আমাদের জানা নেই, এটা কেন হয়, সেইজন্য বলে মায়া।

কিন্তু ভক্তদের কাছে ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তাঁরা বলেন তাঁর ইচ্ছা। কেন তাঁর ইচ্ছা? তাঁর ইচ্ছা, আমি কি করে জানব তাঁর এই ইচ্ছা কেন। আমি একটা ক্ষুদ্র প্রানী, আমার এতটুকু বুদ্ধি, ভগবানের মন আমি কি করে জানব। তাঁর ইচ্ছা মানে, তিনি এটা করেছেন, কেন করছেন, এর ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। আর ঠাকুরের মত যিনি অবতার বা কোন সন্ত-মহাত্মা, তাঁরা দেখেন যাবতীয় যা কিছু হয় সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। আমরা তাঁদের কাছ থেকে শুনে মুখের কথায় বলি, তাঁর ইচ্ছা।

বন্ধন আর মুক্তি – দুয়ের কর্তাই তিনি। আপনার আমার চোখে ওই ঠুলিটা তিনি রাখবেন কি রাখবেন না, তিনি ঠিক করবেন। এই দুটো কথা বলে তিনি রামপ্রসাদের গান করছেন। গান সমাপ্ত হয়ে গেলে ঠাকুর আবার কথা বলছেন।

"**তিনি লীলাময়ী**"। এটা খুব মজার। যেভাবে বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে যেন কালীর কথা এসে যাচ্ছে। কৃষ্ণ আর কালীতে ঠাকুর কখনই ভেদ করতেন না। কারণ ভগবান পুরুষ, না নারী, নাকি দুটোর পারে, কিছু বলার উপায় নেই। লীলাময় বললেও যা, লীলাময়ী বললেও তাই। "**এ-সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন**"।

যিনি ঈশ্বরকে সাক্ষাৎকার করেছেন, এবার আপনি কল্পনা করুন, আমাদের এখানে এতজন আছে সবারই চোখে ঠুলি লাগানো আছে, আর ঠিক এ-ভাবেই ব্ল্যাকবোর্ডকে দেখছে। আমাদের মধ্যে একজনের ঠুলিটা চোখ থেকে খুলে গেল, সে তখন কি বলবে? কি করবে? কি আর করবে, আনন্দ করবে আর বলবে, আরে এতক্ষণ আমি কেন কান্নাকাটি করছিলাম, এত হাসছিলামই বা কেন। প্রথমে তার বিশ্বাসই হবে না, কারণ জন্মজন্মান্তর ধরে এই জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না দেখে আসছে কিনা, কিছুক্ষণের জন্য সে বিশ্বাসই করতে পারবে না। দু-চারজনকে এই কথা বলতে গেলে, তার কথা তারা বিশ্বাসই করবে না।

ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা জানি না কেন সৃষ্টি করেছেন। তাই ধরেই নিতে হয় যে তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছে যখন হয়েছে, তাহলে সৃষ্টিটা চলবে, সৃষ্টি থামবে না। সেইজন্য কোন দিন সবাই মুক্ত হবে না। কারণ তিনি এটা চেয়েছেন, তিনি যখন চেয়েছেন তখন এটা চলুক, লীলা চলতে থাকুক। এই টপিকটা কথামৃতে ঘুরে ঘুরে আসে। আমরা দেখি আমাদের ইউটিউবের লেকচারে অনেক প্রশ্ন আসে। এই প্রশ্নগুলি আসার কারণ হল, আমরা সব সময় আমাদের মনের আধার থেকে সচ্চিদানন্দকে নিয়ে প্রশ্ন করি, এভাবে প্রশ্ন হয় না। যদি মনকে আধার করে প্রশ্ন করতে হয়, তাহলে রাজযোগ পড়ুন, রাজযোগ পড়লে কোন সমস্যা হবে না। আর সচ্চিদানন্দকে নিয়ে যদি প্রশ্ন করতে হয়, তাহলে সচ্চিদানন্দ হয়ে ভেবে তখন প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজতে হবে, তখন দেখবেন কোন সমস্যাই নেই। আপনি থাকবেন একটাতে আর অনুসন্ধান করবেন আরেকটার, এ হয় না। কলকাতা শহরকে জানার জন্য আপনি দিল্লী শহরের নক্সা দিয়ে মেলাতে চাইছেন, কোথাও মিলছে না, তখন বলছেন, কই কিছুই তো মিলছে না। মিলবে কি করে, নক্সাটা তো দিল্লীর, মেলাতে হলে দিল্লী যান। মনকে যদি জানতে হয়, তাহলে রাজযোগ পড়ুন, সমস্ত বুঝে যাবেন। আর যদি ঈশ্বরের দিক থেকে জগৎকে দেখতে হয়, তাহলে কথামৃত পড়তে হবে। আর সচ্চিদানন্দকে মাথায় রেখে করুন, কোথাও কোন সমস্যা থাকবে না। আমাদের সমস্যা শুধু স্ট্যাণ্ডকে নিয়ে হয়ে যায়। আমরা গিয়ে বলব, ভগবান; খুব সুন্দর, আপনি ভগবানে পৌঁছে গেলেন। তারপরেই বলবেন, তিনি এটা সৃষ্টি করলেন কেন? তার মানে আপনি মনের রাজ্যে চলে এলেন, এটা হয় না। সেইজন্য যাঁরা বেদান্তী, মাণ্ডুক্যকারিকাদি যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা বলছেন, সংসার নেই, সৃষ্টি আদপেই হয়নি। তিনি কেন যাবেন সৃষ্টি করতে!

ভক্তরা সেভাবে নেন না, ভক্তরা বলেন তিনি লীলা করছেন। কেন লীলা করছেন? আমি কি করে জানব; তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা এখানে যখন বলা হয়, তখন এর অর্থ হয় – এর উত্তর আমার কাছে নেই। আমরা যখন বলি ঠাকুরের ইচ্ছা, সেখানে আমরা পাটোয়ারি করি। ভগবানকে একটা ডাস্টবিন বানিয়ে, আমরা আমাদের যত দোষ-ত্রুটি, অকর্মণ্যতা, সব ঈশ্বরের উপর চাপিয়ে দিই এই বলে – তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে। 'তাঁর ইচ্ছা' – একদিকে এর অর্থ হয়, আমার কাছে উত্তর নেই; অন্য দিকে এর অর্থ, এই সংসারে যাবতীয় যা কিছু হয়, সেটার পিছনে চৈতন্য সত্তা রয়েছে। চৈতন্য সত্তা একটা, দুটো, তিনটে নেই, চৈতন্য অখণ্ড। এই কথাই বলছেন

ব্রাহ্মভক্ত – মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সংসারে বদ্ধ করে রেখেছেন?

আরে ভগবান কেন কাউকে বদ্ধ করতে যাবেন। তাঁর ভারি বয়ে গেছে আপনাকে বদ্ধ করতে। যিনি আপ্তকাম, যাঁর মনে কোন কামনা-বাসনা নেই, তিনি কেন আপনাকে বাঁধতে যাবেন! আমাদের প্রশ্নগুলো সব সময় এলেমেলো হয়ে যায়। ঠাকুর এটাকে ব্যাখ্যা করছেন যে, না, তিনি কাউকে বদ্ধ করে রাখেননি, বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ – তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। কাকে নিয়ে তিনি খেলা করবেন? আমাদের আবার ব্ল্যাকবোর্ডের উপমাতে যেতে হবে। আমরা যদি টেলিস্কোপের মত লেন্স লাগিয়ে দেখি, তখন দেখবেন তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু তো নেই। সচ্চিদানন্দের পরিভাষা হল – ঈশ্বর বই আর কিছু নেই। তাহলে কাকে নিয়ে তিনি খেলা করছেন? একদিকে আমি মনে করছি তিনিই সব কিছু হয়েছেন, আবার মনে করছি আমি আলাদা একজন, তিনি আলাদা অন্য কেউ। কথাগুলো এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে নাকি? যদি তিনিই সব, তাহলে তিনি কাকে নিয়ে লীলা করছেন; তিনি তাঁকে নিয়েই লীলা করছেন। তাহলে এখান আমি, আপনি কোত্থেকে আসছে। ঘুরে ফিরে দেখবেন আমাদের যে ঈশ্বরের ধারণা তা হল, আমি আলদা, আপনি আলাদা; আমাদের দুজনের নিয়ন্তা হয়ে তিনি উপরে বসে আছেন। অন্যান্য ধর্মের এটা মত হতে পারে, হিন্দুদের মত হতে পারে না। হিন্দুদের মত সেই সচ্চিদানন্দই আছেন। আর তিনি যে লীলাগুলো করছেন, লীলাতে তিনিই সমস্ত কিছু হয়েছেন। এই কথা ঠাকুর বারবার বলছেন। এটা জেনে গেলে তো খেলা চলবে না। ঠাকুর তখন বলছেন –

"**বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না**"। আগেকার দিনে গ্রাম দেশের বাচ্চারা এই রকম খেলা করত, সবাই দৌড়াদৌড়ি করত, আর মাঝখানে একটা বুড়ী থাকত, বুড়ীকে যদি ছুঁয়ে নেয় তাহলে তাকে আর কেউ ধরতে পারবে না। "**সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়**"? এটা একটা খুব সহজ যুক্তি, ভগবান যদি সর্বশক্তিমান হন, যদি ভগবানই একমাত্র থাকেন, আর এই সৃষ্টি যদি তিনি করে থাকেন; তাহলে এটা তো হতে পারে না যে, তিনি সৃষ্টি করলেন আর দু মিনিটের মধ্যে সৃষ্টিটা তিনি গুটিয়ে নেবেন! তা কি কখন হয়! এটা লীলা। ভক্তরা এটাকে লীলারূপে দেখেন। লীলা একটা টেকনিক্যাল শব্দ, যার অর্থ হল, এটাকে যে অর্থে আমরা সত্য মনে করি, সেই অর্থে এটা সত্য না। আমরা যে ভগবানকে সত্য বলে জানি, এই সত্য মানে, এর সত্তা চিরস্থায়ী, কোন পরিস্থিতিতে এই সত্তা চলে যাবে না।

রাজযোগে প্রকৃতির সত্তা চিরন্তন, কোন পরিস্থিতিতে প্রকৃতি শেষ হয়ে যাবে না। সাংখ্যে পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা, কোন ভাবে পুরুষ আর প্রকৃতি জুড়ে গেছে। পুরুষ যখন আবার আলাদা হয়ে যাবে তখনও প্রকৃতির সত্তা থাকবে। অন্য দিকে এটা অলীক নয়। যেমন বন্ধ্যাপুত্র অলীক, তার অস্তিত্ব নেই, সেই অর্থে এটা অলীক না। তাই যখন জিনিসটা সত্যও না, মিথ্যাও না; তখন সেটাকে বলে লীলা। যতক্ষণ দেখছি ততক্ষণ সত্য বলে বোধ হয় আবার বিচার করলে মিথ্যা বলে বোধ হয়। ব্ল্যাকবোর্ডের যে উদাহরণ দেওয়া হল, এটাকে যদি মনে রাখা হয়, তখন দেখা যাবে যে, এই যে চোখের মুভমেন্ট হচ্ছে,

এটা কি মিথ্যা? মিথ্যা কেন হবে, এটা সত্য। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এগুলো কি মিথ্যা? না, সত্য। কিন্তু ঠুলিটা যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন কিছুই নেই; তার মানে, এর আত্যান্তিক সত্তা নেই। আর আবার যে কিছুই নেই, তাও না, সেইজন্য বলছেন লীলা।

"**সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়**"। কল্পনা করুন, ইডেন গার্ডেন্সে ক্রিকেটের একটা টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে। ভারত আর একটা নামকরা দেশের মধ্যে খেলা হচ্ছে, এবার দশ বলে দশটি উইকেট পড়ে গেল। প্রথমবার দেখে আপনার খুব মজা লাগবে, বলবেন, এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড হয়ে গেছে। পরের ম্যাচেও দশ বলে দশটি উইকেট পড়ে গেল। তৃতীয় ম্যাচেও আবার দশ বলে দশ উইকেট। এরপর কি আর কেউ খেলা দেখতে যাবে? কেউ যাবে না। খেলা দেখতে যাওয়া মানে, দু-পক্ষের মধ্যে একটা জোর প্রতিযোগিতামূলক লড়াই চলবে, খেলার মধ্যে অনেক কিছু ঘটন-অঘটন হবে, তবে গিয়ে খেলা দেখতে মজা লাগবে। এসব না হলে মানুষ খেলা দেখতে যাবে কেন! কাব্য যখন সৃষ্টি হয়, সাহিত্য যখন সৃষ্টি হয়, সব রকমের রস সেখানে রাখতে হয়। একই ধরণের চরিত্র হলে সেটা কেউ পড়তে চাইবে না। মজা করে বলা হয়, যুধিষ্ঠিরের মত চরিত্র দিয়ে উপন্যাস তৈরী হয় না। সাদাসিধা মানুষ, ওকে নিয়ে কি উপন্যাস লিখবেন। অর্জুনকে নিয়ে কিছুটা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে যদি নামেন, যত খুশি আপনি লিখে যান, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কত বৈচিত্র। বৈচিত্র না হলে সাহিত্য সৃষ্টি হবে না। তিনি লীলা করছেন, লীলা করছেন কেন? যাতে লীলাটা চলে। সেইজন্য বলছেন –

খেলা চললে বুড়ীর আহ্লাদ। তাই 'লক্ষের দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি'। গানের একটা লাইন বলছেন। এরপর বলছেন, **তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইশারা করে বলে দিয়েছেন, 'যা এখন সংসার করগে যা'**। ঈশ্বর আর মন, এই দুটো সত্তা। রাজযোগ যখন পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলে, প্রকৃতিকে ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজ ও তম বলে ঠিকই, কিন্তু তারপরেই এসে যায় মহৎ, যেটা হল মন। বেদান্ত এটাকে এভাবে সমন্বয় করে, বেদান্ত সেখানে প্রকৃতি না বলে মায়া বলে, মায়াকে তাঁরা বলেন, মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি। মায়াতে, যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি এবার মন হয়ে দেখাচ্ছেন। সেই পর্দাটা কি? সত্ত্ব, রজ, তমের পর্দা। পর্দাটা কোথা থেকে এলো? হয় আপনাকে বলতে হবে সচ্চিদানন্দ থেকেই এসেছে, তাই সেটাও সচ্চিদানন্দ; আর তা নাহলে বলতে হবে পর্দা নেই। কারণ দ্বিতীয় কিছু সেখানে নেই। যেখানে সচ্চিদানন্দ ছাড়া, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, তাহলে হয় সেই পর্দাটাও আত্মা, আর তা নাহলে পর্দা বলে কিছু নেই। খুব সাধারণ যুক্তি। হিন্দুরা প্রচণ্ড যৌক্তিক।

আমরা খুব গভীরে যাই না বলে, আমাদের এগুলো খুব জটিল বলে মনে হয়। অনেক সময় যেমন ধরুন কাঁচি, কাঁচি দিয়ে কাটা হয়; কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা পেরেক উঠে গেছে, আপনি অন্য কিছু পাচ্ছেন না, তখন কি করবেন? ওই কাঁচিটা দিয়েই ঠুকে দেবেন যাতে ওটা ভিতরে চলে যায়। একটা জিনিসকে অন্য কাজেও যে লাগানো হয় না, তা না, লাগানো হয়। সচ্চিদানন্দ আর মনের ঠিক এই সম্পর্ক। কোথা থেকে আসে, কেন আসে, এর ব্যাখ্যা আমরা জানি না। ভক্তরা বলবেন, তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞানীরা বলবেন, মায়া। মায়া মানেও তাই, আমার উত্তর জানা নেই। কিন্তু একবার যখন মন এসে গেল, এরপর সব ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়, তারপরে ব্যাখ্যা করার আর কোন সমস্যা থাকে না। মন আর সচ্চিদানন্দের মাঝখানে যে একটা দেওয়াল, এই দেওয়ালকে কেউ বলে প্রকৃতি, কেউ বলে মায়া, কেউ বলে শক্তি, কেউ বলে 'তাঁর ইচ্ছা' ইত্যাদি। ওই জিনিসটাকে যেমনি মানলেন, তখন সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। বলা হয় যে, বেদান্তের মত যুক্তিসঙ্গত ধর্ম আর নেই, কিন্তু বেদান্তের সবচেয়ে সমস্যা হল এই মায়াকে নিয়ে। মায়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। একবার যদি এটাকে মেনে নেন, কিংবা বুঝে নেন, কিংবা শুনে শুনে একটা ধারণা তৈরী করে নেন, তখন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।

তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়। অর্থটা হল চোখ থেকে ঠুলিটা যখন সরে গেল। তারপর আবার গান করছেন ঠাকুর, '**আমি ওই খেদে খেদ করি**', আমরা আর গানের ব্যাখ্যা করছি না।

তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। 'প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনের আঁখি ঠারি'। তিনি মনকে ইশারা করে দিয়েছেন, যাও এখন সংসার কর। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। কেন কেউ ধর্মপথে আসেন, কেন কেউ ধর্মপথে এত এগিয়ে যান, কেন কেউ ধর্মপথে এত এগিয়ে গিয়ে আবার পতন হয়ে নীচে পড়ে যান; এগুলোর উত্তর নেই, যুক্তি দিয়ে এগুলো চলে না। কিন্তু সব কিছুর কর্তা তিনি। সেইজন্য বলা হয়, সব কিছু তাঁর ইচ্ছাতেই হয়।

ব্রাহ্মভক্ত – মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না? এটা খুব পুরনো সমস্যা ঈশোপনিষদ খুব পুরনো গ্রন্থ, সেখানে প্রথম মন্ত্রে বলছেন – সব কিছুতে ঈশ্বরকেই দেখবে, মানে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। সব কিছুতে ঈশ্বরকে যদি না দেখতে পার, তাহলে কর্ম করবে, সংসারের কাজ করবে, কিন্তু কর্মে লিপ্ত হয়ো না। ঠাকুর এবার হেসে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? হিন্দুদের এই দুটি পথ – প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গে সব কিছু ত্যাগ করতে হয় আর প্রবৃত্তিমার্গে হয় ঈশ্বরকে সব অর্পণ করে কাজ করতে হয়, না হলে দায়ীত্ব বোধে স্বার্থ ত্যাগ করে কাজ করে যেতে হয়। **তোমরা রসে-বসে বেশ আছ। সা-রে-মা-তে**! (সকলের হাস্য)। আসলে যাঁরা ওখানে রয়েছেন সবাই সংসারী মানুষ। তাঁদের যদি বলতে শুরু করেন, পূর্ণ ত্যাগ না হলে তোমাদের দ্বারা হবে না, ওখানেই তাঁদের সব উৎসাহ শেষ হয়ে যাবে। কিছু না হোক, তাঁরা সবাই ঠাকুরের কথা শুনছেন, এটাই অনেক। কজন আর ঠাকুরের কথা শোনার সুযোগ পায়, সুযোগ পেলেও কজন শুনতে চায়।

তোমরা বেশ আছ। নক্স খেলা জানো? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। লুডো খেলার মত, গুটি এগিয়ে এগিয়ে ঘরে উঠে গেল। **তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাঁচে আছো। বেশি কাটাও নাই; তাই আমার মতো জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে–এ তো বেশ**।(সকলের হাস্য)

তারপর ঠাকুর পরিষ্কার করছেন, ঠাকুর এই খেলার মধ্যে নেই, তিনি বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু বাকিরা খেলাতে আছে। তার মানে, ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেলে, আত্মজ্ঞান হয়ে গেল, তখন আর সংসার খেলা চলে না। তবে জিনিসটা তখনও থাকবে। এই জায়গাতে এনারা মরীচিকার উদাহরণ দেন। দুপুরে রোদের মধ্যে যদি চওড়া লম্বা রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যান, তাহলে গাড়ির সামনে দূরে দেখবেন মনে হবে যেন রাস্তায় জল আছে। যত এগিয়ে যেতে থাকবেন তত দেখবেন মরীচিকা তত এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একবার জেনে গেলেন এটা মরীচিকা; মরীচিকার জল এরপরেও সামনে আসবে, কিন্তু আপনি জেনে গেছেন, এই জল দিয়ে আমার কিছু হবে না।

সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। একহাতে কর্ম কর, আর-একহাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে দুইহাতে ঈশ্বরকে ধরবে। এটাই হিন্দুদের আদর্শ। হিন্দুদের জন্য যে বর্ণাশ্রম ধর্ম তৈরী করা হল, যাতে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারটে বর্ণাশ্রম ধর্ম; সেখানে গার্হস্থ্য ধর্মে বলা হচ্ছে, যত দিন তুমি গার্হস্থ্য ধর্মে আছ, তত দিন তুমি এক হাতে কাজ কর, আর-একহাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। বাণপ্রস্থের সময় এসে গেল, এবার সংসারটাকে ছাড়ার চেষ্টা কর। সন্ন্যাসের সময় হয়ে গেল, এবার সব ছেড়ে দু-হাত দিয়ে ঈশ্বরকে ধরে রাখ। প্রত্যেক হিন্দুর জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আদর্শ – শেষ সময় হলেও আমি সন্ন্যাসী হব। ঠাকুর আবার মনকে নিয়ে বলছেন।

মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনকে নিয়েই সব কিছু, সংসার মানেই মন। ইংরাজীতে খুব সুন্দর একটা কথা আছে – Everything is in mind। আপনি শান্তি পাচ্ছেন না, মন; আপনি সুখ পাচ্ছেন, মন; সব কিছুতে মন। আসলে যা কিছু হয় সব মনকে নিয়েই হয়। আপনি নিজেকে বিরাট কিছু ভাবছেন, মনেতেই সব; আপনি মনে করছেন, আপনি একটা অপদার্থ, মনেতেই; আপনি মনে করছেন আপনাকে কেউ ভালবাসে, মনেতেই; আপনি মনে করছেন, আপনাকে কেউ পছন্দ করে না, সেটাও মনেতেই।

মন যে-রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙে ছোপাও সবুজ; যে-রঙে ছোপাও সেই রঙেই ছুপবে। দেখ না, যদি একটু ইংরেজী পড়, তো অমনি ইংরেজী কথা এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-মিট্। আবার পায়ে বুটজুতা, শিস্ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে অমনি শোলোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখ, তো সেইরকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখ, ঈশ্বরচিন্তা, হরি কথা – এই সব হবে। সেইজন্য খুব ভাল করে নজর রাখতে হয়, আপনি কি ধরণের কাজ করছেন, কি চিন্তা-ভাবনা করছেন, কার সঙ্গে থাকছে; নজর রাখাটা খুব দরকার।

মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার, একপাশে সন্তান। একজনকে একভাবে, সন্তানকে আর-একভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।

ঠাকুর এখানে বলছেন, সংসার কেন? আমরা যেটা সংসার দেখছি, এটাই মন। সত্ত্ব, রজ ও তমের যে সত্ত্ব, অর্থাৎ একেবারে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম যে কণাগুলো রয়েছে, সেখানে যখন চৈতন্যের আলো পড়ে, সেটা যেন মন। একবার মন এসে গেলে সমষ্টি মনের সাথে ব্যষ্টি মনও বেরিয়ে আসবে। সমষ্টি মন ও ব্যষ্টি মন থেকে বাকি সব কিছু তৈরী। আমার যে শরীরটা দেখছি, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখছি, যাবতীয় যা কিছু দেখছি, সব মন দিয়েই দেখছি। এই পেনকে যখন দেখছি, তখন আমার মন দিয়েই দেখছি। আর যদি কেউ থাকে যে মনকে দেখছে না, সেটাও সেই মনকে দিয়েই মনকে দেখছে না। ঠাকুর যখন দেখছেন ঈশ্বরই আছেন, তখন তিনি মন দিয়েই দেখছেন। আমরা যখন ঈশ্বরের অভাব দেখছি, ওই অভাবটাও মন দিয়েই দেখছি। জগতে যত ভাল-মন্দ যা কিছু, সবই মনকে নিয়ে। বাচ্চা ছেলে মিষ্টি দেখলে খুশি হয়, সেই মিষ্টিকে দেখে ডায়বেটিক রোগী বলে বিষ। সবটাই মনকে নিয়ে, মনের বাইরে কিছু নেই। Objective reality বলে তো কিছু নেই, যা কিছু হয় মনকে নিয়ে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ – খ্রীষ্টধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ

ঠাকুর কেশব সেন ও ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে জাহাজে আছেন। জাহাজ চলছে, জাহাজের ভিতর কথাবার্তা চলছে। এতক্ষণ ঠাকুর বললেন মনই সব কিছু – তার ব্যাখ্যা আমরা বিস্তারে করলাম।

সংসার মানে মন, মানলাম। এখন কেউ যদি সংসার থেকে বেরোতে চায় তখন কি হবে? এর আগে ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের বললেন, তোমরা তো বেশ আছ, রসে-বসে। ঠাকুর উৎসাহ দেওয়ার জন্য এটা বললেন। নরেন আদি ছোকড়া ভক্তরা যদি ঠাকুরকে বলতেন, আমরাও রসে-বসে থাকতে চাই, ঠাকুর কিন্তু তখন রাজী হতেন না। নরেনের বিয়ের কথা চলছে শুনে তিনি মন্দিরে মার কাছে প্রার্থনা করতে দৌড়ে গেছেন যাতে বিয়েটা না হয়। ব্রাহ্মভক্তরা যাঁরা সেখানে আছেন, সবাই সংসার নিয়েই আছেন, তাঁদের জন্য বলছেন, তোমরা বেশ আছ, তার মধ্যে ঈশ্বরীয় কথা শুনছ, এ অনেক। এখান থেকে আস্তে আস্তে যখন ঈশ্বরের দিকে এগোতে শুরু করবেন, তখন সাংসারিক ভাব নিজে থেকেই খসে পড়ে যেতে শুরু করে।

আমাদের শরীর মন একটা সাংঘাতিক জিনিস। আজকেই এক মহারাজকে বলছিলাম, ওনার শরীর খারাপ, উনি জিজ্ঞেস করছিলেন এটা খাওয়া যাবে কিনা। আমি বললাম, যে জিনিসগুলি রোগের জন্য একেবারে বিষ, যেমন ডায়বেটিসে চিনি, একেবারে বিষ, এই ধরনের জিনিসগুলি যদি ছেড়ে দেন, আপনার শরীর বলে দেবে কোনটা খাওয়া যাবে, কোনটা খাওয়া যাবে না। ডাক্তারের কথা, বাড়ির লোকেদের কথা, অপরের কথা কক্ষণ শুনতে যাবেন না। আপনার শরীর নিজেই বলে দেবে, কোন ডাক্তারী কথা কাজে দেবে না। তখন আমি বললাম, এক সময় আমি উত্তরকাশীতে ছিলাম, বলে ঠাণ্ডায় দই খেতে নেই। কিন্তু উত্তরকাশীতে মাইনাস টু ঠাণ্ডায় কোন দিন আমার দই ছাড়া খাওয়া হয়নি, দই যদি না থাকে আমার মনে হত, খাওয়াই হল না। করলা মুখে দিতে পারি না, সুক্তোটুক্তোর তো প্রশ্নই নেই। তখন উত্তরকাশীতে আশ্রম ছিল না, কুঠিয়া ছিল; জ্বর হয়েছে, কোন হুঁশ নেই, দু-দিন জ্বরে কুঠিয়ায় পড়ে আছি। জ্বরটা একটু কমেছে, একশ ডিগ্রির মত হবে, তখন শরীর প্রচণ্ড ভাবে চাইছে করলা খেতে। ওই জ্বরে দু-কিলো মিটার দূরে এসে এক পোয়া করলা কিনে এনে, অসুস্থ শরীর নিয়ে সেই করলা ভেজে যখন খাচ্ছি, তখন মনে হচ্ছে যেন অমৃত খাচ্ছি।

শরীর আর মন সাংঘাতিক জিনিস, ওরা নিজেরাই আপনাকে বলে দেবে – কি করতে হবে, কি করতে হবে না। একটা জিনিস খেতে পছন্দ হচ্ছে না, কক্ষণ ওটা খেতে নেই। মন সাংঘাতিক জিনিস, ও জানে কি করতে হবে, কি করতে হবে না, অপরের কথায় কক্ষণ চলতে নেই। আপনার মন যদি বলে দেয় এটা ঠিক না, ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন; যদি বলে ঠিক, থাকুন। যদি কোন গোলমাল হয়েও যায়, মন নিজেই সামলে নেবে। এই যে ঠাকুর বলছেন, মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত; এখন আমি মুক্ত হতে চাই, উপায় কি? আমি বুঝলাম, সংসার মানে মন, মন মানে সংসার; আমি এখন বেরোতে চাইছি। এবার ঠাকুর ধীরে ধীরে ওই দিকে নিয়ে যাবেন।

আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারে থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? যাঁরা গীতা খুব গভীর ভাবে পড়েছেন, সেখানে তাঁরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাব দেখবেন, সেটা হল, মনকে ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণে নিয়ে যাওয়া। পুরো মনটা যতক্ষণ সত্ত্বগুণে না যায়, ঈশ্বরদর্শন হবে না, ঈশ্বর বলতে যেটা আমরা বুঝি। যেমন ধরুন ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, ভক্তির রজ, ভক্তির তম; সেখানেও ঈশ্বরদর্শন হয়, কিন্তু সেই রূপে। কিন্তু ঈশ্বর বলতে যিনি সচ্চিদানন্দ, শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ, এটা যতক্ষণ মন পুরোপুরি সত্ত্বগুণে না চলে যায়, ততক্ষণ হবে না।

মন সত্ত্বগুণে কিভাবে যাবে, এর অনেকগুলো সাধনা আছে, এর কোন সীমা নেই। এর মধ্যে একটা হল, এই ভাব – আমার বন্ধন কি? অনেক জায়গায় দেখবেন ঠাকুর ভাব আরোপ করতে বলছেন, এর আগে আরেকটা বলেছিলেন, মোর ফিরিয়ে দাও। এগুলোকে বলে চিন্তা-ভাবনা। ঠাকুর আবার অনেকবার অনেক জায়গায় বলছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। আমাদের কাছে অনেকেই আসেন জপধ্যান, সাধন-ভজন, আধ্যাত্মিক জীবন ইত্যাদির ব্যাপারে প্রশ্ন নিয়ে। যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁরাও এই ধরণের কথা বলেন। একটু যদি কথা বলতে যান, দেখবেন ওনাদের একটা fundamental ভুল আছে। যিনি যেখান থেকেই মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে থাকুন, যেমন যাঁরা ঠাকুরের মন্ত্র নিয়েছেন, তাঁদের দেখবেন, আমার সাথে ঠাকুরের কি সম্পর্ক, এটা তৈরীই হয়নি। সম্পর্কই যদি না তৈরী হয়, আপনার সাধনা কি করে এগোবে! যখন কারুর সাথে আমরা সম্পর্ক করি, যেমন বাচ্চা বয়সে আমরা জানি, ইনি আমার মা, ইনি আমার ভাই, ইনি আমার বোন; একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। সাধনা যখন হয়, সেখানে একটা সম্পর্ক দাঁড় করাতে হয়।

গীতাতে যেমন বলছেন, *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*, এখানে অনেকগুলো সম্পর্কের কথা বলছেন, যে কোন একটা সম্পর্ক স্থাপন করে সাধনা করতে হয়। ইনি আমার বাবা, ইনি আমার মা, ঠাকুরদা, ইনি আমার বন্ধু, ইনি আমার গুরু, সাধনার জন্য একটি কোন সম্পর্ক দরকার।

এবার জীবনটাকে সেই সম্পর্ককে নিয়ে চালাতে হয়। এরপর ধীরে ধীরে মন সত্ত্বগুণে নিজে থেকেই চলে যাবে। গুরু বলে দিয়েছেন, এই তোমার মন্ত্র, এ-ভাবে জপধ্যান করতে হবে, আপনি সেইভাবে করে যাচ্ছেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন আপনি এগোচ্ছেন না। কেন এগোচ্ছেন না? ইষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে না বলে। আমরা যখন কোন মন্দিরে যাই, যে মন্দিরই হোক; কাশী বিশ্বনাথে গেলেন, গিয়ে সেখানে আপনি মনে করছেন, বাবা বিশ্বনাথ ভগবান, আপনি ভক্ত, এটা একটা অস্পষ্ট শব্দ। কিন্তু সেখানেও ভক্ত আর ভগবান এই সম্পর্কটাও ধীরে ধীরে গভীর হয়ে যেতে পারে। কিভাবে হবে? আমি যাবতীয় যা কিছু করব, ভগবানকে অর্পণ করে করব। যদি দাস ভাব হয়, তখন সেখানে সেই রকম সম্পর্ক হবে। যদি সন্তান ভাব, সেখানে সেই রকম সম্পর্ক হবে। আমরা এই সম্পর্ক তৈরী করি না বলে আমাদের কিছু হয় না। এখানে ঠাকুর যেটা বলছেন, জ্ঞান আর ভক্তিকে এক জায়গায় এনে বলছেন। জ্ঞানীরা যেমন বলে, ত্রিকাল মে জগৎ নেহি হ্যায়, অর্থাৎ আত্মা ছাড়া সংসারে কিছু নেই। ঠাকুর যেমন সব সময় বলতেন – আমার মা আছেন। এই দুটো জিনিস এক আধারে এসে যাচ্ছে যখন বলছেন, আমার বন্ধন কি? 'আমার বন্ধন কি' শুনলে মনে হবে বেদান্তের কথা, জ্ঞানের কথা, আসলে এটা ভক্তিরই কথা। 'আমার বন্ধন কি' কেন বলা? আমি হলাম মায়ের সন্তান, আমি সেই ঈশ্বরের সন্তান, আমার আবার কিসের বন্ধন! তারপরেই বলছেন –

আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? ঠাকুরের এই একটি কথা আপনি কাগজে লিখে চার দেওয়ালে আর আয়নার সামনে কাগজে লিখে টাঙিয়ে রাখুন। যখনই কোন দুঃখ-কষ্ট আসবে, হতাশার ভাব আসবে তখন এই লেখাটার দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ভাববেন। এগুলো একেবারেই কল্পনা না, সম্পূর্ণ বাস্তব। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, আপনি তাঁর সন্তান, আপনাকে কে বাঁধবে? এটা এক ধরণের ভাব। এই ধরণের ভাব যদি ভিতরে না আনেন, ভিতরের শক্তি জাগবে না। ভিতরের শক্তি যদি না জাগে, তমোগুণ থেকে উঠবেন কি করে; আপনি নিজেকে যাই মনে করুন, তমোগুণ না গেলে শক্তি জাগাতে পারবেন না। আমি, আপনি, আমরা সবাই মূলতঃ তমোগুণী লোক। দীক্ষা নিয়েছি, জপধ্যান করছি আর আমি, আপনি, আমরা সবাই মনে করছি আমরা বিরাট কিছু হয়ে গেছি, আসলে সবাই তমোগুণী। তমোগুণ থেকে যে মনটা উঠবে, ওর জন্য একটা শক্তি দরকার। এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা করলে সেই শক্তি তৈরী হয়।

খুব প্রচলিত একটা কথাকে ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে বলছে, **যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়**। আসলে দেশে বিদেশে যত সাপ আছে তার আশি থেকে পঁচাশি ভাগ সাপ বিষহীন, সাপের কামড়ে যারা মারা যায়, তার মধ্যে বেশির ভাগ লোক ভয়েই মরে যায়। ঠাকুর বলছেন, জোর করে বললে ওটা চলে যায়। **তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত' এই কথাট রোখ করে বলতে বলতে তাই হয়ে। মুক্তই হয়ে যায়**। রোখ করে বলতে হয় 'আমি তো মুক্ত'। একদিনে হয় না, কিন্তু রোজ সর্বদা আপনি রোখ করে বলে যাচ্ছেন, সেখান থেকে মনটা এবার আস্তে আস্তে রজোগুণে উঠবে, রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে উঠে যাবে। সত্ত্বগুণে উঠে যাওয়ার পরেও আপনি ওই ভাবটাকে তখনও ধরে আছেন, এরপর তাঁর কৃপায় আপনি যে কোন দিন মুক্ত হয়ে যাবেন।

আমি এতদিন ধরে বেলুড় মঠে আছি। ছোটবেলা থেকে ঠাকুরকে জানি, মহারাজদের জানি, ওনাদের মুখ থেকে অনেক কথা শুনেছি, শুনে বোঝার চেষ্টা করেছি। আর এটা বুঝেছি যে, আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক সমস্যা। ভাল করে যদি দেখেন, যদি বোঝার চেষ্টা করেন কোন জায়গাটায় সত্যিকারে সমস্যা, তাহলে দেখবেন, আসলে আমাদের জীবনে কোন জীবনদর্শন নেই। সাধন-ভজন বলতে আমরা মনে করে রেখেছি – এই তো দীক্ষা নিয়েছি, এত সময় জপ করছি, এতেই সব হয়ে যাবে। না, হয়ে যাবে না; একটা সম্পর্ক করতে হয়। সম্পর্ক যদি না করা হয়, আধ্যাত্মিক জীবনে এগোন যাবে না। আর ওই সম্পর্কটাকে সব জায়গায় বজায় রাখতে হয়। প্রত্যেক অবস্থায় বজায় রাখতে হবে; চাকরির অবস্থায় বজায় রাখতে হবে, যখন চুরি-চামারি করছেন তখনও বজায় রাখতে হবে, ভুল কাজ করছেন তখনও

ওই সম্পর্কটা বজায় রাখতে হবে, ভাল কাজ করছেন, তখনও বজায় রাখতে হবে। যেমন কেউ যদি আপনার বাবা-মার নাম জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম বলতে কক্ষণ ভুল হবে না। আপনি কোথায় চাকরি করেন, এটা আপনার কক্ষণ ভুল হবে না। আপনি নারী না পুরুষ, এটা আপনার কক্ষণ ভুল হবে না। ঠিক তেমনি, আপনি রাজাধিরাজের সন্তান, এটা কোন অবস্থাতে কোন পরিস্থিতিতে কক্ষণ যেন ভুল না হয়। এটা ভুল হয় বলেই আমাদের যত রকমের সমস্যায় পড়তে হয়। সেখান থেকে এবার ঠাকুর খ্রীশ্চানদের কথা নিয়ে বলছেন। আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলি ঠিকই।

খ্রীশ্চনদের একখানা বই একজন দিলে, আমি পড়ে শুনাতে বললুম। তাতে কেবল 'পাপ আর পাপ'। বাইবেল নিশ্চয় হবে না, এটা খ্রীশ্চানদের অন্য কোন বই হবে, কারণ বাইবেলে এ-ভাবে বলা নেই। (কেশবের প্রতি) **তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ'**। ব্রাহ্মসমাজে খ্রীশ্চান ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। আর ওদের একটা ধারণা ছিল যে, হিন্দু ধর্মের অনেক কুসংস্কার আছে, অনেক গোলমাল আছে, খ্রীশ্চানিটি যেন এর থেকে অনেক মুক্ত। **যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী', 'আমি পাপী এই করে, সে তাই হয়ে যায়'**। ঠাকুরের জীবন দেখুন, ঠাকুর জীবন একটা আদর্শ জীবন। তাঁর জীবনে সুন্দর সুন্দর অনেক ঘটনা আছ। একটা ঘটনা আমার মধুর লাগে।

দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরী এলেন, ঠাকুর তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিলেন। এদিকে ঠাকুর চাইছিলেন যে তাঁর মা যেন জানতে না পারে ছেলে সন্ন্যাস নিয়েছে। অন্য দিকে হৃদয়রামকে বলছেন, 'ওরে হৃদু আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, আমি ঘরে ঢুকব না, আমাকে চাঁদনীতে ভিক্ষা দিয়ে যা'। এত সুন্দর একটা কথা। যেভাবেই হোক এই ঘটনাটা ঠাকুরের জীবনে একটা সাংঘাতিক ঘটনা। আমাদের জীবনে বিরাট বড় সমস্যা এটাই, ভগবানের প্রতি যে ভাব হবে, বা জগতের প্রতি যে ভাব হবে, এই ভাব স্থির থাকে না। আমরা মহাভারতের যেটা ধর্ম বলি – আপনি যেটা ধরে নিয়েছেন, সেটা থেকে আর নড়বেন না। স্বামী-স্ত্রী, এটা একটা ভাব। এখন স্বামী যদি সেখানে সমর্পিত থাকে, স্ত্রী যদি না থাকে বা স্ত্রী যদি সমর্পিত থাকে, স্বামী যদি না থাকে, তখন এলেমেলো হবে ঠিকই। যে লোকটি সমর্পিত, তার মনে সব সময় এই বোধটা থাকবে – আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। ঠাকুর একদিকে চাইছেন, তাঁর মা যেন জানতে না পারেন, অন্য দিকে হৃদুকে বলছেন, ওরে হৃদু আমি সন্ন্যাসী হয়েছি; তিনি ঘরে যাবেন না, ভিক্ষা করে খাবেন। এটা হল ঠিক ঠিক সততা। আমাদের সততা থাকে না বলে এত সমস্যা। একটু যদি বিচার করে দেখা যায়, সারাদিন আমরা কি করছি, কেন করছি; আমরা জানি না কেন করছি। একবার একটা ভাবকে ধরে নিতে হবে – I am this। এই ভাব আমাদের সবারই আছি। আমি এটা? কি আমি? আমি শরীর, আমি জন্ম নিয়েছি, কিভাবে জন্ম নিলাম জানি না, একদিন মরে যাব, চোখ বুঝলেই সব শেষ। মোটামুটি আমরা সবাই এই জীবনদর্শনকে নিয়েই চলি। চার্বাকদের দর্শন এটাই, যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ, এটাই চার্বাকদের জীবনদর্শন।

ঠাকুরের কাছে আমরা যখন যাই, তখন এভাবেই যাই – হে ঠাকুর আমাদের যেন মঙ্গল হয়, যেন দুটি টাকা হয়। যখন কাজকর্ম করছি, সেখানেও এই ভাব – টাকা-পয়সা কত পাব, সুখে কিভাবে থাকা যায়। যা কিছু আমরা করছি, সব কিছু করার উদ্দেশ্য কিভাবে সুখ পাওয়া যায় – শুধু সুখ আর সুখ। এ-তো চার্বাকদের দর্শন। স্বামীজী মা কালীকে নিয়ে বলছেন, যে মৃত্যুকে বরণ করতে রাজী, যে দুঃখকে বরণ করতে রাজী, সে-ই পারে জগন্মাতার আরাধনা করতে। আধ্যাত্মিক জীবন মানেই তাই, আমি সব দুঃখ-কষ্টকে বরণ করছি, এসো, তুমি এসো। তার মানে এটা নয় যে, আমি দুঃখ চাইছি; দুঃখ এসে গেছে ঠিক আছে, আমি তাকে বরণ করলাম। কোন কিছু থেকেই পিছিয়ে আসব না, এটা থেকেও না, ওটা থেকেও না। খ্রীশ্চানিটিকে ঠাকুর একেবারেই পছন্দ করতেন না, আমরা যতই সর্বধর্ম সমণ্বয়ের কথা বলি না কেন, ঠাকুর একদমই পছন্দ করতেন না। পপুলার খ্রীশ্চানিটিকে একেবারেই পছন্দ করতেন না ঠাকুর। এখানে মনে রাখতে হবে, খ্রিশ্চানিটি আর খ্রাইস্ট, দুটো আলাদা জিনিস।

ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই – 'কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি! আমার আবার বন্ধন কি'? একটা আলোচনায় হিন্দুদের পাপ বলে কিছু নেই বলতে গিয়ে আমি বললাম, পাপ শব্দের অর্থ পথ থেকে বিচলিত হওয়া, এটা যে কোন সময় শুধরে নেওয়া যায়। ঠাকুর আবার বলছেন, **কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবনে গিছল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, ওরে তুই একঘটি জল আমায় দিতে পারিস? তুই কি জাত? সে বললে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত – মুচি। কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল, শিব। নে, এখন জল তুলে দে**''। আমরা এটা ঠিক জানি না, ওনার জলের দরকার ছিল বলে এই রকম করলেন কিনা। যেমন আমরা বলি, গঙ্গাজল পবিত্র করে। আমার 'হিন্দু জীবনধর্ম' বইতে দেখবেন, সেখানে আছে, কিছু না হলে 'ওঁ তৎসৎ' বলে দিলে বা শুধু 'ওঁ' বলে দিলে পবিত্র করে নেওয়া হয়ে যাবে। কৃষ্ণকিশোর সাধারণ অবস্থায় যারা হীন জাত, তাদের কাছ থেকে হয়ত জল নিতেন না, কিন্তু এই জায়গাতে তিনি তাকে শুদ্ধ করে দিলেন। কি ভাবে? 'তুই বল, শিব'। শিব বলাতে শুদ্ধ হয়ে গেল। শ্রীশ্রীমা যেমন নলিনীদিকে বলছেন, তুই আমাকে ছুঁয়ে দে, শুদ্ধ হয়ে যাবি।

ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ-মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। এই কথা যে শুধু ঠাকুর বলছেন, তা না, আমাদের মনুস্মৃতিতেও বলছেন, একমাস ধরে যদি হাজারবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা হয়, তার সমস্ত জন্মজন্মান্তরের পাপ ধুয়ে যাবে। তার মানে আমাদের কাছে পাপ বলে কিছু নেই, জান্তা অজান্তায় কিছু হয়ে গেছে, ওটা কিছু না, ওটাকে কাটিয়ে দেওয়া যায়। কি করে কাটিয়ে দেওয়া যায়? এর জন্য আবার মূলে যেতে হবে। হিন্দুদের মূলে হল, আমি তো শুদ্ধ আত্মা, যে কোন কারণে আমি মায়ার বন্ধনে পড়ে আছি। এই যে মায়ার বন্ধনে পড়ে আছি, আমি এখন মনে করলাম আমি শিব, ব্যস্। কিছুক্ষণের জন্য, অন্তত সেই মুহূর্তের জন্য আমি ফ্রী হয়ে গেলাম। আদম আর ঈভ কবে একটা আপেল খেয়েছিল, সেই পাপ এখনও খ্রীশ্চানদের মাথায় ঢুকে আছে, আর বাকি যা ছিল, যীশু যখন ক্রুশিফাইড হলেন, তার সেই পাপ, এই রকম আরও একগাদা পাপ নিয়ে খ্রীশ্চনরা জন্ম থেকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। আমরা ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয় নিয়ে অনেক কথা বলি ঠিকই, কিন্তু ঠাকুর এগুলো একেবারেই পছন্দ করতেন না। বাইবেল যদি ভাল করে পড়া হয়, তখন আমরা দেখি যে বাইবেলে কোথাও এই ধরণের কথা নেই। পরে খ্রীশ্চানরা ওদের থিয়োলজিতে নিজেদের মত করে বানিয়ে পাপের ধারণাটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমি যদি কাউকে হাতের মুঠোয় রাখতে চাই, তাহলে প্রথম যে সহজ উপায়, সেটা হল আমি তাকে এই শিক্ষা দেব যে, তুমি গোল্লায় যাচ্ছ, একমাত্র আমিই পারি তোমাকে বাঁচাতে। সব জায়গাতে সবই তাই। নেতারা বলবে, আমাকে যদি ভোটটা না দাও, তুমি কিন্তু গোল্লায় যাবে। যারা সমাজ সংস্কারক, তার বলবে, তোমরা যদি এই রকমটি না কর, তোমরা গোল্লায় যাবে। ধর্ম প্রচারকরা বলবে, তুমি যদি এ-ভাবে ধর্মাচরণ না কর, তুমি কিন্তু গোল্লায় যাবে। আর যারা এখন পরিবেশ নিয়ে বলাবলি করছে, তারাও এটাই বলবে, যদি না কর, গোল্লায় যাবে। শেষ পর্যন্ত এটাই দেখা যায় যে, যারা ভয় পায়, তারা টাকা ঢালে আর মাঝখান থেকে এই লোকগুলোর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বেড়েই চলে। যতক্ষণ আপনার ভিতর আমি এই ভয় না ঢোকাচ্ছি, তুমি সর্বনাশের দিকে যাচ্ছ, আমিই একমাত্র পারি তোমাকে এই সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে, ততক্ষণ আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হবে না। কিন্তু আমাদের সাধুদের ব্যাঙ্ক এ্যকাউন্টও নেই, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও নেই, তাই আমাদের এগুলো নিয়ে ভাবতেও হয় না। কিন্তু যার মন চতুর ও ধুরন্ধর, সে সব সময় এটা করবে, আপনাকে ভয় দেখাবে। যদি এই পৃথিবীতে না পুরো ভয় দেখানো না যায়, পরলোকের ভয় নিয়ে আসবে। কি রকম? তুমি নরকে যাবে। আর নরকের এমন বর্ণনা দেবে যে শুনে আপনি আতঙ্কিত হয়ে যাবেন। তখন

আপনাকে কে বাঁচাবে? Jessus is the saviour। এখন তো যীশু নেই, তাই কি হবে? কেন চার্চ আছে, চার্চ আমাকে ক্ষমতা দিয়েছে, আমি তোমাকে বাঁচাব।

একটা গ্রাম্য গল্প আছে। একজন গোয়ালা ছিল, তার একটা ভাল গরু ছিল। এক ব্রাহ্মণের ওই গরুর প্রতি অনেক দিন ধরে দৃষ্টি পড়েছিল, ওই গরুটা তার চাই। কপাল এমন যে, গোয়ালার মা মারা গেছে। সেই ব্রাহ্মণ বৈতরণী নদী কেমন হয়, তার এক ভয়ঙ্কর চিত্রণ করল। এখন গরুর লেজ যদি না ধরা হয়, তাহলে তুমি পারে যেতে পারবে না। তাহলে কি করে হবে? কোন চিন্তা নেই, তোমার গরুটা আমাকে দান কর, তাহলে এটাই হয়ে যাবে তোমার বৈতরণী নদী পার হওয়া। গোয়ালা বেচারা কাঁদছে, 'এই গরু ছাড়া তো আমার আর কিছু নেই, এটা চলে গেলে আমি খাব কি করে'? 'তা তুমি এখন ঠিক কর, তোমার মা এখন নরকে পড়ে হাবুডুবু খাবে, না পারে যাবে'। লোকটা আর কি করবে, কাঁদতে কাঁদতে গরুটা ব্রাহ্মণকে দিয়েই দিল শেষ পর্যন্ত। কি না, এই গরুটাই তোমার মাকে পার করাবে। ব্রাহ্মণ খুব খুশি, খুব করে দুধ দুইছে।

সাত দিন পরে, গোয়ালা লাঠি নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ি হাজির হয়ে গেছে। এসে বলছে, 'সাত দিন হয়ে গেছে, আশা করি এতদিনে আমার মা গরুর লেজ ধরে বৈতরণী নদী পেরিয়ে গেছে, এবার আমি গরুটা নিয়ে চললাম'। লাঠির ভয়ে ব্রাহ্মণ আর কি করবে, গরুটাকে ছেড়ে দিল। যখন এই রকম ভয় দেখান হয়, কোন কুমতলব থাকে, তখন এ-ভাবেই লোকেদের বোকা বানানো হয়। বিজ্ঞাপন দু-ধরণের হয় – একটা হল আপনার মনে একটা ইচ্ছা জাগিয়ে দেবে, লোভ দেখাবে, আর একটা হয় – ভয় দাঁড় করাবে। তা নাহলে বিক্রি হবে কি করে! পাপ, নরক এগুলো সব হল, নিজেকে বিক্রি করার জন্য। তুমি তো শেষ! আরে বাবা, আমি শেষ ঠিক আছে। যার ভীতু মন, সে বলবে, আমি বাঁচব কি করে? আমিই তোমাকে বাঁচাব। কি করতে হবে? আমার চেলা হও, জমি দাও, টাকা দাও। খ্রীশ্চান চার্চের ইতিহাস যদি পড়েন, যাচ্ছেতাই কাণ্ড, চোখ কান বন্ধ করে দিতে হয়। ঠাকুর বলছেন, শুধু পাপ আর নরক। তা নাহলে খ্রীশ্চানদের চলবে কি করে, খ্রীশ্চান ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে এই পাপ আর নরকের উপর। অথচ বাইবেলে এর কোন কথাই নেই। যীশুর ধর্ম শুদ্ধ বেদান্তের ধর্ম। ওই ধর্মকে নিয়ে যদি প্রচারে যায়, লোক আসবেই না। তখন হবে, আমি যাব কি যাব না, সেটা আমার ইচ্ছা। হিন্দুরা কক্ষণ এ-রকম করে না। আসলে ব্রাহ্মণরা খুব গরীব ছিল বলে তারা অনেক সময় এগুলো করত। তাও যাঁরা শাস্ত্র জানতেন, তাঁরা এগুলোতে জড়াতেন না।

একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি, আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস, সেখানেই সব শেষ। আপনি একটা সাংঘাতিক কোন দোষ করেছেন, ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলুন, ঠাকুর এতদিন আমি যত দোষ করার করেছি, আজ থেকে আর করব না, সেখানে আপনার সব পাপ শেষ। যীশুর জীবন দেখুন, সেখানেও সেই একই জিনিস। একটি নষ্টা মেয়ে, নষ্টা সে কেন হবে, মেয়েটি পেটের জন্য ওই রকম কাজে নেমেছিল। এখন গ্রামের সবাই তাকে পাথর মারবে, আদিবাসীদের যে রকম বিচার-ব্যবস্থা হয়। অনেক ইসলাম রাষ্ট্রে এখনও এই ধরণের বিচার আছে। যীশু বললেন, যে কোন দিন পাপ করেনি, সে প্রথম মেয়েটিকে পাথর মারবে। এক এক করে সবাই চলে যাওয়ার পর মেয়েটি যীশুকে বলছে, আপনি তো কোন দিন পাপ করেননি, আপনি আমাকে পাথর মারুন। যীশু মেয়েটিকে বলছেন, ভগবান তোমাকে ক্ষমা করে দিলেন, তুমি ঘরে যাও, বাইবেলের কথাটা হল – Go and sin no more, আর তুমি এ-পথে যেও না।

এগুলোকে খ্রীশ্চানরা সামনে বেশি আনে না, শুধু নরকে যাবে, আর এই পাপ, সেই পাপ। এই সমস্যা শুধু খ্রীশ্চানদের না, সব ধর্মে এই সমস্যা আছে। সেইজন্য দেখবেন, বিদেশীরা যে ধর্মের বিরুদ্ধে এত আক্রমাণাত্মক সব লেখা লিখেছে, একমাত্র এই কারণেই লিখেছে। মানুষ ধর্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে। কার্ল মার্ক্স যে লিখছেন, ধর্ম হল জনসমাজের আফিং, এই কারণেই বলছেন। ধর্ম

বিশেষ করে খ্রীশ্চান ধর্ম, মানুষদের এত ভয় দেখিয়ে এসেছে যে বিরক্ত ধরে গেছে। আর মানুষের মন এমনিতেই দুর্বল মন। ইহকালের ভয় যদি দেখানো না যায়, তাহলে পরকালের ভয় দেখিয়ে দেবে, মানুষকে তো তাদের রাস্থায় আনতে হবে, তা নাহলে তাদের অর্থের আমদানি হবে কোত্থেক!

এখান থেকে ঠাকুর আবার ভাবে চলে গেছেন। 'তাঁর নামে বিশ্বাস কর', এই কথা বলে **ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতেছেন :**

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।।

আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম, 'মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পূণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও'। এটাকেই গীতায় বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। যোগের দৃষ্টিতে দেখলেও এটা এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি প্রথম দিকে যখন কথামৃত পড়তাম এগুলো কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে, ধর্ম কি করে ছাড়বে। সমস্ত ধর্ম বলে, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হও। একমাত্র হিন্দু ধর্ম বলে – ধর্ম ও অধর্মের পারে যাও। কারণ ধর্ম ও অধর্ম, এই দুটোই মনের খেলা। আগে বলা হল মনই হল সংসার। মনে যে ভাবগুলো ওঠে, এটাকেই বলছেন চিত্তবৃত্তি। মনে যখন বোধ হয় এটা পাপ, ওটাও মনের ঢেউ; যদি মন হয় এটা পূণ্য, এটাও মনের ঢেউ। দাঁড়িপাল্লায় আপনি সোনা ওজন করুন আর পাথর ওজন করুন, দাঁড়িপাল্লা দেখবে না কোনটা সোনা আর কোনটা পাথর, ও শুধু যার যতটুকু ওজন সেটা দেখিয়ে দেব। মন ঠিক সেই রকম, মন ভালকে দেখেও চঞ্চল হবে, মন্দকে দেখেও চঞ্চল হবে। মন ভাল আর মন্দে তফাৎ করতে পারে না। মন চঞ্চল হলে কখনই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হবে না, চিত্তবৃত্তি নিরোধ না হলে স্বরূপে অবস্থান হবে না। তার মানে ঈশ্বরদর্শন যদি করতে হয়, ধর্ম ও অধর্ম দুটোকেই ত্যাগ করতে হয়। যখন গীতায় বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, তখন তার অর্থ এটাই। এখানে যে ঠাকুর একটা লম্বা তালিকা দিচ্ছেন, তার বক্তব্য এটাই – আমি কোন কিছুকেই ধরে রাখছি না, সব শান্ত, পূর্ণ শান্ত – স্বরূপে অবস্থান, ঈশ্বর দর্শন, এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

রামপ্রসাদের একটা বড় গান, আয় মন বেড়াতে যাবি, এই গানটা ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের গেয়ে শোনাচ্ছেন। গানের শেষে জনক রাজার কথা আসে – জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসের ছিল ত্রুটি ইত্যাদি। এটা বলার পর ঠাকুর সাবধান করছেন –

কিন্তু ফস করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। দুর্বলের একটা লক্ষণ হল, সব কিছুকে justify করতে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বলবে, ইনিও তো এই রকম করেছিলেন। যেমন ঠাকুরকে একজন বলছিলেন, যুধিষ্ঠিরেরও তো নরক দর্শন হয়েছিল। শুনে ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, যুধিষ্ঠিরের এত গুণ সেগুলো দেখলে না, তোমার খালি নরক দর্শনের কথাই মনে পড়ল? এটা আমাদের স্বভাবেই আছে, দেখবেন, যাঁরাই বড় হন তাঁদের আমরা নিন্দা করি। আর কিছু হলেই বলবে, আমরা রাজা জনকের মত। কেন না, রাজা জনক আত্মজ্ঞানীও ছিলেন আবার রাজাও ছিলেন।

খুব সুন্দর গল্প আছে। এই গল্পকে কেউ বলে শুকদেবের নামে, কেউ বলে এমনি ব্রাহ্মণদের নামে বা সাধুবাবাদের নামে। যাই হোক, জনক রাজার কাছে শুকদেব এসেছেন ব্রহ্মজ্ঞান পেতে। শুকদেব সব সময় একটা কৌপিন পরে থাকেন, খালি গা। একটা কৌপিন পরেন আর-একটা কৌপিন শুকোয়। একদিন একটা রব উঠল মিথিলায় আগুন লেগেছে। শুনেই শুকদেব উঠে চলে গেলেন নিজের

কৌপিন বাঁচাতে। রাজা জনক তখন মৃদু হেসে বলছেন – *মিথিলায়াং প্রদগ্ধয়াং ন মে দহ্যেতি কঞ্চন*, পুরো মিথিলাও যদি পুড়ে যায়, তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আর তুমি একটা কৌপিনের জন্য দৌড়াচ্ছ। মহাভারতের এটা খুব নামকরা কথা – পুরো মিথিলা পুড়ে যাক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এই হচ্ছে একজন আত্মজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের তফাৎ। এটা শুধু মনে করলেই হয় না। নির্জনে অনেক তপস্যা করতে হয়।

"**সংসারে থেকেও এক-একবার নির্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিনদিনও কাঁদা যায় সেও ভাল। এমনকি অবসর পেয়ে একদিনও নির্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। লোক মাগছেলের জন্য একঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল**"?

ঠাকুর খুব সাধারণ স্তর থেকে ধীরে ধীরে গভীরে নিয়ে যেতে শুরু করেছেন। নির্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়! সংসারের ভিতর কর্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়, অসম্ভব।

ফুটপাতের গাছ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া; গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। গুঁড়িতে হাতি বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

শহরে তো ইদানিং গরু মোষ দেখা যায় না, গ্রামদেশে গেলে দেখা যায়, মাঠে বা রাস্তার পাশে বড় বড় গাছের গুঁড়িতে গিয়ে গরুগুলো গা ঘষে, তাতে গাছের কিছু হয় না। কিন্তু এই গাছটাই যখন চারা অবস্থায় ছিল তখন তাকে বেড়া-ট্যারা দিয়ে কত সাবধানে রাখা হত। একবার গুঁড়ি শক্তি হয়ে গেলে আর কিছু হবে না। ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার জন্য প্রথমের দিকে একটু বেড়া দিতে হয়, কিছু বিধি-নিষেধ রাখতে হয়, গাছ বড় হয়ে গেলে এগুলো তখন এক পাশে পড়ে থাকবে। আমাদের এখানে সাধুজীবনে প্রথমে যাঁরা ব্রহ্মচারী হয়ে আসেন, অনেক ব্যাপারে তাঁদেরকে সামলে-সুমলে রাখতে হয়। ব্রহ্মচারী থেকে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর একটু ছাড় দেওয়া হয়, অর্থাৎ একটু নিজের মত থাকা যায়। তাই বলে যে তাঁদের পতনের ভয় নেই তা না, তাঁদেরও ভয় আছে। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, প্রথমের দিকে চারা গাছকে বেড়া দিতে হয়, তা না হলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।

"**রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে-ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করতে চাও, ঘর থেকে ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয় – জলের জালা; বিষয়ভোগতৃষ্ণা – জলতৃষ্ণা**"। তখনকার দিনে কবিরাজীদের একটা ছিল যে, বিকার-টিকার হলে বলত জল খেতে দিও না। "**আচারর তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না; এরূপ জিনিসও ঘরে রয়েছে; যোষিৎসঙ্গ। তাই নির্জনে চিকিৎসা দরকার**"।

সংসারে নানা রকমের ভোগের জিনিস রয়েছে, সংসারীদের সেই ভোগের বিষয়ের দিকে মন তো যাবেই, ইচ্ছে না থাকলেও ভোগে মন যাবে। সেইজন্য মাঝে মাঝে সংসার থেকে কয়েকদিনের জন্য সরে এসে নির্জনে থেকে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়। ঠাকুর বলছেন –

বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য – হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য; দুদিনের জন্য। এইটি বোধ আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান – ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল। এই বলে ঠাকুর গোপীদের টানের উপর গান করছেন – বংশী বাজিল ওই বিপিনে। আমার তো না গেলে নয়, শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে ইত্যাদি।

আমরা এর আগের আলোচনায় বলেছিলাম, সচ্চিদানন্দই আছেন, মনটা সেখানে খেলা করছে। আমরা ভাবের কথা বলছিলাম, এবার ঠাকুর ফিলজফি নিয়ে আসছেন। তোমরা এটা ভাল করে বোঝ – সচ্চিদানন্দই সৎ, বাকি সব অসৎ। অসৎ বা মায়াকে আচার্যরা পরিভাষিত করে বলছেন – যেটা দেশ, কাল, বস্তুতে পরিচ্ছিন্ন। তার মানে গতকাল ছিল না, আজ আছে, আগামীকাল থাকবে না। এই অনিত্যের দিকে কেন যাচ্ছ? এমন জিনিসের দিকে যাও, যেটা সব সময় আছে।

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাদি ভক্তদের বললেন, "রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও, ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা কর। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়"। ঠাকুর এই কথা বার বার বলতেন, রাধাকৃষ্ণ, রাসলীলাদি তুমি বিশ্বাস কর আর বিশ্বাস নাই কর, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ওখানে যে টানটুকু আছে সেটাতে বিশ্বাস আছে। কৃষ্ণের প্রতি, ভগবানের প্রতি যে গোপীদের টান, সেই টানটা নাও; সেই টানটা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি দাও।

আমরা যে আলোচনাগুলো করছি, তার মধ্যে দেখুন ঠাকুর সেই ঈশ্বরীয় কথাকে কত ভাবে নিয়ে আসছেন – কখন মনকে নিয়ে আসছেন, কখন আবার বৈরাগ্যের কথা বলছেন, কখন ঈশ্বরের প্রতি টানের কথা বলছেন। ঠাকুরের একটাই উদ্দেশ্য, সংসারী জীবদের কিভাবে তাদের মনকে টেনে এনে ঈশ্বরের সাথে এক করা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত নৌকাবিহার – সর্বভূতহিতে রতাঃ

লঞ্চ এগোতে এগোতে রহড়ার ওইদিকে চলে গিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বর থেকে রওনা হয়ে অনেকটা পথ গঙ্গাবক্ষে চলে এসেছেন, বুঝতেও পারেননি কতটা গেছেন। ঠাকুর কথা বলে যাচ্ছেন। আগেকার লঞ্চ, আকারে বড় ছিল। বলছেন, **ভাটা পড়িয়াছে**। স্টীমবোটকে আগ্নেয়পোত বলছেন, **আগ্নেয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতিতে চলিতেছে**। বলছেন, **পোল পার হইয়া কোম্পানির বাগানের দিকে আরও খানিকটা বেড়াইয়া আসিতে কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে। কতদূর জাহাজ গিয়াছিল, অনেকেরই জ্ঞান নাই – তাঁহারা মগ্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন্ দিক দিয়া সময় যাইতেছে, হুঁশ নাই**।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতেছে। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতেছেন। আনন্দের হাট। কেশব মুড়ির আয়োজন করে এনেছেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন বিজয় ও কেশব দুইজনেই সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা জানবেন যে, কেশব সেন নববিধান করলেন ঠিকই, কিন্তু তারপরে বিভিন্ন কারণে তার মধ্যে অনেক অশান্তি লেগে গেল, বিশেষ করে কেশব সেনের মেয়ের বিবাহকে কেন্দ্র করে। বলছেন, দুজনেই সঙ্কুচিত ভাবে বসে আছেন – দুজনের মধ্যে অশান্তি লেগে গেছে কিনা। কিন্তু ঠাকুরের কাছে দুজনই এক হয়ে গেছেন, তবে সঙ্কোচভাবটা এখনও আছে। তখন ঠাকুর যেন দুইজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়া দিবেন। '*সর্বভূতহিতে রতাঃ*'; এটা মাস্টারমশাইয়ের ব্যাখ্যা।

যার সঙ্গে দূরের সম্পর্ক, তার সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, মিটমাটও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। খুব কাছের লোকের সাথে ঝগড়া হলে মিটমাট হতে মুশকিল হয়। হিন্দিতে একটা খুব সুন্দর দোঁহা আছে – *রহিমন্ ধাগা প্রেমকা মৎ তোড়ো ঝটকায়ে*। রহিম কবি বলছেন, ভালবাসার যে দড়ি, ওটাকে চট্ করে ছেড়ে দিতে নেই, শক্ত করে ধরে রাখতে হয়। *টুটে পে ফির না জুড়ে*, ভালবাসার দড়ি যদি একবার ছিঁড়ে যায়, আর ওটা জোড়া লাগে না। *জুড়ে তো গাঁট পড়ি যায়*, যদি জুড়েও যায় ওখানে একটা গিট্ পড়ে যায়। সুতো কাঁচা অবস্থায় জুড়ে দিলে তখন ওটা জুড়ে যায়। পাকা হয়ে গেলে আর জোড়া লাগানো যায়

না, ছিঁড়ে গেলে ছেঁড়াই থেকে যাবে। বাচ্চারা ইমোশানস নিয়ে চলে। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক ভাবে যারা যত কম উন্নত, তারা তত ইমোশান দিয়ে চলে। বাচ্চাদের সবটাই ইমোশানস দিয়ে চলে। যদি কারুর সাথে ঝগড় হয়ে যায়, বলবে, ওর সাথে আর কোন দিন কথা বলব না। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই আবার বন্ধুত্ব হয়ে যাবে, যা কিছু চলে সব ইমোশান দিয়ে চলে। মানুষ যত সংস্কৃতিতে, আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হবে তত ইমোশানসের উপর নিয়ন্ত্রণ আসে। বাড়িতে কারুর মৃত্যু হয়ে গেলে, যারা কালচারালি উন্নত হয় তারা বুক ফাটিয় কান্নাকাটি করেন না। ইমোশানালি কারুর সাথে জুড়তে নেই, যদি জোড়েন তাহলে ওটাকে ধরে রাখতে হয়, তা নাহলে পরে যখন মিলন হয় তখন দুজনের মধ্যেই একটা সঙ্কোচের ভাব এসে যায়। আগের মত স্বাভাবিক ভাবে কেউ কারুর দিকে এগিয়ে আসতে পারে না। কেশব সেন ও বিজয়ের এই অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) – **ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ – যেন শিব ও রামের যুদ্ধ।** (হাস্য) **রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হল, দুজনে ভাবও হল। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচি আর মেটে না!** (উচ্চহাস্য)

ঠাকুরের কথামৃতে যদি খুব কাছ থেকে দেখেন, তখন দেখবেন, যদিও এটা আমরা আগে বলেছি, তবুও আরেকবার শুনে রাখা ভাল; কথামৃত তিনটে স্তরে চলে। একটা হল, ঠাকুরের নিজস্ব অনুভূতিগুলি, যে জিনিসগুলো ঠাকুর সাক্ষাৎ অনুভব করেছেন, এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে দামী কথা। আর স্বামীজী এই কথাগুলি নিয়েই বলছেন, শাস্ত্র যদি বুঝতে হয় তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলিকে মাপকাঠি করে শাস্ত্রের কথা বুঝতে হয় এবং ব্যাখ্যা করতে হয়। আর সত্যিই আজকে আমি যখন উপনিষদ পড়ি, গীতা পড়ি বা যে কোন শাস্ত্র পড়ি, তখন সেখানে যদি কারুর ব্যাখ্যা থাকে তাহলে আগে আমি দেখি ঠাকুরের জীবনে এ-রকম কিছু হয়েছে কিনা, ঠাকুর এ-ধরণের কোন কথা বলেছেন কিনা। যদি ঠাকুরের কথার বিপরীত কিছু থাকে, তাহলে ওই ব্যাখ্যা আর নিই না। যদি মিলে যায় ঠিক আছে, ঠাকুর যদি ওরকম কিছু না বলে থাকেন, তাহলেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যদি পরিষ্কার দেখতে পাই, ঠাকুর এক রকম বলছেন, আর এই বইতে অন্য রকম বলছেন, তখন আমি আর ওটা নিই না। আর সেইজন্য গীতা ও উপনিষদ এই দুটি বই বাদে যত দূরে যাবেন, তত দেখবেন চিনিতে বালিতে মিশে আছে। সারাদিন কত আর চিনি আর বালি আলাদা করব! সেইজন্য সব পড়াই আমি ছেড়ে দিয়েছি। ঠাকুরের কথামৃতই শেষ কথা। কারণ, হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কথামৃতে রাখা আছে।

দ্বিতীয় স্তরে ঠাকুরের যে কথাগুলো কথামৃতে চলে, তা হল – সাধু-মহাত্মারা দক্ষিণেশ্বরে প্রচুর আসা-যাওয়া করতেন, ঠাকুর তাঁদের কাছ থেকে অনেক কথা শুনতেন, সেই কথাগুলো। সেই কথাগুলো ভাল এই জন্য যে, ঠাকুর যেন ওই কথাগুলিতে টিক্ মার্ক করে দিচ্ছেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। অর্থাৎ ঠাকুরের ওই কথা পছন্দ হয়েছে, আর ঠাকুরের যে ভাব, সেই ভাবের সাথে মোটামুটি মিলছে।

তৃতীয় স্তরের কথাগুলো খুব মজার। ঠাকুরের জীবন গড়ে উঠেছে গ্রামে, সেখানে তিনি অনেক কিছু দেখেছেন, শুনেছেন। আর দক্ষিণেশ্বরে ওনার যাঁদের সাথে পরিচয় ছিল, সেই হৃদয়রাম, সেই হলধারী, সেই হাজরা আর খাজাঞ্চিরা, এনারা কেউ তথাকথিত শহুরে লোক বা বুদ্ধিজীবি, পণ্ডিত বা শিক্ষিত বা সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। যার জন্য, ঠাকুর যত উপমা দিয়েছেন, যত উদাহরণ দিয়েছে, সবটাই ছিল গ্রাম্য। গ্রাম্য হওয়ার জন্য এর একটা আলাদা মাধুর্য আছে। বাচ্চা বয়স থেকেই ঠাকুর গ্রামের যাত্রাপালা দেখতেন। যেখানেই রামায়ণ গান হত, ভাগবত পাঠ, মহাভারত পাঠ হত, সেখানেই ঠাকুর পাঠ শুনতে চলে যেতেন। পরে পরে তিনি সেখান থেকে অনেক কিছু উদাহরণ রূপে ভক্তদের সামনে রাখতেন। কথামৃতে এই কথাগুলোর মাধুর্য একেবারে অন্য রকম। এই যদি ঠাকুর কলকাতায় বড় হতেন তাহলে এত সুন্দর উপমা ও উদাহরণ পাওয়া যেত না। স্বামীজী কলকাতার ছেলে, স্বামীজীর উদাহরণগুলিও কলকাতাকে আধার করে। ঠাকুরের সব উপমা কামারপুকুরের এলাকার।

এখানে ঠাকুর শিব আর রামের যুদ্ধের উদাহরণ আনছেন। শিব আর রামের যুদ্ধ এটা খুব প্রচলিত কাহিনী নয়, শিবপুরাণে এই কাহিনী আছে। পুরাণ সাহিত্যের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এনারা একটা সত্যকে নেবেন, সেই সত্যকে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা কাহিনী তৈরী করে দেবেন। আমি নিজে কাহিনী রচনা করি, আমি জানি কিভাবে কাহিনী তৈরী হয়। আমাদের আঠারোটা পুরাণ আর আঠারোটা উপ-পুরাণ আছে। উপ-পুরাণগুলি অত বিখ্যাত না, পুরাণগুলো গুরুত্বপূর্ণ। পণ্ডিতরা পুরাণগুলিকে ক্লাশিফাই করেছেন, তাঁরা বলেন ব্রহ্মাকে আধার করে ছয়টি, শিবকে আধার করে ছয়টি এবং বিষ্ণুকে আধার করে ছয়টি পুরাণ রচিত হয়েছে। তবে পণ্ডিতদের সব ব্যাখ্যা নেওয়া মুশকিল, কারণ যাঁরা পণ্ডিত ছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই কম্যুউনিস্ট, আর কম্যুউনিস্টরা কথায় কথায় যে করে হোক সব কিছুতে ক্লাশ স্ট্রাগেল এনে এটা সেটা করে তালগোল পাকিয়ে দেন। যাই হোক, আমরা ওদের বক্তব্যে যাচ্ছি না।

কিন্তু একটা জিনিস আমরা দেখি, যেমন শিবপুরাণ, শিবপুরাণে শিবকে শ্রেষ্ঠ দেখাচ্ছেন। এখন শ্রীরামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ, সারা দেশও মানছে। কিন্তু কোথাও নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে শ্রীরাম যতই শ্রেষ্ঠ হন, শিবের সামনে তিনি নত। এখানে কাহিনীটা এই রকম – অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় রামচন্দ্রের ঘোড়া ছাড়া হল, ঘোড়ার সাথে ছিলেন শত্রুঘ্ন। দেবপুর নামে এক রাজ্যে বীরমণি নামে এক রাজা ছিলেন। সেই রাজ্যের ভিতর দিয়ে ঘোড়া যাচ্ছিল। রাজার ভাইরা ঘোড়া দেখে বেঁধে নিয়েছে। বীরমণি খবর পেয়েই বললেন, 'আরে কি করছ, এটা রামচন্দ্রের ঘোড়া, শিগ্‌গিরি ছেড়ে দাও, তা নাহলে ঝামেলা হয়ে যাবে'। ভাইরা বলছে, 'ঘোড়া তো আমরা বেঁধে নিয়েছি, এখন ছেড়ে দিলে আমাদের বেইজ্জতি হয়ে যাবে, এখন যদি যুদ্ধ করতে হয় করব'। ওদিকে শত্রুঘ্ন দেখছে, এরা ঘোড়াকে বেঁধে নিয়েছে। দেবপুর রাজ্যের বৈশিষ্ট্য হল, এই রাজ্যের অধিষ্ঠান দেবতা হলেন শিব, তিনি বর দিয়ে রেখেছেন, দেবপুর রাজ্যকে তিনি রক্ষা করবেন। এগুলো আমাদের ভারতবর্ষের খুব প্রাচীন ধারণা। যেমন আমাদের কলকাতায় যে কালীঘাট মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মা কালী হলেন কলকাতার অধিষ্ঠাত্রি দেবী, তিনিই রক্ষা করেন।

আমরা ছোটবেলা শুনতাম, মাঝ রাত্রে মা কালী ঘুরতে বের হন। যে যে শহরে খুব বিখ্যাত সব মন্দির আছে, সেখানে এটা প্রচলিত বিশ্বাস যে, এই সময় সেখানকার অধিষ্ঠান দেবতা শহর ঘুরতে বেরোন, ফলে সেই সময় সেই শহরে আধ্যাত্মিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। যেমন কাশীতে বলে সকালবেলা এই তরঙ্গ প্রবাহিত হতে শুরু হয়। বৃন্দাবনে মাঝরাত্রে আধ্যাত্মিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। সেটাকে নিয়ে কেউ একজন স্বামী ভূতেশানন্দজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বেলুড় মঠে এই তরঙ্গ কখন চলে'? মহারাজ শুনে খুব জোর একটা হাসি দিলেন, হেসে বললেন, 'এখানে চব্বিশ ঘন্টা চলে'।

এখন লড়াই শুরু হল। লড়াইতে দেবপুরের সৈন্যরা হারতে শুরু করেছে। ওরা তখন শিবের কাছে প্রার্থনা করেছে। শিব তখন নিজের নন্দি, ভৃঙ্গি, বীরভদ্র এদের সবাইকে পাঠিয়ে দিলেন। এরা আসার পর রামের লোকের প্রচণ্ড মার খেয়ে গেছে। তখন শ্রীরামচন্দ্রের কাছে খবর পাঠানো হল, আপনি নিজে আসুন। শ্রীরামচন্দ্র এসে দেখছেন, আরে এখানে তো শিবের সেনারা সব রয়েছে, এদের তো হারানো যাবে না। বিশ্বামিত্র একবার খুশি হয়ে শ্রীরামকে অনেক দিব্যাস্ত্র দিয়েছিলেন। লঙ্কার যুদ্ধে শ্রীরাম দিবাস্ত্রগুলি খুব বেশি ব্যবহার করেননি। এবার তিনি সেই দিব্যাস্ত্রগুলি পুরোদমে ব্যবহার করতে নেমে গেলেন। ব্যস্, এখন শিবের সেনারা আর দাঁড়াতে পারছে না। তখন ওরা সবাই মিলে প্রার্থনা করেছে – হে শিব এই রাজ্য আপনার, আপনার রাজ্যকে রক্ষার জন্য আপনি স্বয়ং যুদ্ধে নামুন।

শিব এবার নিজে এসে গেছেন। শিবকে দেখে সমস্যা হয়ে গেছে রামচন্দ্রের, কারণ শিব হলেন রামের গুরু, গুরুর সাথে কি করে যুদ্ধ করবেন! এখন দুজন দুজনকে বোঝাচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্র বোঝাচ্ছেন, এটা অশ্বমেধ যজ্ঞ, একবার এই যজ্ঞ শুরু করার পর আমাকে সম্পূর্ণ করতেই হবে, আর

এই যে যজ্ঞটা করতে নেমেছি, আপনার নামে এই যজ্ঞ করছি। আমি যদি এখন পিছিয়ে যাই, এতে আপনার দুর্নাম হবে। শিব বলছেন, এই রাজ্য আমার রক্ষিত, এখানে তুমি যুদ্ধ করতে পার না। তাহলে যুদ্ধ হোক। এখন রামচন্দ্র একটার পর একটা দিব্যাস্ত্র চালাতে শুরু করলেন, আর শিব অবলীলায় সেটাকে আটকে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে অযোধ্যার সব সেনা মরে পড়ে আছে, শত্রুঘ্নও মারা গেছে। তখন রামচন্দ্র আর কোন উপায় না পেয়ে পাশুপত অস্ত্র তুলে নিলেন। পাশুপত হল শিবের অস্ত্র, আর এই অস্ত্র ছাড়লে সমস্ত সৃষ্টিকে সংহার করে দেবে। পাশুপত অস্ত্র তোলাতে শিব খুব খুশি হয়ে গেলেন, রামকে বলছেন, দেখলে তো, শেষ পর্যন্ত আমার শরণে তোমাকে আসতে হল। বল তুমি কি বর চাও? শিবের একটা নাম আশুতোষ, যে তাঁর শরণ নেয় তিনি তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে যান। রামচন্দ্র তখন বললেন, আমার যত সৈন্য মারা গেছে, সবাইকে আবার জীবিত করে দিন। হনুমান শত্রুঘ্ন আদি সবাই মরে গিয়েছিল, আবার সবাই বেঁচে উঠলেন। এরপর সমস্যার মিটমাট করার জন্য মীমাংসা করা হল – রাজা রাজ্য ছেড়ে দেবে, মানে শ্রীরামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করে নিল। শ্রীরাম আবার রাজার সন্তানকেই রাজ্য চালানো ভার অর্পণ করে দিলেন, সেই ছেলেও আবার অশ্বমেধ যজ্ঞে অংশ নিয়ে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, ইত্যাদি করে সব মিটমাট হয়ে গেল।

রামের সাথে শিবের যে ভয়ানক লড়াই সেটা মিটে গেল, কিন্তু রামের বানর সেনা আর শিবের ভূতপ্রেতগুলির মধ্যে লড়াইটা মিটল না। এখনও নাকি এই লড়াই চলছে। এখনও লড়াই চলে বলেই তুলসীদাস খুব নামকরা হনুমান চালীশা রচনা করলেন। তুলসীদাসের নাকি ভূতের ভয় ছিল। একবার ওনাকে কোথাও যেতে হবে, যাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি করে উনি এই হনুমান চালীশা রচনা করলেন। তার মধ্যে খুব নামকরা একটা লাইন হল – *ভূতপিশাচ নিকট নহি আবই*। ভূতপিশাচ কাছে আসতে পারবে না কেন? হনুমানজীর নাম নিয়েছে কিনা, হনুমানের নাম নিলে ভূতপিশাচগুলো পালিয়ে যায়। ঠাকুর বলছন, শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচি আর মেটে না। ওদের ঝগড়া এখনও চলছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, যাদের ঝগড়া ছিল তাদের মধ্যে মিটে গেল, কিন্তু তাদের নিজের যারা আছে, তাদের ঝগড়া আর মিটতে চায় না। ঠাকুর বলে যাচ্ছেন।

"**আপনার লোক তা এরূপ হয়ে থাকে**"। বাংলাতে অনেকেই ঠাকুরের এই কথাগুলো নিয়ে রিসার্চ করেন, লেখালেখি করেন। ঠাকুরের যেমন একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে, আবার অন্য দিকে তিনি জাগতিক ব্যাপারে যখন নামছেন, লৌকিক জিনিসগুলি যদি দেখেন, কত সহজ সরল ভাবে একেবারে বাস্তব কথাগুলো বলতেন। হৃদয়রাম আর ঠাকুরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ প্রায় সব সময় লেগেই থাকত। ঠাকুর হৃদয়রামকে বলতেন – দেখ হৃদু আমি রেগে গেলে তুই চুপ করবি, তুই রেগে গেলে আমি চুপ করব, না-হলে খাজাঞ্চিকে ডাকতে হবে। এগুলো খুব লৌকিক ও জাগতিক কথা। বৈজ্ঞানিকদের জীবনী পড়লে দেখা যায়, একটা বিদ্যাতে যদি কেউ বেশি এগিয়ে যায়, ধীরে ধীরে ওর বুদ্ধিটা প্রচণ্ড সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়।

একটু অন্য দিক থেকে বলছি, স্টক মার্কেট বা শেয়ার মার্কেটের কথা সবাই শুনে থাকবেন। শেয়ার মার্কেট পুরোটা হল র‍্যাণ্ডম; কিভাবে শেয়ার মার্কেট চলে আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। প্রথমের দিকে এমবিএ গ্রাজুয়েটেরা ওখানে কাজ করত। তারপর দেখা গেল ঠিক জমছে না। কারণ প্রথমে ওরা শেয়ার মার্কেটে যায়, গিয়ে সেখানে মার খায়, তারপর শেয়ার মার্কেট ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন ওরা দেশ-বিদেশ থেকে তাদেরকেই আনতে শুরু করলেন, যারা গণিতে পারদর্শি। এর উপর খুব মজার মজার বর্ণনা রয়েছে। দেখলেই বোঝা যেত যে, এই লোকটা জগৎ নিয়ে কিছু বোঝে না, কিন্তু আশায় এসেছে যে ওয়াল স্ট্রীটের শেয়ার মার্কেটে গিয়ে ওরা কাজ করবে। হতে হতে এখন ম্যাথিম্যাটিক্যাল যে মডেলগুলো কাজ করে, সেগুলো এত জটিল যে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা ছাড়া ওটা কেউ চালাতে পারবে না। শেয়ার মার্কেটে আসল যারা কাজ করে, তাদের গণিতের মাথা সাংঘাতিক। বলে, ওদের এত বুদ্ধি, কিন্তু এরা যখন ব্যবহারিক জীবনে আসে তখন ওই বুদ্ধিটা একেবারে শূন্য হয়ে যায়।

স্বামীজীর মত ব্যক্তিত্ব, কলেজ জীবনে তিনি কত কি করছেন, কিন্তু বিদেশে আসার পর দেখা যাচ্ছে ওনার সাংসারিক বুদ্ধি একেবারে শূন্য। কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্রে এসে অবাক হয়ে যেতে হয়। কক্ষণ কোন জায়গায় দেখা যাবে না যে ঠাকুরের সাংসারিক বুদ্ধি এক পয়সা কম। সাংসারিক বুদ্ধি এখানে কোন কিছু অর্জন করার জন্য নয়, সংসার চালানোর জন্য যে বুদ্ধি দরকার। সেইজন্য ঠাকুর শিবের মত সন্ন্যাসীদেরও গুরু আবার গৃহস্থদেরও গুরু। ঘর, পরিবার কি করে চালাতে হবে সেটাও ঠাকুরের কাছে শিখতে হয়। সর্বস্ব ত্যাগ কিভাবে করতে হয়, এটাও ঠাকুরের কাছে শিখতে হয়। আমরা আমাদের অনেক সিনিয়র মহারাজদেরও দেখেছি যে, যেখানে প্র্যাক্টিক্যাল ব্যাপার, সেখানে কোন বুদ্ধি নেই।

মহাপুরুষ মহারাজের সময় গণেন ব্রহ্মচারী নামে একজন মহারাজ ছিলেন, উনি পাওয়ার অফ এ্যটর্ণি ছিলেন। পাওয়ার অফ এ্যটর্ণি ছিলেন বলে তিনি কিভাবে বেলুড় মঠের সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছিলেন। তারপর টুকটাক অশান্তি হতে শুরু হল, নিজেই তিনি সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করলেন অশান্তি আরও বাড়তে থাকল। তারপর তিনি কোর্টে একটা কেস ঠুকে দিলেন, এগুলো সব আমার সম্পত্তি। বেলুড় মঠের তরফের উকিলদের মঠে আসা শুরু হল। সেখানে একটা খুব নামকরা কথা মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ উকিলদের হাতজোড় করে বলছেন – স্বামীজী মহারাজ এই মঠ করেছিলেন, যাতে গরীবের দুটো ভাল কাজ হয়। আমাদের বিষয়বুদ্ধি (সাংসারিক বুদ্ধি) পাঁচ বছরের বাচ্চার মত। এটা যে কত একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে বোঝান যাবে না। একজন সন্ন্যাসীর যদি বিষয়বুদ্ধি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। সন্ন্যাসীর মধ্যে যদি চালাকি থাকে, তাহলে কিছু গোলমাল অবশ্যই আছে। সন্ন্যাসী মানে তাঁর মন একেবারে পরিষ্কার।

ঠাকুরের মন একেবারে পরিষ্কার, কিন্তু উপলব্ধিমূলক যে শক্তি, সেটা সাংঘাতিক। নিজের জন্য কিছু অর্জন করতেন না, যা কিছু করতেন দু-চারজনের ভালর জন্যই করতেন। সেখান থেকে মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন – আপনারা যা ভাল বলবেন, আমরা সেটা মেনে নেব, কারণ আমরা তো লড়তেই পারব না, সেই বুদ্ধিই নেই। তারপর যাই হোক, প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়ে সব কিছু মিটমাট করতে হয়েছিল। সেই সময় বেলুড় মঠ প্রায় কাঙাল হয়ে গেল, কারণ যা টাকা-পয়সা ছিল প্রায় সবটাই তখন দিয়ে দিতে হল। ঠাকুরের কিন্তু এটাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাই বলে যে তাঁর বিষয়বুদ্ধি ছিল তাও না। লীলাপ্রসঙ্গে অনেকগুলো বর্ণনা আমরা পাই, যেখানে অনেক সময় তিনি এমন কথা বলছেন যে, বোঝা যাচ্ছে একেবারে বাচ্চার মত বুদ্ধি। কিন্তু বুদ্ধি তাঁর প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ। ফলে যে জায়গাতে তিনি বুদ্ধি লাগাচ্ছেন, সেখানে যেমনটি হবার কথা ঠিক তেমনটিই বলছেন। সেই রকমই একটি কথা – '**আপনার লোক তা এরূপ হয়ে থাকে**'।

এখানেই ঠাকুর আবার রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী নিয়ে আসছেন। সেখানে লব-কুশও অশ্বমেধের ঘোড়াকে আটকে দিয়েছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের মূল গ্রন্থে এই কাহিনী নেই, পরে পরে যোগ করা হয়েছে। কাহিনীটা খুব রসালো। কাহিনী হল, লব-কুশ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে বেঁধে রেখেছে। ঘোড়াকে হনুমান নিয়ে আসছিল, হনুমানকেও ওরা বানর মনে করে বেঁধে ফেলেছেন। সীতাকে এসে লব-কুশ সব বলেছে, সীতাও বুঝে গেছেন এ হনুমান কোন হনুমান। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে সীতা বলছেন, এই ঘোড়া তোমাদের বাবার ঘোড়া। ততক্ষণে লব-কুশের কাছে সবাই হেরে বসে আছে। তখন রামচন্দ্র নিজে এসেছেন যুদ্ধ করার জন্য। সীতা তখন গিয়ে ওই যুদ্ধকে আটকালেন যাতে পিতা-পুত্রের যুদ্ধ না হয়। সেটাই ঠাকুর এখানে বলছেন –

লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার জানো মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। মা আর মেয়ের মধ্যে কোন কারণে ঝগড়া হয়ে গেছে, তখন মা আলাদা মঙ্গলবার করছে, মেয়ে আলাদা মঙ্গলবার করছে। ঠাকুর বলছেন, **মার মঙ্গল, আর মেয়ের মঙ্গল যেন দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে; আবার ওর**

একটি দরকার। এই ধরণের পরিস্থিতি সব জায়গাতেই হয়। আমাদেরও হয়, রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথম থেকেই লেগে আছে। স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ আলাদা একটা মঠ তৈরী করে নিলেন। এখন যেখানেই যাবেন চারিদিকেই দেখবেন কত প্রাইভেট মঠ। সাধু রেগে গেলেন, বেরিয়ে গিয়ে আলাদা একটা মঠ করে নিলেন। কিন্তু এখানে ব্রাহ্মসমাজ পুরোটা মাঝখান থেকে ফেটে গেল। ঠাকুর বলছেন, **তবে এ-সব চাই। যদি বল ভগবান নিজে লীলা করেছেন, সেখানে জটিলে-কুটিলের কি দরকার? জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না! (সকলের হাস্য) জটিলে কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না!**(উচ্চহাস্য)

ঠাকুর আবার রামানুজের গল্প বলছেন–**রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দুজনে অমিল। গুরুশিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগল। এরূপ হয়েই থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক**।

কিন্তু জটিলে-কুটিলের ব্যাপারটার গুরুত্ব এখানে খুব বেশী। এটার আলোচনা করার জন্য আমরা এত লম্বা আলোচনা করলাম। জগতের দিকে তাকালে আমরা যা দেখি, তাতে ভাল খুব কম, সবটাই মন্দ। এক দানা চিনি যদি পান, তাতে দশ দানা বালি। কেন এই রকম, এটা কি, ওটা কি এবং কেন? বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেন। কেউ বলে, সবটাই হল চান্স, হয়ে যাচ্ছে, অত ভাবাভাবির কিছু নেই। কেউ বলে কর্মের প্রবাহে চলছে, কেউ বলছে ঠাকুরের ইচ্ছা। সমস্যা হল, আমরা যখন জড়িয়ে যাই, তখন প্রাণ যায়। না জড়ালেই হল, মুখে বলে দেওয়া সোজা, না জড়িয়ে থাকা যায় না। দেখা যায়, কেউ যখন ঝগড়া বিবাদ মেটাতে যায়, হঠাৎ তার মাথার উপর এসে কিছু একটা পড়ল। তখন সেও নেমে পড়ে ঝগড়ায়। নিরপেক্ষ থাকা যায় না, সম্ভবই না। তাহলে উপায় কি? এটা বলে যে, যখন আপনি একটা আউটলুক নেবেন, এরপর ওটাকে যদি ধরে রাখেন, তখন ধীরে ধীরে নিজেকে এসবের থেকে আলাদা করে নিতে পারবেন।

উপায় দুটি। একজনের সাথে আমার কথা হচ্ছিল, আমি তাকে বললাম, হয় আপনাকে নিতে হবে সবটাই ঠাকুরের ইচ্ছা, যেখানে যা কিছু হচ্ছে সব ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, নারীকে মাতৃস্বরূপ দেখবে, মায়ের মত দেখবে। আমাদের একজন নামকরা মহারাজ ছিলেন, খুব কড়া। আমরা তখন ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে আছি। তিনি আমাদের বলতেন – ঠাকুর বলেছেন, মেয়েদের মা বলে দেখবে। তাই বলে তাদের পিছনে ম্যা ম্যা করে ঘুরবে না। মা বলে দেখবে ঠিক আছে; কিন্তু আবার অন্য অনেক কথাও বলেছেন – যেমন এদের থেকে দূরে থাকবে ইত্যাদি। এটাই হল আসল। হয় আপনি সব কিছুতে ঠাকুরের ইচ্ছা দেখুন, আর তা নাহলে, গীতায় যেমন বলছেন – *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, সবটাই ফালতু বলে নিজেকে সব কিছু থেকে আলাদা করে নিন। দুটোর মধ্যে একটা করুন।

যদি মাঝামাঝারি করেন – এই আপনি বললেন সবটাই ঠাকুরের জগৎ, আর এই বললেন আমি সব ছাড়লাম; না এটা হয় না। মুখে বলে দিলেই হয় না, লম্বা একটা সাধনার জীবন লাগে। আর সাধন-জীবন যখন চলে, ঠাকুর যেমন বার বার বলছেন প্রথমে নেতি নেতি। নেতি নেতি করে যখন ছাদে যায় তখন দেখে ইতি ইতি, সবই তিনি। যার জন্য সবটাই ঈশ্বরের, সব ঠাকুরের; এটা বুঝতে অনেক সময় লাগে, এটাকে একদিনে মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, যেমন ভাগবত আদিতে দেখা যায়, তাঁরা কি দেখেন? কৃষ্ণ কত রকম দুষ্টুমি করছেন। ভাগবতে কিছু কিছু এর বর্ণনা আছে। কিন্তু পরে যে ভক্তি সাহিত্যগুলো এসেছে, তারা এর কত রকম বর্ণনা করেছেন, সারাদিন কৃষ্ণ দুষ্টুমি করে যাচ্ছে। তাই বলে মা যশোদা কক্ষণ রাগ করছেন না। তখন এই দুষ্টুমিগুলোকে জটিলে-কুটিলে রূপে নিতে হয়।

বলছেন, লীলা পোষ্টাই হয় না। ভক্তদের দৃষ্টিতে এই জগৎ তাঁর লীলা। স্বামীজী এক জায়গায় একটা ট্রাইবের স্বর্গের কল্পনা বর্ণনা করছেন। ওই ট্রাইবরা শুধু শিকার করে। তাদের স্বর্গ কি রকম? মরার পর ওরা স্বর্গে যায়। সকালবেলা সেই স্বর্গবাসীরা ঘুম থেকে ওঠে, সবার হাতে একটা করে বল্লম বা তীর-ধনুক থাকে। একটা শূকর আসে, সবাই মিলে দৌড়ে তাকে শিকার করে, শূকরটা মারা যায়। ততক্ষণে সন্ধে হয়ে যায়। সবাই ঘুমিয়ে পরে। সেই শূকরটা আবার পরের দিন সকালে এসে যায়। স্বর্গে গিয়ে রোজ ওই একটা শূকরকে শিকার করা, কারণ ওটাই ওদের maximum কল্পনা। লীলাতে যদি এটাই হয়, সৃষ্টি করলেন, সব ভাল চলল, মরে গেল, স্বর্গে গেল, মুক্তি হয়ে গেল; তাহলে লীলা করা কেন? একটা খুব সুন্দর লেখা পড়ছিলাম, লোকেদের কেমন কেমন আউটলুক থাকে। একজন মহিলা লিখেছেন, এই উপন্যাসটা পড়লাম, একটা থার্ড গ্রেড উপন্যাস। কোন মার্ডার নেই, মার্ডার না থাকলে কি উপন্যাস হয়! আরও লিখছেন, আমি জানি এটা লাভস্টোরি, তাতে কি হল, লাভস্টোরি হয়েছে তো কি হয়েছে, একটা মার্ডার থাকবে না!

সব রকমের রস যদি না থাকে, শুধু ডাল-ভাত খেয়ে কতদিন চলবে। দিনের পর দিন শুধু ডাল আর ভাত, এভাবে চলে নাকি? লোকেরা বাড়িতে আচারই পাঁচ রকমের রাখে, এক রকম আচারে চলে না। সব ভাল ভাল লোক দিয়ে যদি জগৎ চালানো হয়, ওই জগৎ কি একটা থাকার মত জায়গা হবে? একটা মারামারি হল না, একটু কাটাকাটি হল না, ঝগড়া হল না। যার উপর দিয়ে যায় তার কষ্ট আছে ঠিকই। কিন্তু এখানে সাধারণ লোকেদের কথা বলা হচ্ছে না। একজন নামকরা গ্রীক দার্শনিক ছিলেন, তিনি সব সময় বলতেন – The world is a dream। একবার শত্রুরা তাঁকে ধরে তাঁর উপর খুব অত্যাচার করতে শুরু করেছে। যন্ত্রণায় তিনি চিৎকার করছেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেসে করছে, 'কি এখনও মনে হচ্ছে জগৎ একটা স্বপ্ন'? বললেন, 'হ্যাঁ এখনও স্বপ্ন, তবে দুঃস্বপ্ন'।

জগৎ তাঁর লীলা ঠিকই, তবে লীলার মধ্যে সব রকম রসই থাকবে। সিনেমা দেখতে গেলে লোকেরা খোঁজ নেয় একটু হাসি আছে কিনা, একটু কান্না আছে কিনা, রহস্য আছে কিনা, খুনখারাপি আছে কিনা, মারামারি আছে কিনা। আসলে বক্তব্য হল, জীবন এভাবেই চলে। এর থেকে অন্য রকম সংসার আগে কোন দিন ছিল না, কোন দিন আসবেও না। এটা কিন্তু একটা আউটলুক। যার জন্য দুষ্টরূপী নারায়াণ, লোচ্চারূপী নারায়ণ, হাতি নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ, সব কিছুই নারায়ণ। এটাকে বুঝে নিলে জীবনে শান্তি আসে। যদি বলেন, আমি এটা মানতে পারছি না। স্বামীজীকে নিয়ে একজনকে বলতে দেখলাম, স্বামীজী বলছেন 'দরিদ্র নারায়াণ', সে বলছে, 'কেমন বোকা কথা, নারায়ণ কি কখন দরিদ্র হন'? স্বামীজী কবে বললেন নারায়ণ দরিদ্র; স্বামীজীর বক্তব্য, যিনি দরিদ্র তাঁকে নারায়ণ রূপে দেখা। শ্রীকৃষ্ণ ছোটবেলায় কত দুষ্টুমি করছেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের বাচ্চা বয়সে কোন দুষ্টুমির বর্ণনা নেই। দুষ্টুমির বর্ণনা কৃষ্ণের নামেই আছে। যদি এটা না নিতে পারেন তাহলে, জগৎ অনিত্য, অসার; এই সংসার আমড়া, শুধু আঁটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল; এই ভাবটা মাথায় রেখে সব কিছু ছেড়ে জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

এই সব বলে ঠাকুর কেশব আর বিজয়কে মেলাচ্ছেন – এরূপ হয়েই থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক। এই বোধটা রাখতে হয় – আপনার লোক। এগুলো যার যার নিজের নিজের মত। এর উল্টোটাও আছে, বলছে – হাতুড়ি লোহাকে মারছে, প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে। অন্য দিকে সোনাকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছে কোন আওয়াজ নেই। সোনা লোহাকে বলছে, 'দেখ আমাকে মারে কই আমি তো কোন আওয়াজ করি না, তুমি কেন এত আওয়াজ কর'? লোহা বলছে, 'আপনজন কিনা, আপনজন মারলে ওটা সহ্য হয় না, অপরে মারলে ঠিক আছে'। ভারতবর্ষও তাই, ইংরেজরা রাজ করছে করুক, নিজের লোক রাজ করতে এলে বলবে, 'তুমি আমার রাজা হতে চাইছ? এত হিম্মত হয়ে গেছে'? বলে বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়ে। দুই রকমেরই আছে।

ঠাকুর কিন্তু এখানে, আপনজন এই ভাবটা নিচ্ছেন, আপনজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে, আবার মিলেমিশে থাকতে হয়। এই পরিচ্ছেদ এখানে শেষ হয়ে যায়। এরপর অষ্টম পরিচ্ছেদ শুরু হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেশবকে শিক্ষা – গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজ – গুরু এক সচ্চিদানন্দ

সকলে আনন্দ করিতেছেন। ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন, "তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই এইরূপ ভেঙে ভেঙে যায়"। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, একজন ঠাকুরকে বলছিলেন, মহাশয় আপনার faculty of organization নেই; অথচ কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজ কোথায় হারিয়ে গেল, আর রামকৃষ্ণে মিশন যত দিন যাচ্ছে ঠাকুরের ভাব নিয়ে তত বিস্তার করছে। ঠাকুর তখনই কেশব সেনকে বলে দিয়েছিলেন – তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না। আমরা পরে পরে দেখেছি, রামকৃষ্ণ মিশনের এটা কারুরই ছিল না। একবার একজন এসেছেন মহাপুরুষ মহারাজ তাকে চলে যেতে বললেন, তোমার দ্বারা হবে না। সেটা দেখে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলছেন, 'দাদা, এক ঠাকুরই ছিলেন যিনি মানুষ চিনতেন, আমার সেই ক্ষমতা নেই, তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তুমি বিচার কর সে থাকবে কি থাকবে না'। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিছিয়ে গেলেন। এই যে ঠাকুর বলছেন – প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, থিয়োরেটিক্যালি খুব সুন্দর কথা, আচার্য শঙ্করও শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের নামে বলছেন – ভাল শিষ্য পেলে শিক্ষার প্রচার-প্রসার খুব ভাল হয়। কিন্তু ভাল কি খারাপ, এটা বুঝতে পারা খুব মুশকিল।

মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।(সকলের হাস্য)

মানুষের যে মন, সেই মনে কি আছে বোঝা যায় না। যার উপর আপনি ভরসা করলেন, দেখলেন সেই আপনাকে ঠকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্বামীজী এত লোকের কাছে ঠকে ছিলেন যে, ঠকার ব্যাপারে স্বামীজী রেকর্ড করেছিলেন। খুব কম লোকই স্বামীজীর জীবনের শেষ অব্দি পাশে ছিলেন। সবারই কাছে তিনি কোন না কোন ভাবে ঠকেছেন। ঠাকুর কোন দিন ঠকলেন না, তিনি একবার দেখেই উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবটাই বুঝতে পারতেন। মহাপুরুষ মহারাজ ব্রহ্মজ্ঞানী, ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদ, তিনি সেই গণেন ব্রহ্মচারীর কাছে সব কিছু হারিয়ে ফেললেন, গণেন ব্রহ্মচারীকে চিনতেই পারলেন না! ঠাকুর যদি কাউকে বাজারে হাড়ি কিনতে পাঠাতেন, তাকে বাজিয়ে বাজিয়ে দেখে নিতে বলতেন ফুটো আছে কিনা। আবার মনে করিয়ে দিতেন, ফাউ আছে কিনা সেটাও যেন চেয়ে নিয়ে আসে। একজন যিনি সব সময় সমাধিতে আছেন, অন্য সময় সব দিকে তাঁর নজর আছে। লাটু মহারাজ মশলার বটুয়া নিতে ভুলে গেছেন, ঠাকুর তাঁকে বলছেন, আমি সব সময় সমাধিতে থাকি, কিন্তু আমার কোন কিছুতে ভুল হয় না, আর তোর এটুকুতেই এই অবস্থা।

এটা খুব একটা উচ্চ অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। যখন জীবনমুক্তির কথা বলা হয়, এটাই কিন্তু আদর্শ। শুধু যে সমাধিস্থ হয়ে থাকবে, তা না, সংসারেও আপনার বিচরণ সাংঘাতিক হবে, কোথাও কোন বেচাল কিছু হবে না। আমাদের ক্ষেত্রে একটু জপধ্যান করলেই জগৎ যেন অন্য রকম হয়ে গেল। ঠাকুরই সেইজন্য ঠিক ঠিক আদর্শ। মানুষকে বুঝতে হয়, তার মনে কি আছে পড়ার চেষ্টা করতে হয়। বোঝা খুব মুশকিল, কিন্তু একটু কাছে যদি থাকেন তাহলে দেখবেন, 'Carving Sky'বইতে আমি একটা কথা লিখেছি, আমি মানিও এটা, কিন্তু প্র্যাক্টিস করতে পারি না, সেটা হল – যে মানুষ একটা জিনিস আপনার সাথে করেছে, সে আবার সেটা করবে, পুনরাবৃত্তি হবেই; এর ব্যতিক্রম কখনই হবে না। আপনি আপনার জীবনের দিকে তাকান, যে আপনার কাছে ছিল, যে আপনার দূরে ছিল, একটা

লোক যদি একটা জিনিস করে থাকে, আবার সে করবে। আপনার কাছে যদি সে মিথ্যা কথা বলে থাকে, সে আবার মিথ্যা কথা বলবে।

এক সময় আমি ছাপড়ায় ছিলাম, সেখানে একজন উকিল ছিল, ভাল মানুষ। থেকে থেকে একে তাকে ধরে নিয়ে আসতেন আর বলতেন, আশ্রমে এ বিরাট কাজ করবে। তারপর দেখা যেত, লোকটা কোন কাজে এলো না। উকিলের ছেলে খুব বুদ্ধিমান, সে আমাকে বলছে, 'এই এলাকার যত চোর, ছ্যাঁচড়, বদমাইশ আছে এরা সমস্ত দুনিয়াকে বোকা বানিয়ে আমার বাবার কাছে আসে। আর আমার বাবা মনে করেন, ওনার কাছে এলে সবাই যেন সাধু হয়ে গেল। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের নাম শুনে বলে, হ্যাঁ আমি এটা করব, সেটা করব'। তাদেরকে উকিলবাবু আশ্রমে নিয়ে আসেন, তারপর দেখা যায় কিছুই কাজ জানে না। আরে যে চোর বাইরে চুরি করছে, লোকেদের ঠকাচ্ছে, সে কি আপনাকে ছেড়ে দেবে নাকি!

একটা কাহিনী আছে, একজন চোর চুরি করা ছেড়ে দিয়ে সাধু হয়ে গেছে। আশ্রমে এসে সে আর চুরি করছে না, স্বভাব পাল্টে গেছে। কিন্তু মনের মধ্যে নিশপিশ করছে। সবাই যখন খেতে বসে তখন সে সবার জুতোগুলিকে এলেমেলো করে দেয়। হিন্দিতে খুব নামকরা কথা আছে, *চোর চোরিসে য্যায় হেরাফেরিসে না য্যায়*। চোর চুরি করা ছেড়ে দেবে ঠিকই, কিন্তু অভ্যাস চলে যাবে না, হেরাফেরি করা ছাড়তে পারবে না; একজনের এক পাটি জুতো আরেকজনের জুতোর সাথে পাল্টাপাল্টি করে দেবে, বা দুজনের জুতো অন্য জায়গায় রেখে দেবে। হেরাফেরি থেকে বেরোতে পারবে না।

যে লোক একবার লক্ষ্মণ রেখা অতিক্রম করে আপনাকে কটূ কথা বলেছে, তারপর ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে, আপনি জানবেন, আরেকবার ও লক্ষ্মণ রেখা পেরোবে। যদি মনে করেন লোকটা সাধু হয়ে গেল, ভুল মনে করবেন; হয় না। কিন্তু ঠাকুর আমাদের মত কথা শুনে, ব্যবহার দেখে এগুলো করতেন না। তিনি লোক দেখলেই তার মন বুঝতে পারতেন, তারপর উনি ঠিক করতেন কার সঙ্গে কতটা মিশবেন, কাকে কতটা বলবেন ইত্যাদি। ঠাকুর এখান থেকে পুরো টপিকটা পাল্টে দিয়ে বলছেন –

আমার কি ভাব জানো? আমি খা-দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্তা আর বাবা।

গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তানভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়? এখানে টপিকটা পাল্টে গেছে ঠিকই। আসলে কেশবচন্দ্র সেনকেই বলছেন। প্রথম কথা বলছেন – তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না। আসলে বলতে চাইছেন – কেশব সেন, গুরু হওয়ার যোগ্যতা তোমার নেই। কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথা সরাসরি বলা যায় না, উচিতও না, ঘুরিয়ে বলছেন। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছেন, আসলে গুরু হওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই। তদুপরি সেই সময় কেশব সেনের এত সম্মান, এত মান, পরিষ্কার করে এই কথা বলা যায় না। তারপরেই বলছেন –

লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীরও কত নাম, কেশব সেনেরও কত নাম। কিন্তু শেষমেশ কেউ দাঁড়াতে পারলেন না। বলছেন – **যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে**। আমরা যে এই ক্লাশগুলো নিচ্ছি, আমরা কিন্তু লোকশিক্ষা দিচ্ছি না, আমাদের কাছে এটা সাধনা। ভক্তিশাস্ত্রে বলছেন, *শ্রবণমঙ্গলম্*, এই কথাগুলো শুনলেও মঙ্গল, শোনাটাও একটা সাধনা। আমি আমাদের গুরুজনদের কাছে শাস্ত্রের দুটো কথা শিখেছি, সাধনা রূপে সেটাকে আমি ক্লাশে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। যাঁরা শুনছেন, তাঁদের কাছেও এটা সাধনা। যাঁরা শোনাচ্ছেন, তাঁদের কাছেও এটা একটা সাধনা। বাইরে যাঁরা আছেন, উত্তরাখণ্ডে, নর্মদাতে যাঁরা আছেন, তাঁরা মনে করতে পারেন যে, লোকেদের উপদেশ দিচ্ছেন। আমি কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসীকে দেখিনি, যিনি মনে করেন আমি উপদেশ দিচ্ছি। আমাদের এখানে সেইজন্য আগে ব্যাসপীঠ বলা হত। পরম্পরাগত ভাবে যাঁরা

সন্ন্যাসী, তাঁরা মানেন যে, ব্যাসদেবই আসল গুরু। তাঁর আসনে বসে ব্যাসদেবরই কথা শ্রোতাদের সামনে পরিবেশন করছেন। আমরা যে কথামৃতের কথা বলছি, এখানেও ঠাকুরের কথা পরিবেশন করা হচ্ছে। আপনাদের জন্য এটা সাধনা, আমার জন্যও এটা সাধনা। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন বা অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে তা নয়। তাঁরা মনে করছেন আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছেন, আর লোকসংগ্রহ, লোকেদের ভাল করার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, মনে করছেন তিনি যেন জগতের কত উপকার করছেন। ঠাকুর এই টপিকটা বারবার আনছেন। কারণ কলকাতার তৎকালীন বিদ্বৎ সমাজে এই জিনিসগুলো তখন প্রচুর ছিল।

নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। এই যে তিনজনের নাম বলছেন; নারদ, শুকদেব আর শঙ্কর, এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ, রামানুজকে ঠাকুর কখনই অবতার রূপে নিচ্ছেন না। শুকদেব আদেশ পেয়েছিলেন, তার মানে ভাগবত প্রামাণিক গ্রন্থ। আর শঙ্করারচার্যের কথা বলাতে, শঙ্করাচার্যের প্রত্যেকটি কথা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। এই অর্থে রামানুজ, মাধ্বাচার্যের নাম ঠাকুর কক্ষণ নেননি।

আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ তো জানো! ঠাকুর কলকাতার লোকদের মধ্যে সব সময় হুজুগ দেখতেন। এখনও একই জিনিস। সবটাতেই হুজুগ, হঠাৎ দেখবেন একটা মোমবাতির মিছিল। আর 'চলছে চলবে', 'চলবে না চলবে না' এগুলো তো কলকাতার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। **যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই**। যাঁরা এই শিক্ষাগুলো দেন তাঁদের ঠিক এক সমস্যাটা হয়। একটা নদী থেকে একটা ধারা বেরিয়ে যায়, প্রথমের দিকে ধারা খুব বেগে যাবে; কারণ ধারাটা নিচুর দিকে যাচ্ছে বলে বেগ থাকে। কিন্তু মূল স্রোতের সাথে যদি যুক্ত না থাকে, আস্তে আস্তে ধারাটা শুকিয়ে যাবে।

আমরা দেখেছি, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যাঁরা বেরিয়ে গেলেন, তাঁদের অনেকেই খুব নামকরা ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলেন না। যাঁরা প্রথমের দিকে এসেছিলেন, তাঁরা দেখলেন রামকৃষ্ণ মিশন আমার জন্য নয়। এই রকম কয়েকজন আছেন, যাঁরা জিনিসটা বুঝতে পারার পর বেরিয়ে গিয়ে পরে অনেক নাম করেছিলেন। কিন্তু যাঁরা রামকৃষ্ণ ভাবধারায় এসে গেলেন, পরে অমিল হয়ে গেল, তখন তিনি মনে করতে লাগলেন, এই নামযশ আমার নিজের জন্য; ছেড়ে দেওয়ার পর দেখা গেল দাঁড়াতেই পারলেন না। রামকৃষ্ণ মিশনের যে কোন সন্ন্যাসী হলেন একটা স্ফুলিঙ্গ, আসল আগুন হলেন ঠাকুরের আগুন। সেইজন্য আমি চলে গেলেও কিছু আসে যায় না, তিনি চলে গেলেও কিছু আসবে যাবে না। আগুন সেখানেই থাকবে। এই স্ফুলিঙ্গ যেমনি আলাদা হয়ে গেল, যতক্ষণ আছে ততক্ষণই আছে, এরপর আর কোন দাম নেই। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর খুব নামকরা কথা – Without Ramakrishna Mission there is no Ranganathananda। বলতে চাইছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের শক্তি আছে বলেই আমি আছি। ব্যক্তিস্তরে কোন দাম নেই, ঠাকুরের শক্তি আছে বলেই আছে।

কলকাতার লোক হুজুগে। এই এখানটা কুয়া খুঁড়ছে।–বলে জল চাই। সেখানে পাথর হল তো ছেড়ে দিলে। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল; ছেড়ে দিলে। আর-এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হল! এইরকম! হুজুগে! কোন কিছু ধরে রাখতে পারে না। ধরে রাখার জন্য যে ধৃতি থাকা দরকার, সেটা অবশ্য সকলের থাকে না।

আবার মনে-মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য-সত্যই সাক্ষাৎকর হন, আর কথা কন। ঠাকুরের এই কথাটা খুব দামী একটা কথা, সকলের নোট করে রাখা দরকার। তিনি যে সাক্ষাৎকার হন, কথা কন, তাই না, যদি আবশ্যক হয় আরেকজনকে গিয়ে বলবেন। আমাদের এখানে কি হয়, অনেক সময় কোন কোন সাধু-মহাত্মা একটু এলেমেলো হয়ে যান। একবার একজন মহারাজ, আমাদের থেকে ছোট ছিলেন, পরে অবশ্য ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি একদিন গিয়ে জেনারেল সেক্রেটারী মহারাজকে

গিয়ে বলছেন, 'ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়েছেন, তিনি বলছেন – তুমি দীক্ষা দাও'। জেনারেল সেক্রেটারী মহারাজ বললেন, 'আমাকে কিন্তু ঠাকুর এখনও বলেননি তোমাকে বলার জন্য'। এটা তিনি নিজে মনে করছেন। ঠাকুর সত্যিই যদি তাঁকে বলেন, তাহলে যে জায়গা থেকে ওনার দীক্ষা দেওয়া আটকাচ্ছে, সেখানে তাঁকে গিয়েও ওই রকম কথা ঠাকুর বলে দেবেন।

খ্রীশ্চান পরম্পরায় খুব নামকরা কাহিনী আছে। পল্ খ্রীশ্চানদের মারার জন্য দামাস্কাস যাচ্ছিল। হঠাৎ যীশু তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন, তাকে বলছেন – তুমি আমার সন্তানদের কেন কষ্ট দিতে চাইছ? পল্ ঘোড়ার পিঠে করে যাচ্ছিল, যীশুকে সামনে দেখে আর তাঁর বাণী শুনে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গেল। তিন দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। যখন হুঁশ ফিরে এলো, তখন বলছে – প্রভু ক্ষমা কর। পরে তিনি হয়ে গেলেন সেন্ট পল। ঈশ্বর যে শুধু আমাকে বা আপনাকে বলে দেবেন, তা না, দরকার হলে তাকে গিয়েও বলবেন। আমাদের কাছে অনেকে এসে বলে, ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়ে এই কথা বললেন। অনেক পাগল আমাদের কাছে আসতেই থাকে। আমাকেও কেউ কিছু বললে আমিও বলে দিই, ঠাকুরকে বলবেন, আমাকেও একটু বলে দিতে; তাহলে আপনার কথা শুনব।

সে-কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়। শুধু লেকচার? দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। কথা অনুসারে সে কাজ করবে না। রামকৃষ্ণ মিশন হল এর জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বামীজী যে কথাগুলো বললেন – আজ দেখুন গত একশ বছরে হাজার হাজার যুবক স্বামীজীর কথা শুনে সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সাধারণ লোক এই কথাগুলো বললে এতটা হবে না। ঈশ্বরের শক্তি না হলে এরকম হবে না।

এখান থেকে ঠাকুর আবার কামারপুকুরে চলে যাচ্ছেন। কিভাবে গ্রামের লোকেরা হালদার পুকুর নোংরা করে রাখত। লোকেরা গালাগাল দেয়, কিন্তু কেউ শোনে না। তখন ভারত বৃটিশদের রাজ্য ছিল, আগে ওরা ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ঠাকুর প্রথম থেকে কোম্পানিই বলতেন। বলছেন, এরপর কোম্পানি থেকে হালদার পুকুরে একটা নোটিশ লাগিয়ে দিল 'বাহ্য করিও না'। তখন সব বন্ধ হয়ে গেল। সরকারের ক্ষমতাকে, রাজদণ্ডকে সবাই ভয় পায়।

লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। চাপরাশ থেকে চাপরাসি, চাপরাসি মানে তার একটা অথরিটি আছে। ''**না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে** (হাস্য)**। হিতে-বিপরীত। ভগবানলাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়**। কারণ সবার জন্য একই নিদান নয়, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম জিনিসের দরকার আছে। ঈশ্বরলাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, লোক দেখলে বুঝতে পারে কার মনের কি ভাব, কার ভিতর কি গোলমাল আছে, তখন তার মত কথা বলে তার মত নিদান দেয়। অনেক সময় কাউকে দেখা যায়, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছেন, কিন্তু এখনও অন্তর্দৃষ্টি আসেনি। অন্তর্দৃষ্টি যখন আসে, স্বামীজী আদি ঠাকুরের পার্ষদদের যেটা ছিল, কাউকে দেখলে বুঝে যেতেন। স্বামীজী তো ব্যক্তিস্তরেই আবদ্ধ থাকলেন না, পুরো দেশের স্তরে, জাতির স্তরে গিয়ে কাজ করতেন। দেশের সমস্যা কোথায়, কি সমস্যা, এই সমস্যায় এইভাবে কাজ করতে হবে। আর দেখুন শেষ পর্যন্ত ঠিক তাই হল। স্বামীজী আসার পর ভারতবর্ষ একটা নূতন কলেবর ধারণ করে নিল।

আদেশ না থাকলে 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি' এই অহংকার হয়। অহংকার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্তা। ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না—এ-বোধ হলে তো সে জীবনমুক্ত। 'আমি কর্তা', 'আমি কর্তা'—এই বোধ থেকে যত দুঃখ, অশান্তি।

এই পরিচ্ছেদের পুরো আলোচনা যদি পর্যালোচনা করেন, তাহলে দশ থেকে পনের মিনিট হয়ত, কি আরও কম সময় হবে, শুরু করছেন কেশব আর বিজয়ের ঝগড়া দিয়ে। দুটো ছোট্ট গল্প বলে

সেখান থেকে বেদান্তের যে শেষ অবস্থা, যে উচ্চতম অবস্থা, সেখানে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কি সেটা? যখনই আপনার বোধ হবে, 'আমি কর্তা নই', আপনার জীবনমুক্তি হয়ে গেল। এরপর আপনি যেটাই করছেন, আপনি জানবেন আসল কর্তা ঈশ্বর, তিনিই সব করেন। যতক্ষণ এই বোধ না আসে, ততক্ষণ লোকশিক্ষাও দেওয়া যায় না। সব কিছু তাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে। এটাকে পুরোপুরি যখন ঠিক ঠিক জেনে গেলেন, তখন লোকশিক্ষা দিলে লোকেরা শোনে। এখানে ঠাকুর শুরু করলেন, জটিলে-কুটিলে এটা সেটা বলে, শেষে বেদান্তের শেষ কথা জীবনমুক্তিতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। অষ্টম পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়ে যায়।

নবম পরিচ্ছেদ

কেশবাদি ব্রাহ্মদিগকে কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ

কেশবের সঙ্গে স্টীমারে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ শেষ হতে চলেছে। স্টীমবোট এবার পৌঁছে যাবে, ঠাকুরও নেমে আসবেন, সেখান থেকে গাড়ী করে দক্ষিণেশ্বরে ফেরৎ আসবেন। এখানে বেশ কিছু সুন্দর আলোচনা আছে, বিশেষ করে কর্মযোগ নিয়ে। এর আগে ঠাকুর লোকশিক্ষার উপর অনেকগুলো কথা বললেন, যাতে বললেন, লোকশিক্ষা এভাবে দেওয়া যায় না। ঈশ্বর যতক্ষণ আদেশ না করেন, ততক্ষণ লোকশিক্ষা হয় না। সেখান থেকে এবার সেবা, উপকার করা, এই জিনিসগুলিকে নিয়ে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি)—তোমরা বল 'জগতের উপকার করা'। জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার কর। তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পার। নচেৎ নয়।

আমরা 'উপকার করা' এই কথাগুলো অনেক শুনে আসছি, এগুলো অনেক পুরনো কথা। আচার্য শঙ্করও বলছেন, *দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্*। এত পরিষ্কার ভাবে সেবা, পরোপকার নিয়ে আগেকার আচার্যরা কিন্তু বলেননি। বেদে ইষ্টাপুর্ত যজ্ঞের কথা আছে। হিন্দুরা সব কিছু যজ্ঞ রূপে দেখতেন। ইষ্টাপুর্ত, যেখানে গরীবদের সেবা, অতিথি সেবা এগুলো করতে বলা হচ্ছে, আর দ্বিতীয় হল সামহিক; গাছ লাগানো, পুকুর কাটিয়ে দেওয়া – এগুলো করতে হয়, এটকে যজ্ঞ রূপেই নেওয়া হত। খ্রীশ্চানরা ভারতবর্ষে আসার পর সেখান থেকে এসে গেল খ্রীশ্চান চ্যারিটি, চ্যারিটি মানে দান করা। মনুস্মৃতিতে মনু পরিষ্কার বলছেন, যখনই দান করা হবে তখন যে দাতা সে মনে করবে, আপনি আমার দান গ্রহণ করলেন বলে আমি ধন্য হলাম। আর যিনি দান গ্রহণ করলেন, তিনিও মনে করবেন, আমি ধন্য হলাম এই জন্য যে, আপনি আমাকে দানের পাত্র মনে করেছেন।

অনেক আগে আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, দেখলেই বোঝা যায় পড়াশোনা করা লোক, দেখতে সুপুরুষ। একবার তিনি গঙ্গাসাগর মেলায় গিয়েছিলেন। গঙ্গাসাগর মেলা মকরসংক্রান্তির দিনে হয়, ওইদিন হিন্দুরা দান করে। বলে যে, মকরসংক্রান্তিতে দান করলে বিরাট পূণ্য হয়। সেখানে একজন শেঠজী সাধুদের কম্বল দান করছিলেন। মহারাজকে দেখে ওনাকেও কম্বল দিয়েছেন। যেমনি মহারাজকে কম্বল দিয়েছেন, শেঠজীর গিন্নি শেঠজীকে এক ধমক দিয়েছেন – ওই কম্বল না, ভিতরে যে ভাল কম্বল আছে ওখান থেকে বার করে ওনাকে দাও। মহিলা মহারাজকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন এনার মান আলাদা। তখন ওই দানটা অন্য রকম হয়ে যায়। মহারাজ শুনে মজা করে হাসছেন। এই মনে করে হাসলেন, আপনাকে সাধারণ কম্বল দেওয়া যায় না, ভাল কম্বল দেওয়া উচিত। তার মানে উনি ওনাকে যোগ্য মনে করলেন ভাল জিনিস দেওয়ার। ছান্দোগ্য উপনিষদে অনেক উচ্চ তত্ত্ব যেমন আছে, তার সাথে ছোট ছোট খুব সুন্দর সুন্দর গল্পও রয়েছে। সেখানে রৈক্ক মুনির গল্প আছে।

একটা দেশের রাজা একদিন দেখছেন দুটি পাখি উড়ে যাচ্ছে আর বলতে বলতে যাচ্ছে – *অথ রৈক্ক অথ রৈক্ক*। তিনি রাজা কিন্তু ধর্মজগতেও খুব উচ্চ অবস্থায় ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পাখিরা

বলতে চাইছে যে, যেখানে যে যত পূণ্য করছে সব পূণ্য রৈক্ক মুনির কাছে যাচ্ছে। রাজা তখন খুঁজতে লাগলেন, রৈক্ক মুনি কে, তিনি কোথায় আছেন, কে এত বড় মুনি যাঁর কথা পাখিরাও জানে। রাজা ঘুরতে ঘুরতে একটা গরুগাড়ি দেখতে পান, দেখছেন গরুগাড়ির চাকায় হেলান দিয়ে একজন বসে আছেন। রাজা লোকটির সাথে কথা বলতে গেলেন, রাজাকে তিনি পাত্তাই দিল না। রাজা তখন নিজের মেয়েকে এনে বললেন, আমার এই মেয়ে আপনার দাসী হয়ে থাকবে। তখন রৈক্ক মুনি একটু নরম হলেন। এই গল্পটা আমার খুব মজা লাগে। রৈক্ক মুনি একজন ব্রহ্মজ্ঞানী, রাজা তার মেয়েকে দিয়েছে সেবা করার জন্য, তারপর তিনি উপদেশ দিতে লাগলেন। আসলে তা না, এর মর্মটা পুরো আলাদা। যে কোন মানুষের কাছে তার মেয়ে সবচেয়ে সম্মানের জিনিস ও সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। দেখবেন, ভারতের অনেক প্রান্তে মেয়েকে মা বলে ডাকা হয়, বিদেশে এ-জিনিস কল্পনাই করা যায় না। এর মধ্যে মজার ব্যাপার হল, সাধারণ ভাবে মায়েরা নিজের মেয়েকে মা বলে ডাকে না, বাবা, ঠাকুরদারা মা বলে ডাকেন। হিন্দু সমাজ কেন নিজের মেয়েকে এত সম্মান দেয়, এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। একটা মেয়েকে সবচেয়ে বেশি সম্মান একমাত্র তার বাবা দেয়। বাবা মেয়েকে যেমন সম্মান দেয়, ওই ভাবে আর কেউ মেয়েকে সম্মান দেয় না। আমরা শুনিনি কোন বাবা নিজের মেয়েকে মারধর করেছে। যদি মেরে থাকে, তাহলে বুঝতে হয় লোকটি নরাধম, একটা অসুর।

মহাপুরুষ মহারাজের সময় একজন ভক্ত ছিলেন, তিনি নিজেকে সব সময় ফিটফাট রাখতেন, ইংরেজদের মত আর কি। আর খুব কড়া ধাতের লোক। তার একটি মেয়ে ছিল। বলছেন, ওই মেয়ের সামনে তিনি একেবারে কাবু হয়ে গিয়েছিলেন। তিন-চার বছরের ছোট্ট মেয়ে কাদা মাটিতে খেলা করছিল, বাবাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে কাদামাটি মাখা জামা সমেত ফিটফাট বাবাকে জড়িয়ে ধরে। তার সাহেবি পোশাকে কাদামাটি লেগে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে, কিন্তু মেয়েকে কিছু বললেন না। ছেলেকে বাবারা ধমক দিয়ে দেয়, বেশি হলে একটা চড়ও মেরে দেবে, কিন্তু মেয়ের গায়ে বাবা কখনই হাত তুলবে না।

এখন সেই রাজা, একেই রাজা তার উপর জ্ঞানী, তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে দক্ষিণা রূপে রৈক্ক মুনিকে অর্পণ করে দিচ্ছেন। তার মানে, আমার যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, যেটা আমার সবচেয়ে প্রিয়, সেটা আপনাকে দিলাম। রৈক্ক মুনিও তখন সেই সম্মানের প্রত্যুত্তরে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতে শুরু করলেন। রৈক্ক মুনি মনে করছেন, আপনি আমাকে এই দানের যোগ্য মনে করেছেন। একটা সম্মান দেওয়া হচ্ছে, এর থেকে বেশি সম্মান দেওয়ার আমার আর কিছু নেই। সমস্ত রাজ্য দিয়ে দেওয়া আর নিজের মেয়েকে দিয়ে দেওয়া একই। এটাই আমাদের ধারণা, এখানে রাজা যে কোন রাজনীতির সমঝোতা করছেন, তা না; সত্যিকারের একটা সম্মান দিচ্ছেন। দানের ব্যাপারের হিন্দুদের এটাই ধারণা।

খ্রীশ্চানদের হল – এ তো ভগবানকে ছেড়েই দিয়েছে, অনেক পাপ করে এই দুরবস্থায় পড়ে গেছে, একে একটু দান করা যাক। খ্রীশ্চানদের চ্যারিটির পিছনে সব সময় এই ধারণা – তুমি নীচে পড়ে আছ, আমি তোমার হাতে কিছু দিলাম। কিন্তু হিন্দুদের কাছে দান, যদিও দান, কিন্তু পরম্পরাগত ভাবে এটা আমাদের কাছে পূজা, একটা যজ্ঞ। যাকে আমি দান করলাম, তিনি আমার উপরে, তাঁর চরণে আমি অর্পণ করলাম। খ্রীশ্চানদের চ্যারিটি আর হিন্দুদের দান, এই দুটো মিলেমিশে কোথাও একটা এমন হয়ে গেছে যে, মন্দির আদিতে যখন আমরা যাচ্ছি, সেখানে গরীব কাঙালীদের দান করার সময় আমাদের মধ্যে কোথাও একটা সুপিরিয়র বোধ কাজ করে। এই জিনিসটাই ধীরে ধীরে পরে খ্রীশ্চানদের যে সমাজসেবার ধারণা, এটাই ব্রাহ্মসমাজ একটা reformএর যে আন্দোলন করছিলেন, তার মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল। ঠাকুর এবার এটাকে আটকে দিচ্ছেন।

আমি তখন স্কুলে পড়ি, মহারাজদের জানতাম, তাঁদের কার্যকলাপ দেখতাম, কিন্তু তখন থেকেই আমার মনে হত আমাকে দেশসেবা করতে হবে। তারপর সংসার ছেড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে চলে এলাম, তখনও আমার এটাই মনে হত – দেশসেবা করতে হবে, সমাজসেবা করতে হবে। আমার দশ-পনের বছর লাগল বুঝতে যে, রামকৃষ্ণ মিশন দেশসেবা, সমাজসেবার জন্য নয়। তখন মনে হত যে, যতটুকু করা দরকার তার কিছুই করার সুযোগ পাচ্ছি না। এখন মনে হচ্ছে, রামকৃষ্ণ মিশন যা করছে ঢের বেশি করছে, এতটা করারও দরকার নেই। আগেকার মহারাজদেরও দেখেছি, আমাদের যে কনফারেন্সগুলো হত, সেখানে ওনারা আমাদের সাবধান করতেন, কাজে এত জড়িও না, আগ বাড়িয়ে এত কাজ করতে যেও না। কারণ সন্ন্যাসীদের কাজ ধর্মদান। অন্নদান, শিক্ষাদান, এগুলো সমাজের কাজ, এগুলো সরকারের কাজ।

আজকের কাগজে একটা খবর নজরে এলো, হায়দ্রাবাদে একটা নোংরা অঘটন ঘটেছে, সেটাকে নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে। তার সঙ্গে আজকেই কলকাতার খবর আছে, একটি ছেলে কটা টাকা নিয়ে অশান্তির জন্য তার বাবাকে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুন করেছে। তার সঙ্গে আরেকটা খবর আছে, চেন্নাইতে একটা বাচ্চা মেয়েকে ছ-জন মিলে নষ্ট করেছে। একটা জায়গায় অশান্তি লেগেছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে একই সাথে এতগুলো খবর আছে। আর এই ধরণের ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। কোনটা বেশি নৃশংস, কোনটা কম নৃশংস। একটা ছেলে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বাবাকে খুন করে দিয়েছে, এটাকে কি কম নৃশংস মনে হতে পারে? কেউ কিন্তু ভাবছে না। আপনি সোস্যাল মিডিয়াতে যান, ওখানে আগুন লেগে আছে। একবারও কি কেউ ভাবছে, কদিন ছেড়ে ছেড়ে প্রত্যেক দিন এই ধরণের ঘটনা কেন ঘটছে? ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত কারুর কোন চিন্তা নেই, মাথাব্যাথা নেই। মুল্যবোধ শূন্যে চলে গেছে। ধর্মদান এখন উড়ে গেছে, সব হয়ে গেছে এখন অন্নদান, অন্নদানে কি হবে। আর কেউ নিজের দায়ীত্ব পালন করছে না। আপনি রাস্থা দিয়ে যান, যদি দেখেন কোথাও অন্যায় অবিচার হচ্ছে, আপনার কি সেই দম আছে যে, দাঁড়িয়ে বলবেন – এই ধরণের বাজে কাজ করা থেকে বিরত হও? যদি বলেন, দেখবেন চারটে গুণ্ডা আপনাকে ঘিরে ফেলেছে। তখন আরও যে দশজন লোক আছে, তারা কি আপনার পাশে দাঁড়াবে? দাঁড়াবে না। তাহলে কে দায়ী? যারা শীলহানি করছে, ধর্ষণ করছে, এরা দায়ী নাকি আমাদের সমাজ আজকে দায়ী?

একবার আমি ফ্লাইটে একটা জায়গায় যাচ্ছিলাম। একটা ছেলে ওই রকম একটা কিছু বলল। আমি তাকে বললাম, কেন ভাই তুমি ও-রকম বলছ? ছেলেটি বলল – আমি আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছি, উপদেশ না। আমি মনে মনে বললাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার কাজই হল উপদেশ দেওয়া। কে দায়ী? আপনি তো বলছেন, ওকে আমাদের কাছে হ্যাণ্ডওভার কর, আমরা ওকে পুড়িয়ে দেব। পুড়িয়ে দিন না, কোন অসুবিধা নেই। তাই বলে কি এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, আগামীকাল আর এই ধরণের ঘটনা ঘটবে না? অবশ্যই ঘটবে, আবার হবে। আপনারা আটকাচ্ছেন না, বিষবৃক্ষ, সেটার দিকে কারুর দৃষ্টি নেই। আজকে যে এই গোলমালগুলো হচ্ছে এরজন কে দায়ী? কেউ দায়ীত্ব পালন করছে না। সমাজ দায়ী।

অনেক আগে ১৯৯৪-৯৫এ প্রথমবার চণ্ডীগড় গিয়েছিলাম, ছোট্ট শহর। আমার একজন পরিচিত তাঁর গাড়ি নিয়ে আমাকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। হঠাৎ একটা জায়গায় দেখছি, একটি মেয়ে একা একা যাচ্ছে। একটা মালবোঝাই ট্রাক ধীরে ধীরে মেয়েটির পিছন পিছন চলছে। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি দাঁড় করালেন, গাড়ি থেকে নামলেন। ট্রাক ড্রাইভারকে নামালেন। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মেয়েটির পিছনে পিছনে এত ধীরে ধীরে ট্রাক চালাচ্ছ কেন? আমার দেখে জিনিসটা এত ভাল লাগল, this is done। আর ওই জায়গাতে একটা underpassএর মত ছিল, ব্রীজের তলা দিয়ে যেতে হবে। আমারও তখন মনে হল, সত্যিই যদি ড্রাইভারটা বদমাইশি করতে চায়, আর জায়গাটা নিরিবিলি, হয়ত করতেও পারে। এটাকে বলে aggressive morality। Moral যে, তাকে aggressive হতে হবে,

আমি তোমাকে এই কাজ করতে দেব না। আজকে সমাজ এটা করছে না বলে, আজ আমাদের এই দুরবস্থা। আমাদের যে দায়ীত্ব সেটা পালন করছি না। ফলে কি হচ্ছে, দুষ্ট শক্তিগুলো, মদ খেয়ে ওই অশুভ শক্তি যখন আরও দুষ্ট হয়ে যায়, তারপর একটা অঘটন করে বসছে। তারপর আমরা বলছি ওই বদমাইশটাকে পুড়িয়ে দাও। পুড়িয়ে দিয়ে কি হবে? আবার হবে, রোগের শেকড় তো ভিতরে থেকে গেছে, আবার হবে।

আমরা যে বলছি, আমরা সমাজসেবা করব। কি সমাজসেবা করবেন? Glorifying poverty, দুজন গরীবলোক ডেকে দুটো কম্বল দিয়ে দিচ্ছে, দুটো খাইয়ে দিচ্ছে, ছবি তুলে খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা কত সমাজসেবী। যে অর্থে আমরা সমাজসেবা মনে করি, এটা কখন উদ্দেশ্য হতে পারে না। সমাজসেবা ঠিক ঠিক তখনই হয়, যেটা হিন্দুরা বলে, সমত্ব দৃষ্টি যখন আসে। ঈশোপনিষদে বলছেন, যখন জেনে যাবে আত্মাই শুধু আছেন, তখনই সে ঠিক ঠিক সেবায় নামে। যখন জানবে তুমিও যা, আমিও তাই; তুমি খুব কষ্টে আছ, তুমি বুঝতে পারছ না যে তুমি কষ্টে আছ, আমি এটা বুঝি।

সেবার একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কল্পনা করুন একটা শহর আছে, সেই শহরে রাজা আছে। একদিন রাজার ছেলে, রাজকুমার কোন ভাবে হারিয়ে গেছে। একজন লোক ছেলেটিকে দেখেই চিনতে পেরেছে, এই সেই হারানো রাজকুমার। এবার তাকে ধরে লোকটি রাজার কাছে নিয়ে গেল, আপনাদের রাজকুমার হারিয়ে গিয়েছিল, এই নিন আপনাদের হারানো রাজকুমারকে। এই হল যেখানে আপনি ঠিক ঠিক সেবা করছেন। এবার সেই শহরেরই একটি কাঙালী ছেলে লোকটিকে গিয়ে বলছে, আপনি তো একজনকে রাজকুমার বানিয়ে দিলেন, আমাকেও বানিয়ে দিন। সে কি কোনদিন কাঙালী ছেলেটিকে রাজা বা রাজকুমার বানাতে পারবে? কোন দিন পারবে না। চেষ্টা করেও কেউ কোন দিন পারবে না। যতক্ষণ এটা পরিষ্কার না হয় যে, যাকে আমি সেবা করছি আসলে সে রাজকুমার, আমি তাকে সেই রাজমহলে পৌঁছে দিতে চাইছি, যতক্ষণ এই বোধ না আসে ততক্ষণ সেবা হবে না। যখন আপনি সেবা করছেন, অন্নদান করছেন, শিক্ষাদান, প্রাণদান এগুলো যখন করছেন; তখন এই বোধটা যেন পরিষ্কার থাকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান, আমি সাহায্য করছি যাতে সে ঈশ্বরে মিলে যেতে পারে। আপনি তো নিজেই জানেন না যে, আপনি ঈশ্বরের সন্তান, আপনি কাকে নিয়ে যাবেন!

সমাজসেবাই যদি করতে হয়, সমাজসেবা করাই যদি আদর্শ হয়, তাহলে আমি চাইব সমাজে সব সময়ে যেন গরীব, দুঃখী লোক থাকে, কিছু কাঙালী, ভিখারী থাকে, যাতে আমি সমাজসেবা করার সুযোগ পাই। প্রথমের দিকে যখন স্বচ্ছ ভারত অভিযান শুরু করেছিল, মন্ত্রীরাও এই অভিযানে নামবেন, কিন্তু তা তো সম্ভব না, মন্ত্রীরা তো পরিষ্কার জায়গা ছেড়ে নোংরার মধ্যে যাবেন না। তখন ডাস্টবিনগুলি তুলে এনে উল্টে তাঁদের সামনে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। ছবি তুলে লোকেদের দেখানো হচ্ছে, এই দেখ মন্ত্রীরাও নোংরা পরিষ্কার করছে। এখন সমর্পণানন্দ সেবায় নামবে, হয় তাকে কাঙালী সাজিয়ে রাখতে হবে, তা নাহলে ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে হবে যে, হে ঠাকুর আমি প্রার্থনা করছি চারজন কাঙালী ভিখারী যেন সব সময় থাকে। কত বোকা বোকা কথা। আমরা যে কত ভাসা ভাসা, এটা আমাদের স্বভাবেই। আমরা উপরে উপরে ভাসি – glorifyaing poverty, glorifying disease।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর মুখে এই কথাটা আমি শুনেছিলাম। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর রাজাগোপাচারী প্রথম গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন। সেই সময় আমাদের একজন নামকরা মহারাজ দিল্লী এসেছিলেন। তিনি গেছেন প্রথম গভর্নর জেনারেলের সাথে দেখা করতে, সঙ্গে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীও ছিলেন। মহারাজ রজাগোপালচারীকে বলছেন, 'ভারত স্বাধীন হল, ভারতকে এবার আপনারা স্বর্ণযুগে নিয়ে যান'। রাজাগোপালাচারী সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বলছেন, 'স্বামীজী আপনি এটা কি কথা বলছেন। ভারতকে স্বাধীন আমরা আপনাদের জন্য করেছি, ভারতকে স্বাধীন করে আমরা আপনাদের হাতে তুলে দিলাম, এবার আপনার ভারতকে যেমন খুশি উপরের দিকে নিয়ে যান'। স্বামী

রঙ্গনাথানন্দজীর মুখে যখন এই ঘটনাটা শুনেছিলাম, আমার খুব অবাক লেগেছিল। সাধু-সন্ন্যাসীদের এটাই কাজ, আমরা হলাম গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল আর গাড়ির যে ইঞ্জিন, তেল এটা হল সমাজের যে শক্তি, সরকার; এটা আমাদের কাজ নয়।

স্বামীজী যখন সমাজের জন্য কাজ করেছিলেন, তখন তাঁর কাছে সুযোগ ছিল না, কারণ তখন দেশের রাজদণ্ড বিদেশীদের হাতে, স্বামীজী তাই বলেছিলেন, শুরু কর। আমাদের কাজ হল স্টিয়ারিং, আমরা পথ দেখাব কিভাবে সৎজীবন হয়, আমরা দেখাব ভাল কিভাবে হতে হয়, সৎশক্তি, সৎবুদ্ধিকে কিভাবে কাজে লাগানো হয়। গরীবের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া, বিধবার চোখের জল মোছা এগুলো সন্ন্যাসীদের কাজ না। ঠাকুর বলছেন, আগে ঈশ্বরলাভ কর, তিনিই শক্তি দেবেন। স্বামীজীকে দেখুন, তিনি যেভাবে আদর্শ নিয়ে এলেন, ভারত স্বাধীন হল, ভারত ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করেছে। কিছু অশুভ শক্তি আছে, যারা টেনে পিছনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভারতকে আটকানো মুশকিল। তখন একজন ভক্ত বলছেন –

একজন ভক্ত – যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সব কর্ম ত্যাগ করব? গীতায় দুটি কথা আছে – একটা কর্মত্যাগ, দ্বিতীয় কর্মফলত্যাগ। শুধু গীতাতেই যে আছে তা না, হিন্দুদের যে ধর্ম আদর্শ, এই দুটি ত্যাগের উপরেই চলে – কর্ম ত্যাগ ও কর্মফল ত্যাগ। প্রায়ই আমরা এই দুটিকে গুলিয়ে ফেলি। যেখানে কর্মফল ত্যাগের কথা বলছেন সেখানে কর্ম ত্যাগে চলে যায়, যেখানে কর্ম ত্যাগের কথা বলছেন সেখানে কর্মফলত্যাগে চলে যায়। হিন্দু ধর্মে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের কথা বলা হয়। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম হলে কর্মফল ত্যাগ আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে কর্ম ত্যাগ। ঠাকুর তখন বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ – না; কর্ম ত্যাগ করবে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নামগুণগান, নিত্যকর্ম – এ-সব করতে হবে।

নিত্যকর্মে অনেক কিছু করতে বলা হয়; তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হল—পঞ্চমহাযজ্ঞ। নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে প্রথম ঈশ্বরের ধ্যানধারণা, দ্বিতীয় দেবী-দেবতার পূজা অর্চনাদি, তৃতীয় পিতৃদের নামে দান-দক্ষিণাদি করা, চতুর্থ মানুষের সেবা। তার মানে বাড়িতে বাবা-মার যে সেবা করছেন, সেটাও পিতৃযজ্ঞের মধ্যে পড়ে। মানুষের সেবা, গরীবদের সেবা এগুলোও নিত্য করতে হয়, কিন্তু এটা উদ্দেশ্য না, করতে হয়। আর পঞ্চম হল, পশুপাখিদেরও সেবা করা। এগুলো সব নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে। জপধ্যান, নামগুণগান এগুলো প্রথম, এটাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হয়, ঈশ্বরচিন্তাও ওর মধ্যে পরে।

ব্রাহ্মভক্ত – সংসারের কর্ম? বিষয়কর্ম?

এটাও খ্রীশ্চানদের একটা সমস্যা। খ্রীশ্চানদের কাছে জগৎ একটা, ঈশ্বর আরেকটা – এটা ঈশ্বর, ওটা জগৎ। এটাকেই কার্টিশান ডিভাইড বলে, যেখানে mind একটা, matter একটা, spirit একটা, mind একটা। সেখান থেকে তখনকার দিনে কলকাতার লোকজনদের মনেও এই চিন্তা-ভাবনাগুলি এসে গিয়েছিল। স্বামীজী খুব জোরের সাথে বলে দিলেন – There is nothing secular in Hinduism। হিন্দুদের কাছে জাগতিক বলে কিছু নেই। আমরা বলি ঠিকই, কিন্তু লোকেদের মনে এটা ধারণা হয় না। হিন্দুদের কাছে কোন কাজ সাধারণ নয়, জাগতিক কাজ বলে কিছু হয় না। যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সব সময় আমরা নিয়ে চলেছি, এটাকেও হিন্দুরা যজ্ঞের সাথে জুড়ে রেখেছেন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলছেন, *অপানে জুহ্বতি প্রাণেহপানং তথাহপরে*, নিঃশ্বাস নিচ্ছি মানে, আহুতি দেওয়া হচ্ছে। হিন্দুদের কাছে কোন কর্ম নেই যেটা যজ্ঞ না, স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক সেটাও যজ্ঞ, সন্তানের লালন-পালন সেটাও যজ্ঞ, মারা যাচ্ছে সেটাও যজ্ঞ, দাহক্রিয়া হচ্ছে সেটাও যজ্ঞ; হিন্দুদের কাছে সাংসারিক বলে কোন কিছু হয় না। কিন্তু বেশির ভাগ লোক এত কথা জানে না, বোঝে না। তাই বলছেন, ঠিক আছে আপনি তো বললেন পূজা অর্চনা এগুলো করতে হয়, তাহলে বিষয়কর্ম?

হিন্দু ধর্মের পুরনো কথাগুলো দেখলে আমরা দেখি যে, সেখানে নিত্যকর্মের সাথে নৈমিত্তিক কর্মের কথাও বলা হয়েছে, এটাও করতে হয়। কিন্তু তারপরেই আসছে কাম্য কর্ম, কাম্য কর্মটা নিষেধ করছেন। বলেন যে, তুমি যদি ঈশ্বরের দিকে যেতে চাও, তাহলে কাম্য কর্ম করবে না। আমরা কাম্য কর্মের সাথে 'বিষয়' জিনিসটাকে লাগিয়ে দিই, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, যখন আমরা বিষয়ের কথা বলছি তখন আসলে আমরা সংসারের কথা বলছি।

সংসার মানেই ওটা নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে। সংসারের যত কর্ম, যেমন টাকা আয় করা; টাকা আয় করছি কেন? কারণ অর্জিত টাকার কিছুটা মনুষ্য যজ্ঞ, কিছুটা ভূত যজ্ঞ আর কিছুটা পিতৃযজ্ঞে যাবে। তার সঙ্গে দেবী-দেবতার পূজা আছে, অর্চনা আছে, টাকা ছাড়া এগুলো কি করে সম্পন্ন করা হবে! তার উপর বাড়ির লোকজন আছে তাদের জীবন-যাত্রা টাকা ছাড়া কি করে চলবে? গীতা কক্ষণ বলে না যে, তোমার মারুতি আছে তুমি রোলস্ রয়েসের দিকে মনে দিও না। গীতা বলবে, অবশ্যই মারুতি থেকে রোলস্ রয়েসের দিকে যাবে। কিন্তু আগামীকাল যদি রোলস্ রয়েস থেকে নেমে মারুতিতে আসতে হয়, তখন ভেঙে পড়ো না। চেষ্টা হল শক্তি বৃদ্ধি, জাগতিক সমৃদ্ধি। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে কেমন সব মিলেমেশে এলেমেলো হয়ে গেছে, লোকেরা বোঝে না; কর্ম ত্যাগ আর কর্মফল ত্যাগ দুটোকে মিশিয়ে ফেলে। কর্ম ত্যাগ হল, মারুতি আছে, মারুতিতেই থাক, পারলে হেঁটে যেও, আর না হলে স্কুটারে যেও। আর কর্মফল ত্যাগ হল, মারুতি থেকে রোলস্ রয়েস আবার সেখান থেকে নেমে যদি মারুতিতে আসতে হয়, সেখানেও মন খারাপ করার নেই।

ঠাকুর বলছেন – **হাঁ, তাও করবে, সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার**। বিষয়কর্ম অবশ্যই করবে। ঠাকুরের কথামৃত ভাসা ভাসা পড়ে সব ভক্তরা কর্ম করা বন্ধ করে দিয়েছে, আসলে এরা সব কুঁড়ের বাদশা। আমার পরিচিত একজন লঞ্চ সার্ভিস করছেন, বিজনেসম্যান। ওনার এই প্রথম বেঙ্গলের সাথে মোলাকাত। উনি মাথায় হাত দিয়ে বলছেন, কোথায় এসে পড়লাম! বলছে, আজকে বৃষ্টি পড়ছে কাজ করব না, খাওয়ার পর দু-ঘন্টা কাজ করব না, এখন উৎসবের প্রস্তুতি কাজ করব না, এখন উৎসব আছে কাজ করব না, উৎসবে খুব খাটতে হয়েছে এখন কাজ করব না। বলছেন, ওদের কাছে লম্বা লিস্ট আছে কখন কখন কাজ করবে না, কাজ কখন করবে সেটা আর বলে না। আগেকার দিনে, এই আশির দশকেও দেখতাম, মহালয়া হয়ে গেল, মানে মহালয়া থেকে কালীপূজা পর্যন্ত সব বন্ধ থাকবে। সেটাকে এখন ঠাকুরের কথামৃতের সাথে লাগিয়ে সুযোগ পেলেই কাজকর্ম করা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে, বলবে ঠাকুরও তো কাজ করতে সেই রকম কিছু বলেননি। ঠাকুর বলছেন, সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু করবে। এই কথা তাদের জন্য বলছেন, যারা আধ্যাত্মিক পথে অনুশীলন করছে। অর্থাৎ যারা পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছে, তাদেরকে এই কথা বলছেন। বাকিদের তো অবশ্যই কাজ করতে হবে।

কিন্তু কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ওই কর্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আচার্য শঙ্করও গীতাভাষ্যে এই কথা বলছেন – *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*। সব সময় বোধ রাখতে হবে, আমি কর্তা, আমার উপর পুরো জগৎ দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু যা কাজ করছি, সব কাজ আমি ঈশ্বরের দাস রূপে করছি। এটাই হল নিষ্কাম কর্ম, 'আমি' বোধটা যেন নাশ হয়।

আর বলবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয়কর্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখছি যে, বেশি কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। কারণ বিষয়কর্মে প্রচুর শক্তি লাগে, কিন্তু ফল খুব কম আসে। সাত ঘন্টা, আট ঘন্টা কাজ; দেড় থেকে দু-ঘন্টা যাওয়াতে, দেড়-দু-ঘন্টা আসাতে লাগে, বারো ঘন্টা এখানেই চলে গেল। এরপর খাওয়া-দাওয়া, ঘুমনো, কখন জপধ্যান করবে? কখন ঈশ্বরের চিন্তন করবে?

মনে করছি, নিষ্কামকর্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশি করতে গিয়ে লোকমান্য হতে ইচ্ছা হয়ে পড়ে। কর্মযোগের এগুলো বিরাট সমস্যা। যখনই দান-টান করছেন, লোকেরা আপনার জয়ধ্বণি দিচ্ছে। আপনার যে জয় দিচ্ছে, এটা এত intoxicating যে, মদ খেলে মানুষের মাথা যত বিগড়ায়, তার থেকে অনেক বেশি মাথা খারাপ হয় নিজের জয়জয়কার শুনলে। নেতাদের এই সমস্যাটা বেশি হয়, নিজের জয়জয়কার এত শুনছে যে, যখন ক্ষমতা চলে যায় তখন আর জয়জয়কার শোনে না, তাতে মাথাটা বিগড়ে যায়। সেইজন্য সব সময় লেগে থাকে, যে করেই হোক আমাকে ক্ষমতায় থাকতে হবে। ক্ষমতায় থেকে সবাই টাকা লুট করে না, সবাই পারে না করতে। কিন্তু যারা অত্যন্ত সৎ রাজনৈতিক নেতা, তাঁরাও নিজের জয় অবশ্যই শুনতে ভালবাসে।

অনেক আগে মফঃস্বলের একটা কলেজের অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম, খুব রিমোট জায়গা, সেখানে ওরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী দেখেনি। আমার সঙ্গে একজন ভাইস-চ্যান্সলার ছিলেন। ওটা ছিল একটা ডিস্ট্রিক্ট কলেজ, কিন্তু কলেজের ইতিহাসে কোন দিন কোন ভাইস-চ্যান্সলার আসেননি। তিনি গেছেন, কারণ আমি গেছি বলে। অনুষ্ঠানটা পুরো টাউনের জন্য একটা বিরাট উৎসব হয়ে গেল, এই প্রথম ভাইস-চ্যান্সলার আসছেন কিনা। প্রবেশের সময় লোকেরা ফুল ছুড়ছে, আমার নামেও বলছে, 'স্বামী সমর্পণানন্দ স্বাগতম'। আমারও শুনে সত্যি খুব ভাল লাগছিল, নিজের নামে জয়ধ্বণি হচ্ছে, এর থেকে ভাল আর কিসে লাগবে। ভাগ্যিস জীবনে দ্বিতীয়বার শোনার সুযোগ আর পাইনি। মানুষ এটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। দান করতে গিয়ে যে ওই জয় দিচ্ছে, কিছুক্ষণ শুনতে নিজেরই ভাল লাগবে। তারপর দেখবেন, ওই জয় শুনতে শুনতে এমন হয়ে যায় যে, ওর থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না, সেটাকে ধরে রাখার জন্য এবার সে যা খুশি করবে।

শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বললাম, সম্মুখে যে পড়ল, না করলে নয়, সেটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। আমার দায়ীত্ব তাই করছি, এর বেশি না। ইচ্ছে করে বেশি কাজে জড়ানো ভাল নয় – ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। ভগবান গীতায় বলছেন, *মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ*, তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না। তার মানে, নূতন কর্মে তুমি জড়াবে না, যতটুকু দায়ীত্ব আছে, সেটুকুই পালন কর, তার বেশি করতে যেও না।

কালীঘাটে দানই করতে লাগল; কালীদর্শন আর হলো না। আগে জো-সো করে, ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হয়, তারপর দান যত কর আর না কর। ইচ্ছা হয় খুব কর। এই যে, সঙ্কল্পসিদ্ধি, একটা জায়গায় গেছি, কেন সেখানে গেছি ভুলে যাই। সঙ্কল্প, যেটার জন্য সেখানে গেছেন, আগে সেটা করুন। আজকে বিয়ে করে কালকে ডিভোর্স করছে। 'বিয়েটা করলে কেন'? 'একজনের সঙ্গে জীবন চালাবো'। 'সেখানেই তুমি স্থির থাক'। বিয়ে করে তারপর বলবে, আমাকে দহেজ দিল না, আমাকে মানছে না, এটা করল না, সেটা করল না। নানা রকমের জিনিস এসে যায়, ভুলে যায় কিসের জন্য তুমি এসেছ, উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে যায়।

ঈশ্বরলাভের জন্যই কর্ম। এই যে কথাটা ঠাকুর বললেন, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুরা চারটে যে আদর্শ দিয়েছেন – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; তার মধ্যে অর্থ, যেটা দিয়ে তার যে শারীরিক সীমাবদ্ধতা, সেটাকে ছাড়িয়ে যায়। শারীরিক যে প্রয়োজন থাকে সেটা থেকে সে অর্থ দিয়ে মুক্তি পায়। আর কাম দ্বারা মনের যে ভাব, ইমোশান, এগুলো থেকে সে মুক্তি পায়। ধর্ম দিয়ে অশুভ যোনি থেকে মুক্তি পায়। মোক্ষ মানে, সমস্ত রকম শারীরিক, মানসিক, লৌকিক, জন্ম-মৃত্যুর চক্রের বন্ধন থেকে মুক্তি। যত কর্ম করা হয়, সমস্ত কর্মই এই চারটে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে বাঁধা। সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য শেষমেশ আপনাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। মুক্তি যা, ঈশ্বরদর্শনও তাই। আমেরিকাতে অনেক সময় দেখা যায়, বাবা খাটছে যাতে ছেলের জীবন ভাল হয়, মাঝখান থেকে ছেলেকে সময় দিতে পারছে না। পরে

ছেলে বলে, বাবা আমার তো টাকার দরকার ছিল না, দরকার ছিল তোমার সঙ্গ পাওয়ার, সেটাই তুমি দিলে না। তোমার টাকা নিয়ে আমি কি করব। সন্তানের জন্ম হয়েছে, সন্তান চায় বাবা-মা সঙ্গে থাকবে।

আমেরিকার একজন নামকরা চিত্রাভিনেতা লিখেছিলেন – ওনার বাড়িতে খুব অশান্তি ছিল। কিভাবে কিভাবে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতে এসে, তিনি কিভাবে একটা হাসপাতালে গেছেন। দেখছেন, একটা বাচ্চা খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের বিছানায় পড়ে আছে আর তার বাবা-মা দুজনেই পাশে বসে আছে। সবাই গ্রামের লোক। চব্বিশ ঘন্টা বসে আছে। ছেলে হয়ত একটা বোকা বোকা কথা বলল, সেটা শুনে বাবা-মা হাসছে। ছেলেটার মন খারাপ করল, বাবা-মা চুপসে যাচ্ছে। তখন উনি বলছেন, আমার একটা শিক্ষা হল। আমরা মনে করি এটা ওর দরকার, আসলে সেটা তার দরকার নেই, তুমি পাশে থাক, আর কিছু লাগবে না। ও যখন হাসছে, তুমি হাস; ও যখন কাঁদছে, তুমি কাঁদ। আমাদের সবারই ভাব হল, আমি আমার মত তোমাকে ভালবাসব, নিতে হলে নাও, না হলে গেট আউট। ভদ্রলোকের জীবনটা পাল্টে গেল। দেশে ফিরে গেলেন, সমস্ত সম্পর্কটা তিনি পাল্টে ফেললেন। খুব সুন্দর লেখা, অনেক আগে পড়েছিলাম বলে পরিষ্কার মনে নেই। উদ্দেশ্যটা আগে পরিষ্কার করতে হবে, আমি কি চাইছি, কেন চাইছি। এরপর যাবতীয় যা কিছু হবে ওটাকে কেন্দ্র করে হবে, বাকি সব কিছু গৌণ।

ঠাকুর খুব নামকরা কথা বলছেন – **শম্ভুকে তাই বললুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করে দাও?** ঈশ্বরদর্শন হলে আপনি কি চাইবেন, সেটাই হল আপনার মনের তখনকার অবস্থা। বাচ্চা বয়সে মন্দিরে গিয়ে আমরা প্রার্থনা করতাম, ঠাকুর পরীক্ষায় যেন নম্বর বেশি পাই। তখন সত্যিই আমার কাছে ওটাই সবচেয়ে বেশি দামী। এখনও যদি খুব ঝামেলা-টামেলা হয়, ঠাকুরকে গিয়ে বলি, ঠাকুর রক্ষা কর। তার মানে ওটা আমার কাছে বেশি মূল্যবান। কিন্তু আরও গভীরে যখন যাবেন, মানসিক পরিপক্কতা যদি এসে থাকে, তখন যদি ঠাকুর এসে বলেন, 'কি চাও'? ঠিক ঠিক কি চাইবেন আপনি তখন? একটা সাময়িক সমস্যা হয়ত অবশ্যই আছে, বাড়িতে বাবা-মার শরীর অত্যন্ত খারাপ। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন, ঠাকুর বাবা-মাকে ভাল করে দাও। ঠিক আছে। কিন্তু সমস্ত রকম সাধনা করে আপনি সিদ্ধি পেয়েছেন, ঠাকুর এসে বলছেন, 'কি চাও'? এবার কি চাইবেন ঠাকুরের কাছে? এটাকে আগে ভাবতে হয়, ভেবে আপনার জীবনের সব কিছু এবার সেটাকে কেন্দ্র করে ঘুরবে। ঠাকুর বলছেন – **ভক্ত কখনও তা বলে না বরং বলবে, 'ঠাকুর তোমার পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখ, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও'**। শুদ্ধাভক্তি – ওই ভক্তিতে আর কোন কিছু চাহিদা নেই। এরপর ঠাকুর বাকি সমস্থ পথকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিচ্ছেন।

কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে-কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশি কর্ম চলে না। জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগীর হয়ে যায়। মঠে আমরা বড় মহারাজদেরও দেখেছি, কেউ কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি করলে বলেন, ঠাকুর বলে গেছেন এই যুগে কবিরাজী চলে না। বলছেন, **বেশি দেরি সয় না। এখন ডি গুপ্ত**! এটা আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে খুব নামকরা একটা কথা। আগেকার দিনে একটা ফিভার মিকশ্চার হত, তখন ফিভার মিকশ্চার খুব পপুলার ছিল। ফিভার মিকশ্চার মূলতঃ কম্বিনেশান অফ মেডিসিনস, দুটো-তিনটে ওষুধ মিলিয়ে দিয়ে একটা মিকশ্চার তৈরী করা হত, খাওয়ার পর রোগী সঙ্গে সঙ্গে মনে করত ঠিক হয়ে গেছে। কবিরাজী হলে প্রচুর সময় লাগবে সারতে, আবার নাও সারতে পারে।

কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম। (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরিনাম কর, মায়ের নামগুণগান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটি বেশ। যদিও এখন এই কথা বলছেন, আবার আমরা আগে দেখলাম, বলছেন, এ-সব ধর্ম

আসবে যাবে, ঋষিদের দেওয়া সনাতন ধর্মই থাকবে। ঠাকুর কাউকে ছোট করতেন না। কিছু তো করছে। কিছু না করার থেকে কিছু করা অনেক ভাল।

বেদান্তবাদীদের মতো তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বল না। এর আগে আমরা কয়েকবার বলেছি – এই দুটি ভাব, সবটাই তাঁর লীলা, সবটাই তাঁর ইচ্ছা বলে মনে করে এগিয়ে যেতে হয়। আর তা নাহলে সব কিছুকে অনিত্য বলে ছেড়ে দিতে হয়। ভক্তিমার্গ সব কিছুকে নেয়, জ্ঞানমার্গ সংসারকে ছেড়ে দেয়। **ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত**। ঠাকুর বলতে চাইছেন, তোমাদের যদিও ব্রাহ্মসমাজ, কিন্তু বেদান্তের মত ওই ভাব তোমাদের নয়। **তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি বল, এও বশ। তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে অবশ্য পাবে**।

এই ভাবগুলিকে নিয়ে অনেকবার বলেছেন। ঘুরে ঘুরে ঠাকুর এটা সেটা হয়েও, শেষে নিয়ে আসছেন – ঈশ্বরের দিকে মন দাও, এটাই সারকথা, বাকি কোন কিছুরই দাম নেই। এরপর দশম পরিচ্ছেদে গিয়ে এই পর্বটা শেষ করছেন।

দশম পরিচ্ছেদ
সুরেন্দ্রের বাড়ি নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে

স্টীমবোট যেখানে ফিরে আসার কথা সেখানে ফিরে এসেছে। সবাই বোট থেকে নেমে এসেছেন। ঠাকুর ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসেছেন, কেশব সেন এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে দিল। এখন গাড়ি চলতে শুরু হয়েছে, হঠাৎ ঠাকুরের জলতৃষ্ণা পেয়ে গেছে। ঠাকুর অনেক সময় মনটাকে বাহ্য জগতে নামিয়ে রাখার জন্য জল খাব, সন্দেশ খাব, এইসব কথা বলতেন। যাই হোক ইণ্ডিয়া ক্লাবের কাছে গাড়ি থামিয়ে ঠাকুরকে জল দেওয়া হল। জল দেওয়া হলে ঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করছেন, গ্লাশটি ধোয়া তো?

এবার ঠাকুর সিমুলিয়া স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়িতে এলেন। ঠাকুর তাঁকে সুরেন্দ্র বলে ডাকতেন। এই দৃশ্যটা খুব মজার, খুব মিষ্টি লাগে। বলা হল, সুরেন্দ্র বাড়িতে নেই। সুরেন্দ্র তাঁদের নূতন বাগানে গিয়েছেন। বাড়ির লোকরা দরজা খুলে দিলেন, সবাই ঘরে এসে বসলেন। এখন সমস্যা হল দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার গাড়ি ভাড়া দেওয়া নিয়ে। কারণ ওনারা কলকাতায় নেমেছেন, এখান থেকে দক্ষিণেশ্বর যেতে হবে, গাড়ি ভাড়া প্রায় তিন টাকা লাগবে। গাড়ি ভাড়া এখন কে দেবেন? মজা লাগে ভেবে, অবতার, যাঁর সেবা করেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; সেই অবতার এখন তিনটে টাকার জন্য একজনের বাড়িতে বসে আছেন।

ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিলেন, ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না। ওরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে। এই দৃশ্যটা খুবই interesting। ঠাকুরের যে কথাগুলি আধ্যাত্মিক সত্যের উপর আধারিত, ঠাকুরের অনুভূতির যে কথাগুলো আছে, সেগুলো অন্যান্য শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। কিন্তু এই কথাগুলো, অবতার যখন নরদেহে থাকেন, তখন তাঁর ব্যবহারটা কি রকম হয় – অবতারের ব্যবহারের এত প্রাঞ্জল বর্ণনা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। দুটো টাকা কেউ না দিলে দেবে কে, ওনার কাছে তো নেই? ফিরবেন কি করে? ওনার কোন লজ্জাটজ্জা নেই, উনি পরিষ্কার বলছেন, বাড়ির মেয়েরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা কোথায় যায় আসে। অথচ এখানে বর্ণনা নেই শেষ পর্যন্ত টাকাটা তিনি পেলেন কিনা। মাস্টারমশাই কি করে ভুলে গেলেন জানি না, টাকাটা দিল কিনা জানা নেই।

মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন – **নরেন্দ্র পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন**। ঠাকুর ঘরের মধ্যে বসে সহাস্যে গল্প করছেন। এমন সময় নরেন্দ্র এসে হাজির হলেন। বলছেন – **তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল**। এতক্ষণ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ছিলেন। সেটা এক রকম।

ঠাকুর এখন নরেন্দ্রের সঙ্গে আছেন, নিজের জাত, আপনজন। যদিও ঠাকুর কেশবের অসুখ হওয়াতে মায়ের কাছে ডাব-চিনি মেনে ছিলেন, কেশব না থাকলে কলকাতায় গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলবেন। ওটা আলাদা, কিন্তু নরেন্দ্রের ব্যাপারে পুরো জিনিসটাই আলাদা। একজন শিক্ষক, স্কুলে পড়ান, তাঁর দুটো ভাল ছাত্র আছে, খুব যত্ন নিয়ে পড়ান, খোঁজ-খবর রাখেন; কিন্তু নিজের সন্তান সব সময় নিজের সন্তান, পুরো জিনিসটাই আলাদা। নরেন্দ্র আর কেশব সেনের এই তফাৎ।

এরপর ঠাকুর জাহাজে কি কি হয়েছিল তার বর্ণনা করতে শুরু করলেন। কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজে করে বেড়াতে গেলাম। আর বলছেন, কেমন কেশব আর বিজয়কে বললাম জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। ঠাকুরের এই জিনিসটা ছিল, বলার পরে বলতেন, কেমন বললাম! এখানে মাষ্টারমশাইকেও বলছেন, কেমন গা? এই ভাবটা কেমন যেন সরল মনের অভিব্যক্তিকে ইঙ্গিত করছে। কথামৃত থাকার জন্য আজকে আমরা জানতে পারছি যে – এই ভাবগুলি যখন থাকে, এগুলো কোন unusual না, খুবই normal। অবতাররাও এই রকম করেন, অবতারদেরও ব্যবহার এই রকম হয়। মাস্টার আজ্ঞা হ্যাঁ বললেন। রাত হয়েছে। সুরেন্দ্র এখনও ফেরেননি। কি আর করবেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর চলে এলেন। নরেন্দ্র ও মাস্টার নিজের নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন। এখানেই এই প্রসঙ্গ শেষ।

কথামৃত - পঞ্চম পর্ব

সিঁথি ব্রাহ্মসমাজ-দর্শন ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তদিগের সহিত কথোপকথন

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উৎসবমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত-সম্ভাষণে

২৮শে অক্টোবর, ইং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, শনিবার, এই দিন ঠাকুর সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করতে এসেছেন। সিঁথিতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্মসমাজের ষান্মাসিক উৎসব। দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর সেখানে এসেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে শুধু বর্ণনা। আমরা এর মধ্যে না গিয়ে সরাসরি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যেখানে ঠাকুর কথা বলছেন, সেখান থেকে আমরা আলোচনা শুরু করছি।

কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, যেমন বাইবেলে আমরা দেখছি, যীশু খ্রীষ্ট যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই কথা বলতে শুরু করে দিচ্ছেন। কুয়োর পারে গ্রামের মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, তিনি তাঁদের সামনেই কথা বলতে শুরু করে দিচ্ছেন। ভগবান বুদ্ধ ঠিক এভাবে উপদেশ দিতেন না। কিন্তু সবচেয়ে মজা লাগবে সক্রেটিসকে দেখলে, যদিও তিনি ধর্মের লোক নন; তবে আমরা যদি সিঁড়ির মত বানাই, তাহলে আজকে যাঁদের আমরা অবতার বলছি, তাঁদের ঠিক নিচেই সক্রেটিসের স্থান। চারিত্রিক গুণ দিয়ে বিচার করতে গেলে অবতার ও একজন মহাত্মার মধ্যে তফাৎ করা খুব মুশকিল। Ethical values আর spirituality, এই দুটোকে দিয়ে এনাদের আলাদা করা যায় না, আলাদা করা খুব মুশকিল। আমরা এই লাইনের লোক, আমাদের কাছে কোথাও একটা তফাৎ হয়ে যায়। Spiritualityতে যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে ঈশ্বর শেষ কথা, Ethicsএ যাঁরা আছে তাঁদের কাছে ethics শেষ কথা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, ethics কেন? ওনারা সেটা পরিভাষিত করে দেন ঠিকই, কিন্তু উত্তরগুলো ভাল না।

সক্রেটিসের অনেক ঘটনা আছে। উনি যেখানে সেখানে কথা বলতে শুরু করে দিতেন। এথেন্সে থাকতেন, সেখানে একটা পার্টিতে গেছেন। পার্টিতে সারা রাত সবাই পার্টি করছে, মদ খাচ্ছে, উনি একটার পর একটা কথা বলে যাচ্ছেন। আর এদিকে মদ খেয়ে খেয়ে একটার পর একটা সব উল্টে

পড়ে যাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ছে আর কি। সক্রেটিসের কাছে কোন ব্যাপারই না। শেষ যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে, উনি তার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন। তারপর নেশার চোটে সেও ঘুমিয়ে পড়ল। সক্রেটিস আর-এক পেয়ালা মদ খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে, বাজারও বসে গেছে। বাজার পৌঁছে গেলেন, এবার ওখানে কথা বলতে শুরু করলেন। সারারাত উনিও মদ খেয়েছেন, কোন ব্যাপারই না তাঁর কাছে, নিজের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ আছে। একজন মানুষের জ্ঞান-গাম্ভীর্য কোন স্তরে গেলে এই রকম হয়, যেখানে কোন কিছু তাঁকে ছুঁতে পারছে না। শোনার মত একটু আধার যদি পেয়ে যান, আর যদি বুঝে যান এই লোকটা আমার কথা শুনবে, শুরু হয়ে যাবে কথা বলা। ঠাকুরের সব বর্ণনা তো আমরা পাই না, মাস্টারমশাই যতটুকু রেকর্ড করছেন, কথামৃতে আমরা ঠাকুরের যা বর্ণনা পাই, তাতে এটাই মনে হয় যে, ঠাকুরও এই রকম ছিলেন। একটু শোনার মত যদি কেউ এসে যায়, যে শুনবে, বোঝা তো অনেক দূরের কথা, কিন্তু শুনবে, ঠাকুরের কথা বলাও শুরু হয়ে যাবে।

সহাস্যবদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, 'এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আননদ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর-একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারী খুশি হয়। হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে'।

ঠাকুরের এটা ভাব, সব সময় যে একই রকম হবে তা না। অনেক সাহিত্যের লোক, বা অন্যান্য জগতেরও কিছু কিছু লোক এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন, অনেক সময় ওনারা চুপচাপ থাকেন, তাতেই যেন একটা সম্ভাষণ হয়ে যায়। কিন্তু আবার আছে, যেখানে পরিচিতি আছে, একই ভাবের, একই বিষয়ের লোকজন আছে, সেখানে ওনারা কথা বলতে শুরু করে দেন। আমরা যেখানে ভালবাসা দেখি, যেখানে আপনজন মনে করি, সেখানে extension of personalityর কোথাও যেন একটা meeting ground আসে। অনেক সময়ে দেখা যায়, যেখানে একটা সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, তখন ওরা বলে, আমাদের মধ্যে কোন কমন ছিল না। এখানে ঠাকুর আর শিবনাথ বা ঠাকুর আর ব্রাহ্মভক্ত এদের মধ্যে কিছু কমন নেই। কিন্তু কোথাও ধর্মকে নিয়ে একটা কমন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার থেকেও যেটা বেশি, ঠাকুর আচার্য, উনি চাইছেন কোথাও যদি একটু আধার পাই, সেখানে আমি ঢেলে দিই। যদিও যাকে ঢালছেন, সে নিতে পারবে না। সেইজন্য দেখা যায়, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের বাইরে যাঁরা আছেন, বইয়ে নাম আছে বলে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। বাকিদের নাম মাঝে মাঝে আসে, তাঁদের তো কিছুই পাওয়া যায় না। ঠাকুর কিন্তু ঢেলে যাচ্ছেন, কিছু যদি ধারণা হয়। তবে এই জিনিসগুলোর ধারণা হতে পারে না।

মেরি লুই বার্কের বইতে স্বামীজীর জীবনের অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়, যা স্বামীজীর মূল জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যাবে না। তার মধ্যে একটা ঘটনা আছে, স্বামীজী জাহাজে করে যাচ্ছেন। জাহাজে সাত-আট বছরের একটি আমেরিকান বাচ্চার সাথে স্বামীজী বন্ধুত্ব হয়েছে। স্বামীজী বাচ্চাটিকে বলছেন, Come boy, I will teach you how to face death। বাচ্চাটি কোন আগ্রহ দেখাল না। অনেক পরে সেই ভদ্রলোক বড় হয়ে একটা স্মৃতিকথায় লিখছেন – তখন আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে যদি স্বামীজীর সঙ্গে এখন দেখা হত, আমি বলতাম আমাকে শিখিয়ে দিন কি করে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াতে হয়। এনারা আচার্য, আধার দেখলেই চিনে ফেলেন। যেখানেই দেখেন এর মধ্যে একটু সম্ভাবনা আছে, সেখানে একটু ঢেলে দেন। সে নিল কি নিল না তার ব্যাপার, নিতে পারলে নিজেই এই সংসার থেকে ছিটকে গিয়ে কোথায় উঠে যাবে কল্পনাই করা যায় না।

এই যে ঠাকুর বলছেন, একজন গাঁজাখোর আরকেজন গাঁজাখোরকে দেখলে খুশি হয়, এই জিনিসটা হয় না। শুধু ঠাকুর আর শিবনাথের না, যদুনাথ মল্লিকের সাথে ঠাকুরের পরিচিতি ছিল, প্রথমের দিকে লোকেরা মনে করত দুজন একই রকম। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছে, আসলে জিনিসটা তা না। এটা হল, পুকুরের জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, মাছেরা মনে করছে আমাদেরই মত

একজন। ঠাকুর এখানে বলতে চাইছেন, একই রকম যেখানে হয় সেখানে খুব আনন্দ হয়। চার-পাঁচ বছরের দুটোবাচ্চা যদি থাকে – একটা বাঙালী বাচ্চা, অন্যটি তামিল বাচ্চা। যদি এই ধরণের দুটো বাচ্চার ট্রেনে দেখা হয়ে যায়, সারাটা রাস্থা তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে যাবে। এর কথা ও বোঝে না, ওর কথা এ বোঝে না, কিন্তু এক নাগাড়ে কথা বলে যেতে থাকবে। ওরা বুঝতে পারে, আমরা এক জাতের।

আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। ঠাকুর 'হাবাতে লোক' এই কথাটা খুব বলতেন। এটা আমরা ভাল বুঝতে পারব, আমার জানা নেই এখন এই ধরণের ঘটনা কতটা হয় – মায়েরা কোন পার্টিতে গেছেন, বা কারুর সাথে দেখা করতে গেছেন, সঙ্গে বাচ্চাও গেছে। কিন্তু বাচ্চার ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেই ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। মা নিয়ে গেছে, সেও গেছে। কিছুক্ষণ পরে শুরু হয়ে যায় – বাড়ি চল, এবার এখান থেকে চল। বার বার বলতে বলতে মা বিরক্ত হয়ে যায়। হাবাতে বলতে এটাই, ওই দলের নয়। ওর ওই প্রস্তুতিটা এখনও হয়নি।

বলছেন, **তাদের ভারী বিষয়বুদ্ধি। ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয়তো আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় কথা বলছে। এদিকে এরা আর বসে থাকতে পারে না, ছটফট করছে**। আমাদের এখানে ২০০৬ সাল থেকে ক্লাশ চলছে। প্রথমের দিকে যাঁরা ভর্তি হয়েছিলেন, ক্লাশে অনেকে বাড়ির কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। পাঁচ-সাত মিনিট পর থেকেই ছটফট করতে শুরু করে দিতেন। এখন আমরা তাই বন্ধ করে দিয়েছি, কাউকে আনা যাবে না। নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত যদি ক্লাশ করতে চান, তাহলে আসুন, না হলে আসার কোন দরকার নেই। উচ্চচিন্তনের কথা আমাদের মস্তিষ্ক নিতে পারে না। দেখবেন, শিরদাঁড়া সোজা না থাকলে মস্তিষ্কের উচ্চতত্ত্ব নেওয়ার কথা ছেড়ে দিন, সাধারণ জিনিস নেওয়ারই শক্তি থাকবে না। আর ভিতরের শিরদাঁড়া সোজা না থাকলে, আর্ট, কালচার, ধর্ম, এই জিনিসগুলি নেওয়া যায় না। উচ্চচিন্তনের কথা মানুষ নিতে পারে না, মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হয়ে যায়।

বারবার কানে কানে ফিসফিস করে বলছে, 'কখন যাবে – কখন যাবে'। তারা হয়তো বললে, 'দাঁড়াও না হে, আর-একটু পরে যাব'। তখন এরা বিরক্ত হয়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি'।(সকলের হাস্য)

এমনিতে এই ঘটনাটা আমাদের খুব সাধারণ বলে মনে হবে। যে কোন ধর্মগ্রন্থে দৈনন্দিন জীবনে কি হয়, এই ধরণের বর্ণনা আমরা পাই না। তার কারণ হল, বেশির ভাগ লেখা শিষ্যরা লিখেছেন বা অনেক সংশোধন হয়ে এসেছে। সেখানে এনাদের কাছে হল, ধর্মের জন্য যতটুকু দরকার, ঠিক অতটুকু রেখে বাকি জিনিসগুলিকে কাটছাট করে দেওয়া হয়। যার ফলে আমরা সব কিছু পরিষ্কার পাই না। অথচ বাল্মীকি রামায়ণে দেখুন, সেখানে কথায় কথায় শ্রীরামচন্দ্রের চোখে জল, সত্যিকারের জল, বাকিদের যা যা ইমোশানস দেখি, সব সত্যিকারের ইমোশানস্। কিন্তু পরবর্তি কালে যত রামায়ণ এসেছে, সেখানে রামের চোখে জল নেই, কোথাও কোন ইমোশানস নেই, কারণ ওটা তারা নিতে পারে না, ভক্ত কিনা। সব কিছুকে লীলা, নাটক এইসব বলে পাশ কাটিয়ে দেবে। ফলে যেটা হয়, তা হল, একটু পরেই মনে হতে শুরু করে, শ্রীরামচন্দ্র ভাল লোক ছিলেন, আমরা তাঁর আরাধনা করব, পূজা করব; কিন্তু রামচন্দ্রের মত আমরা কোনদিন হতে পারব না।

রামায়ণ আর মহাভারতের একটা সাধারণ জিনিস হল, রামায়ণের প্রত্যেকটি চরিত্র হল আদর্শ পাত্র। রাম বলুন, লক্ষ্মণ বলুন, ভরত, হনুমান, শত্রুঘ্ন বলুন, এনাদের পূজা করা যায়, ভালবাসাটা আসে না। ভালবাসা হয় সেখানেই, যেখানে দেখছে, সে আমারই মত একজন, আমিও ওর মত হতে পারি। রামায়ণে এটা সম্ভব না। মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্রকে মনে হবে, আমারই মতন। কৃষ্ণ! উনি তো আমারই মত, আমার থেকে না হয় বুদ্ধিটা একটু বেশি। যুধিষ্ঠির! খুব ভাল লোক, কত বড় একজন সত্যবাদী; কিন্তু জুয়া খেলতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকেই বাজী ধরছেন। জুয়া খেলা আমারও পছন্দের খেলা,

কিন্তু অতটা আমি যাব না। জুয়াতে স্ত্রীকে বাজে ধরে যে লোক, সে যদি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারে তাহলে আমি কেন যেতে পারব না? কারণ মহাভারতের চরিত্রগুলিতে মানব-ভাব যেমনটা, সেটাকে তেমনটা ছেড়ে দিয়েছেন। এত বিস্তারে না, কিন্তু ইমোশানসগুলিকে রেখে দিয়েছেন, বা সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে ওটাকে আরও উপরে তুলে দিয়েছেন। সেইজন্য মহাভারত খুব realistic গ্রন্থ।

অন্য দিকে রামায়ণ খুব idealisti গ্রন্থ, রামায়ণের পূজা করা যায়। জীবনে নামানোর জন্য লোকেরা উপদেশ দেবে – মহাবীর হনুমানের মত ভক্ত হও, ঠাকুরও বলছেন। কিন্তু মহাভারতের জন্য কাউকে উপদেশ দিতে হয় না। শুধু একটা তুলনা তুলে ধরে বলবে – মনে আছে এই রকম পরিস্থিতিতে দুর্যোধনের কি হয়েছিল, তোমারও তাই হবে। কথামৃত বাল্মীকি রামায়ণের মত খুব realistic। যদিও পরে পরে রামায়ণগুলো পাল্টে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে ঠাকুরের উপর যে রচনাগুলো হবে, ওগুলোও দেখবেন ধীরে ধীরে idealistic হয়ে যাবে। তখন মনে হবে, ঠাকুর সব সময় মায়ের নাম নিচ্ছেন, সমাধিতে থাকছেন, ধর্মের উপদেশ দিচ্ছেন। এখনই হবে না, চারশ পাঁচশ বছর পরে এই রকম হতে শুরু হবে। তবে কথামৃত আছে বলে পুরোপুরি এভাবে চিত্রণ করতে পারবে না।

এই যে বলছেন, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি, আসলে ঈশ্বরীয় কথা লোকেরা নিতে পারে না। পরে পরে ঠাকুর বলবেন, নোংরা পোকাকে ভাতের হাড়িতে রাখলে মরে যাবে। এই যে আমাদের এখানে শাস্ত্রের ক্লাশ হচ্ছে, কোথায় বেলুড় মঠের ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ হচ্ছে, দূর দূর থেকে কজনই বা আর আসবে। কিন্তু এখন ইউটিউব হয়ে গেছে, বাড়িতে বসেই এই ক্লাশগুলো শুনতে পারে। আপনি আপনার পরিচিতদের শুনতে বলুন, তখন বলবে, 'ও জানা আছে, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরকে ভক্তি করতে হবে, ওই তো একই কথা বলবে'। মানুষ ঈশ্বরীয় কথা, শাস্ত্রের কথা নিতে পারে না।

সংসারী লোকেদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখন শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌরনিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন–'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল'। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও বললে সংসারী লোকেরা শুনবে না, সম্ভবই না তার পক্ষে। 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল' শুনতে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়। পরে ঠাকুর বলছেন – মাগুর মাছের ঝোল মানে চোখের জল, যুবতী মেয়ে মানে পৃথিবী, হরিনামে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে।

নিতাই কোনরকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। লোকেদের ধর্মের আচরণ, ঈশ্বরের নামগুণগান এগুলো করিয়ে নিতে হয়। আমাদের যে বেদ, পরের দিকে হিন্দুরাই এই বেদের নিন্দা করতে শুরু করলেন। নিন্দুকরা সেখানে বলছেন, বেদে নানা রকমের হিংসা রয়েছে আর অর্থবাদ দিয়ে আকৃষ্ট করা হয়েছে। অর্থবাদ মানে স্তুতি; স্তুতির অর্থ হয়, তুমি এই যজ্ঞ কর, স্বর্গে যাবে। স্বর্গ তো আমরা দেখিনি, স্বর্গে কি করে যাব? আমাদের ঋষিদের উদ্দেশ্য ছিল, কোন ভাবে মানুষকে ধর্মপথে নিয়ে আসা। মানুষ সংসারকে একেবারে আঁকড়ে রেখেছে, সংসার থেকে মন সরাতে পারছে না বলে ছাড়তেও পারছে না, সেইজন্য তাকে আরেকটু প্রলোভন দিয়ে দিতে হবে। তুমি টাকা চাইছ? এই যজ্ঞ কর, তোমার প্রচুর টাকা হবে। এখন যজ্ঞ করতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তো সংসার থেকে তার মন সরে থাকল। খ্রীশ্চানদের মধ্যে দেখবেন প্রচুর পর্ব আছে, বিশেষ করে ক্যাথলিকদের একদিকে ওদের নিজস্ব পর্ব আছে, তারপর ওরা যেখানে যেখানে গেছে সেখানকার পর্বগুলিকে নিজেদের পর্বে যোগ করে দিয়েছে। ওদেরও ঠিক এভাবেই রয়েছে। কিন্তু আমরা যখন খ্রীশ্চানদের কথা ভাবি, তখন কয়েকটা পর্বই শুধু দেখি, খ্রীশমাস, থাঙ্কস গিভিং, এই ধরণের তিন-চারটে পর্ব। লোকেরা এগুলোতে বেশি থাকে না। হিন্দুদের পর্ব লেগেই আছে, আজকে ওর এই পর্ব, কাল তার এই পর্ব, লেগেই আছে।

এগুলো কেন? তিথিকে আধার করে যে উৎসবগুলো ঠিক করা আছে, এগুলো কেন? কোন এক ঋষি লোকেদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বলে দিলেন, এই সময় তোমরা এই এই করবে। দেখবেন,

ভাদ্র মাসকে খুব অশুভ মাস বলা হয়, আর চৈত্র মাসকে নিয়েও বলে যে এই মাসে কোথাও বেরোতে নেই, নূতন করে কোন কিছু শুরু করতে নেই। আমরা মনে করে আসছি যে, ভাদ্র ও চৈত্র দুটো মাস অশুভ। এবার দেখুন তো ভাদ্র মাস আর চৈত্র মাস কিসের জন্য হিন্দুদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র মাস? কারণ চৈত্র মাস হল শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের মাস, আর ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। এই দুটো মাস বেশি সাংসারিক কাজে, বিষয়কর্মে না জড়িয়ে ঈশ্বরের নাম কর। কিন্তু তার থেকেও বেশি হল ভাদ্র মাস মানেই বৃষ্টিপাত, বন্যা লেগেই থাকে, কোথাও যেতে গেলে প্রচুর ঝামেলায় পড়তে হয়। এসব ভেবে একটা কিছু বলে ভাদ্র মাসকে অশুভ মাস করে দিলেন।

এনাদের কাছে একটাই উদ্দেশ্য, কোন রকমে মানুষকে দিয়ে ঈশ্বরের নাম করিয়ে নেওয়া। ফলে দেখা যায় যে, খোল করতাল নিয়ে যারা হরিনাম সঙ্কীর্তন করে, তখন যারা শুনতে চায় না, তারাও এদের সঙ্গে হরিনামে নেমে পড়ে। আমাদের একজন মহারাজ, খুবই ভাল মহারাজ, এত ভাল মহারাজ যে কি বলব, প্রথম অবস্থায় ওনার অনেক সঙ্গ করেছিলাম। আমি এমনি মজা করে ওনাকে দিয়ে বলাতাম, অন্য মহারাজদের সামনেও বলাতাম, মহারাজ কি করে আপনি সন্ন্যাসী হলেন? উনি বলতেন, আশ্রমের কাছেই বাড়ি ছিল, সন্ধ্যেবেলায় আরতির ঠিক পরেই মঠে বাতাসা খেতে যেতাম। আরতির পরে বাতাসা দেয়, নকুলদানা দেয়, ওটার লোভে মঠে যেতাম। সেখান থেকে বড় হয়ে ভলেন্টিয়ার হয়ে গেলাম। তারপর দেখলাম কিছু একটা করতে হবে, ভাবতে ভাবতে সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম। কিন্তু উনি খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী। এগুলো উনি মজা করে বলতেন।

আমাদের ঋষি-মুনিরা এই জিনিসটাই করতে চাইতেন। বাচ্চারা যে পূজাতে যায়, ওদের দৃষ্টি শুধু প্রসাদের দিকে। ওই ট্রাডিশানে বড় হয়ে হয়ে যখন একটা জায়গায় পৌঁছাবে, যেখানে সে ধর্মের কথা নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে নেবে। বেলুড় মঠে সকালে যখন ঠাকুর মন্দিরে প্রণাম করতে যাই, তখন দেখি অনেক ভক্তরা এসেছেন, দেখে ভাল লাগে। তাঁদের কারুর সঙ্গে তিন-চার বছরের বাচ্চারাও আসে, সেই বাচ্চার হাত দিয়ে দশ টাকা হোক, পাঁচ টাকা হোক প্রণামী বাক্সে প্রণামী দেওয়াচ্ছেন। বাচ্চা তখন নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। এই করে করে যখন বড় হবে, তখন পরে হঠাৎ ওর মনটা খুলে যাবে। এ-সব কিছুর মূলে হল ভিতরে একটা শুভ সংস্কার তৈরী করা। আর যদি তার শুভকর্ম থাকে ওকে ধর্ম পথে টেনে নেবে। অনেকের দেখবেন শুভকর্ম আছে কিন্তু এই পথে নামতে পারছে না। প্রায়ই অনেককে বলতে শুনি, আমি তো জানতামই না যে এই জিনিসগুলি আছে। আমাদের আজ পর্যন্ত ইউটিউবে সাতশখানা ভিডিও আপলোড করা হয়ে গেছে। আমি মজা করে বলি, সবাই বলে হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে জানা যায় না, আমরা তো নলেজ ব্যাঙ্ক দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। আগামীকাল কেউ বলতে পারবে না যে, হিন্দু ধর্মের এই জিনিসটা উপলব্ধ নয়, একটু সার্চ করলেই সব পেয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা বয়স থেকে একটু টোপ খাইয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়, একটু প্রসাদ খাইয়ে কিংবা একটু গুরুত্ব দিয়ে, এরপর ধীরে ধীরে বড় হলে নিজেই এই পথ ধরে নেবে।

ঠাকুর এখানে এটাই বলছেন। তখন মহাপ্রভুর সময় মুসলমানদের সাংঘাতিক অত্যাচার, যার জন্য পুরো বাংলাদেশ মুসলমান হয়ে আলাদা হয়ে গেল। কল্পনা করুন, অন্য একটা ধর্ম এসে আপনাকে চারিদিক দিক থেকে ঘিরে শেষ করে দিচ্ছে। লোকেরা সেখানে প্রাণভয়ে কাঁপছে, তারা দেখছে আমাকে বাঁচতে হবে। সেখানে তাদের উপনিষদের তত্ত্ব, অহং ব্রহ্মাস্মি, তোমার মৃত্যু নেই, তোমার জন্ম নেই, এসব কথা বললে সে কি বুঝবে! এটাই বলবে – নিকুচি করেছে তোমার ধর্মে। সেখানে যদি বলেন, হরি বোল হরি বোল, তিনি দেখবেন – সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে একটা শক্তি চলে আসবে। জীবনে যদি কোন সঙ্কট থাকে তখন এগুলো বললে মানুষ একটা শক্তি পায়। মহাপ্রভুর যে ধর্ম, ঠিক এই ভাবে তিনি হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করলেন আর মানুষকে ধর্ম পথে নিয়ে গেলেন। যার জন্য পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং বাংলাতে আর অন্যান্য জায়গাতে গেলে বোঝা যায় মহাপ্রভুর প্রভাব

কিভাবে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেছে। হিন্দু ধর্মকে বাঁচানোটা এক রকম, কিন্তু তার থেকেও বেশি হল, মানুষের মনে ধর্মের প্রতি আস্থা জাগিয়ে দেওয়া।

ঠাকুর বলছেন, **চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখন না কখন এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ির কার্নিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেকদিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হল ও তার ফলও হল**।

পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কাছেও এই রকম আমি একটা ঘটনা দেখেছিলাম। একজনের দীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য অধ্যক্ষের কাছে আমার যাওয়ার দরকার হয়েছিল, তখন আমি ব্রহ্মচারী। কিন্তু মঠের দীক্ষার ব্যাপারে যে বিধি-বিধান আছে, তাতে তাকে দীক্ষা দেওয়া যাচ্ছিল না। মহারাজ আমাকে চিনতেন, আমি গিয়ে মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি হঠাৎ বলে দিলেন, আমি দীক্ষা দেব। রাজী হয়ে তিনি ঠিক এই কথা বলেছিলেন, 'ক্ষতি তো কিছু হবে না, ফল ঠিক হবে'। যাঁকে দীক্ষা দিলেন, বর্তমানে তিনি একজন বড় সন্ন্যাসী, অনেক উপরে উঠে গেছেন।

ঈশ্বরের নাম সূক্ষ্ম বীজের মত। এই নাম যখন কারুর কাছে গেল, তখন মনে হবে যেন অপাত্রে দেওয়া হল, কিংবা মনে হবে যে, এমন জায়গায় গেল কোন ফল হবে না। যাই ভাবুন, ফল কিন্তু দেবে, ঈশ্বরের নাম কিনা। মানুষের যে আসল অস্তিত্ব, এই অস্তিত্ব আত্মাকে নিয়ে, ঈশ্বরকে নিয়ে, সেইজন্য আজ হোক বা কাল হোক, ফল দেবেই। সেইজন্য বলা হয়, যাঁরা শাস্ত্রের এই ক্লাশগুলো শুনছেন, তাঁদের এটা দায়ীত্ব যারা এগুলো জানে না, তাদের সাথে একটু আলোচনা করা, এমনি শুধু বলা। এখন শুনে রাখল, তারপর হঠাৎ একদিন মনে পড়ল, আচ্ছা এই রকম কিছু কথা শুনেছিলাম, আচ্ছা একবার দেখি তো গিয়ে। সেইজন্য আপনি যা কিছু শুনছেন, যতটুকু বুঝলেন, লোকেদের এই জিনিসগুলো বলতে হয়। আমাদের অনেক সময় মনে হয়, আগ বাড়িয়ে কারুকে এগুলো বলাটা কি ঠিক? অপরে আপনার কথার কোন দাম দেবে না ঠিকই, কিন্তু এগুলো করতে হয়। এরপর ঠাকুর খুব নামকরা কিছু কথা বলছেন।

যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে; তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে।

যাঁরা এই ক্লাশগুলি অনেকদিন ধরে শুনছেন, যাঁরা শাস্ত্র জানেন; তাঁরা দেখে থাকবেন যে, বেদের কথাগুলি, উপনিষদের কথাগুলি যখন সাংখ্য দর্শন ও যোগ দর্শন ব্যাখ্যা করতে গেলেন, তখন ওনারা দেখলেন সৃষ্টি কিভাবে হয়। চৈতন্য থেকে জড়ের সৃষ্টি কিভাবে হয়, এটাকে ব্যাখ্যা করা খুব মুশকিল। তখন ওনারা একটা ধারণা নিয়ে এলেন, এখন আমরা 'ধারণা' বলছি, পরে অন্য শব্দ ব্যবহার করব; সেই চৈতন্যের উপর যেন একটা পর্দা এসে যায়। এই পর্দাকে বোঝাতে গিয়ে বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন। কেউ এটাকে প্রকৃতি বলেন, কেউ মায়া বলেন, কেউ শক্তি বলেন। এই জিনিসটা সব সময় তিনটে গুণের মধ্যে থাকে – সত্ত্ব, রজো ও তমো। প্রকৃতি বা শক্তির নামটাই হল ত্রিগুণাত্মিকা। সেখান থেকে সমস্ত সৃষ্টি এগোয়।

ফলে কি হয়, যে জিনিসটা দিয়ে তৈরী, সেই জিনিসটাই সব কিছুর মধ্যে varying proportionএ থাকবে। হিন্দুরা বলেন, পঞ্চভূত দিয়ে জগৎ তৈরী – আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটি। আমরা যে জল, মাটি, আকাশ দেখছি, এগুলো তা না, এগুলো হল এ্যটমের নাম। তার মানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যে এই পাঁচ তত্ত্বই থাকবে, varying proportionএ থাকবে, কিন্তু থাকতে বাধ্য। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটি, এই পাঁচটি তত্ত্ব আবার ওই তিনটে গুণ – সত্ত্ব,

রজো ও তমো দিয়ে তৈরী। এই গুণগুলিকে আবার বলা হয় – sub-atomic, এটা ফিজিক্সের এ্যটম না, একেবারেই আলাদা।

অন্য দিকে যোগশাস্ত্রে আমরা দেখছি, যখন একজন সাধক ধ্যান করেন, ধ্যান করার সময় যেমন যেমন তাঁর মন একগ্র হতে থাকে, তেমন তেমন তাঁর ধ্যেয় বস্তুর আবরণগুলি সরতে থাকে। শেষে গিয়ে দেখছেন – সেই তিনটে গুণই আছে। এই তিনটে গুণকে ওনারা বিভিন্ন ভাবে দেখতে পান। এই তিনটে গুণকে অতিক্রম করলে তবেই ঈশ্বরদর্শন হবে। কারণ এই তিনটে গুণ হল সেই পর্দা, যেটার পারে যাওয়া যায় না। ফলে যাবতীয় যা কিছু ব্রহ্মাণ্ডে আছে; বস্তু, মন, মানুষের স্বভাব, যা কিছু আছে সবের মধ্যে সত্ত্ব, রজো, তমো থাকবেই। মনকে কেন এর মধ্যে রাখা হয়েছে? কারণ মনও প্রকৃতি থেকে জন্ম নিচ্ছে। প্রকৃতি থেকে যে কোন জিনিস জন্ম নিলে তার মধ্যে সত্ত্ব, রজো, তমো থাকবেই। গীতাতে ভগবান বলছেন, *নিস্ত্রৈগুণ্যঃ*, আত্মা তিনটে গুণের পারে। ঠাকুরও এই কথা অনেকবার বলবেন। তার মান, আত্মাতে এই তিনটে গুণের প্রভাব পড়ে না।

আমরা যখন স্বভাবের উপর আসি, তা সে মানুষের স্বভাব হোক, পশুর স্বভাব হোক বা বস্তুর স্বভাব হোক; এই স্বভাব জিনিসটাও তিনটে গুণের দ্বারা নির্মিত। তমোগুণ মানে, নিউটন বলছেন, inertia, পড়ে আছে তো পড়েই আছে, যখন থামার কথা তখন থামবে না। আর রজোগুণ হল inertia of motion, তমোগুণ হল inertia of rest। নিউটনের গতির যে সিদ্ধান্তগুলি আছে, তাতে প্রথমে এটাই বলা হয় – যে কোন বস্তু হল law of inertia, ওই যে পড়ে আছে, পড়েই থাকবে; যদি চলতে থাকে, চলতেই থাকবে যতক্ষণ আরেকটা ফোর্স না দেওয়া হয়। খুব সংক্ষেপে এটাই হল তমোগুণ আর রজোগুণ। সত্ত্বগুণ সব সময় ব্যালেন্সে থাকে।

স্বভাবে যখন আসে, তখন সেখানে তমোগুণ মানে, জিনিসগুলো ওর কাছে পরিষ্কার না; বস্তুর জ্ঞানগুলো পরিষ্কার থাকে না। তমোগুণের স্বভাবে নিদ্রা, আলস্য এই জিনিসগুলি খুব বেশি মাত্রায় থাকে। বিশেষ করে যখন জপধ্যানের ব্যাপার আসে, তখন আলস্য লাগে। আপনি ঠিক করে নিলেন, ভোর চারটে কি পাঁচটার সময় উঠে জপধ্যান করবেন, ঠিক সেই সময় দেখবেন ঘুম একটা বাঘের মত এসে আপনাকে ধরে নেবে, বিছানা ছেড়ে উঠতে দেবে না – এটা দেখাচ্ছে আপনার মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য। রজোগুণের প্রাধ্যান্য হলে নিজেকে সে দেখাবে, আমার মত কেউ হয় না।

সত্ত্বগুণী এগুলোর পারে চলে যায়, কে কতটা তাকে মানল কি মানল না, সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। অন্য দিকে সে কাউকে কষ্ট দেবে না। আমাদের পরম্পরাতে যত আচার্য আছেন সবাই সত্ত্ব, রজো ও তমোকে মানেন। কিন্তু এত বিস্তারে এর আলোচনা অন্যান্য গ্রন্থে নেই। ভাগবত আদিতেও আছে, পশুপাখিকে নিয়ে, মানুষের স্বভাবকে নিয়ে, এমনকি গৃহস্থকে নিয়েও বলছেন, ডাকাতকে নিয়ে বলছেন, ভক্তিকে নিয়ে বলছেন। কিন্তু ঠাকুর সত্ত্ব, রজো ও তমোকে সব জায়গায় নিয়ে এসেছেন। গীতাতেও ঠিক এভাবেই আছে – খাওয়া-দাওয়া নিয়ে, ব্যবহার নিয়ে, আচার নিয়ে, সব ব্যাপারকে নিয়েই আছে। এইবার ঠাকুর সত্ত্ব, রজো ও তমোকে নিয়ে বলতে শুরু করেছেন।

প্রথমে সংসারীর সত্ত্বগুণকে নিয়ে বলছেন, ভক্ত-ভক্তিতে নামছেন না। **সংসারীর সত্ত্বগুণ কিরকম জানো? বাড়িটি এখানে ভাঙা, ওখানে ভাঙা – মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগছে, উঠানে শেওলা পড়েছে হুঁশ নেই। আসবাবগুলো পুরনো, ফিটফাট করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই একখানা হলেই হল। লোকটি খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক; কারু কোনও অনিষ্ট করে না।**

এই সত্ত্বগুণে একটা সমস্যা হল, সত্ত্বগুণের এই যে বর্ণনা, তাতে সত্ত্বগুণ আর তমোগুণ দেখতে এক রকম হয়। আর এটা সাধুদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধুরা যাঁরা আছেন, বিশেষ করে রামানুজাচার্যের বা মাধ্বাচার্যের যত মঠ আছে, সেখানে তমোগুণ আসে না। কারণ ওদের

এত উপাচারাদি রয়েছে যে, শুধু এই উপাচারগুলিকে পালন করার জন্য তাদের সব সময় সক্রিয় থাকতে হয়। কিন্তু বেদান্তী সাধুরা খুব সহজে তমোগুণী হয়ে যায়। হরিদ্বার থেকে গোমুখ পর্যন্ত যত বেদান্তী সাধু দেখবেন, প্রায় সবাই তমোগুণী। স্বামীজী হৃষিকেশে গেছেন, দেখছেন কম্বল মুরি দিয়ে রাস্থার পাশে সাধুবাবা ঘুমোচ্ছেন। দেখে স্বামীজী খুব রেগে গেছেন, বলছেন – দে ব্যাটাকে লাঙলে জুতে। এসব দেখে স্বামীজী ধীরে ধীরে এই জিনিসটাকে সরালেন। রামকৃষ্ণ মিশনের যে কাজের আদর্শ, তার উদ্দেশ্য এটাই – তমোগুণের নাশ। যার জন্য আমাদের অনেক সময় গোলমাল হয়, লোকেরা অনেক কিছুকে নিয়ে নিন্দা করে। যে যাই বলুক, রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য হল, আগে তমোগুণকে নাশ করা। যাঁরা নিন্দা করেন, তাঁদের মধ্যে অনেক উচ্চমানের সত্ত্বগুণীও আছেন।

সত্ত্বগুণীর কিছু স্বভাবের মধ্যে আছে, খাওয়া-দাওয়াতে মশলাপাতি থাকবে না, সামান্য একটু ঝোলভাত হলেই হয়ে যায়; ঠাকুরও পরে এগুলোকে নিয়ে বলবেন। সত্যিই এই স্বভাবগুলো মানুষের পাল্টায়; কেউ যদি খুব জপধ্যান করতে শুরু করে, আর সত্যিকারের তাতে যদি সে উন্নত হতে থাকে, তখন দেখা যাবে তেল-মশলা দিয়ে রান্না করা খাবারের প্রতি তার স্পৃহাটা কমে যাবে। বদলে দুধ, দই, ঘিয়ের দিকে নজরটা বেড়ে যাবে। যে কোন খাবারে বিশেষ একটা উগ্র স্বাদ রয়েছে, সত্ত্বগুণী সেই খাবার খাবে না, খেলে শরীর খুব জোর প্রতিক্রিয়া করবে। অনেকের তো দেখলেই গা গুলিয়ে বমি আসবে। সত্ত্বগুণী যদি মাংস খায়, স্টু করে খাবে। রজোগুণী যদি মাংস খায়, মাংসকে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে, অনেক মশলা দিয়ে কষিয়ে খাবে। তমোগুণী পচিয়ে শুটকি করে তারপরে খাবে। গীতায় খুব সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে তমোগুণী কি রকম খাবার খায়। সাধুদের খুব সমস্যা, সত্ত্বগুণ থেকে কখন হঠাৎ করে তমোগুণে নেমে যাবেন নিজেরাও বুঝতে পারেন না। তমোগুণে কি হয়, কোন নড়াচরা নেই, মনে করে আমি বেশ আছি, কিন্তু তার অজান্তেই উন্নতির সমস্ত প্রক্রিয়া ওখানেই আটকে গেছে।

ভল্টায়ারের খুব বিখ্যাত গল্প, The learned Brahmin, সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন, ফ্রান্স থেকে একজন পণ্ডিত ভারতে এসেছেন, তিনি একজন ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে আছেন। ভারতের এই ব্রাহ্মণ বিরাট পণ্ডিত, প্রচুর পড়াশোন করেন, বড় জ্ঞানী; কিন্তু তাঁর মনে শান্তি নেই। ওনার বাড়ির সামনেই এক বিধবা মহিলা থাকেন। তিনি রোজ এসে ব্রাহ্মণ দেবতাকে প্রণাম করে যান। ফরাসী ভদ্রলোক গিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'তোমার জীবনে শান্তি আছে'? বিধবা মহিলা বলছেন, 'অশান্তি কি জিনিস আমি জানি না বাবা'। 'তুমি কি কর যে তোমার জীবনে অশান্তি নেই'? বলছেন, 'আমি রোজ গঙ্গাজল খাই, তুলসীপাতা খাই আর ব্রাহ্মণ দেবতাকে প্রণাম করি'। ফরাসী ভদ্রলোক সেখান থেকে গিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বলছেন, 'আপনার কি একবারও মনে হয় না যে এই বিধবা মহিলা আপনার থেকে অনেক ভাল, অনেক শান্তিতে আছেন'? বলছেন, 'হ্যাঁ, আমি ভদ্রমহিলাকে হিংসা করি; কিন্তু জগতে কিছু নেই যেটা আমাকে দিলে আমি আমার স্থান পরিবর্তন করে ওই মহিলার মত হব। কারণ সে একটা পাথর। ওর কোন উন্নতি নেই, কোন দিন কোন উন্নতি হবে না'।

ঠিক এই জায়গাতে হিন্দু ধর্ম মার খেয়ে যায়। পুরো হিন্দু ধর্মের যে সমস্যা, আমাদের শাস্ত্রে যে সমস্যা, ঠিক এই জায়গাতে। যে জায়গাতে আপনি মনে করছেন সত্ত্বগুণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আসলে এটা তমোগুণ। গঙ্গাজল খাচ্ছে, তুলসীপাতা খাচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যা আরতিতে যাচ্ছে, কিন্তু কোন উন্নতি নেই। কারণ ওখানে দেখতে হয় আপনার উন্নতি হচ্ছে কিনা। একদিন থেকে আরেকদিনে যখন যাচ্ছেন, দেখুন আপনি কতটা নিজেকে উন্নত করতে পারলেন। সে হয়ত দিনে দশ হাজার জপ করছে। কিন্তু তাতে হলটা কি? ঘোর তমোগুণী। আপনি কি উন্নতি করছেন? যদি উন্নত করে থাকেন, লোকে বুঝতে পারবে যে আপনি উন্নতি করছেন। চোখমুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই-তিনটা আঙটি। বাড়ির আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়িটি

চুনকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানারকমের ভাল পোশাক। চাকরদেরও পোশাক। এমনি এমনি সব। আজকালকার দিনে অবশ্য ঘড়ি থাকে না, সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে দামী দামী মোবাইল ফোন, হাতে আঙটি দেওয়াটা এখনও আছে। তখন বৃটিশ রাজ ছিল, তাই ঘরের দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি থাকত।

সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ – নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহংকার এই সব। অহংকার জিনিসটা রজোগুণেও থাকে আবার তমোগুণেও থাকে। রজোগুণে প্রভুত্বের ভাব থাকে; যেমনি মেনে নিল, হ্যাঁ হুজুর, আপনি রাজা; ওকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তমোগুণী ছাড়বে না। তমোগুণী যদি একবার মনে করে আপনি ওর লেজে পা দিয়েছেন, আপনাকে না কামড়ানো পর্যন্ত ছাড়বে ন। রজো আর তমোগুণীর অহংকারে এই একটা তফাৎ থাকে। এবার ঠাকুর ভক্তির সত্ত্ব, রজো ও তমোর কথা বলছেন।

আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয়তো মশারির ভিতর ধ্যান করে – সবাই জানছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় না, তাই উঠতে দেরী হচ্ছে। এদিকে শরীরের উপর আবার আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হল। খাবার ঘটা নেই। পোশাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামদ করে ধন লয় না।

তার মানে সত্ত্বগুণীর খাওয়া-দাওয়ায় কোন আড়ম্বর থাকে না। কিন্তু রজোগুণী ভক্ত খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন করবে, কখন পঞ্চ ব্যঞ্জনে, কখন বা চোদ্দ ব্যঞ্জনে ভোগ দেবে। এই যে ঠাকুর বলছেন – কখনও তোষামদ করে ধন লয় না। এই কথাতে অনেক কিছু বোঝার আছে। ঠাকুরের সময় ইংরেজরা দেশের রাজা হয়ে আছে, বড়লোক খুব কম, দেশটা অভাবে ধুঁকছে, সারা দেশ শাকান্নের উপর চলছে। কিন্তু সত্ত্বগুণীর কাছে শাকান্ন by choice, যদি আপনাকে সত্ত্বগুণ আর তমোগুণে তফাৎ করতে হয়, তাহলে সব সময় দেখবেন by choice আর by compulsion, এই দুটো তফাৎ করে দেয়। ইনি সত্যবাদী, একজন সৎ চরিত্রের, আমরা কি করে বুঝব? তাকে এমন একটা জায়গায় রেখে দিন, সেখানে তাকে কেউ দেখছে না, সে ছাড়া কোথাও আর কেউ নেই। একটা গভীর জঙ্গলে, বা পাহাড়ের কোন গুহায় যেখানে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। এবার আপনি কিভাবে জীবন-যাপন করছবেন? সেখানে ভোর চারটের সময় উঠে দু-ঘন্টা কি তিন ঘন্টা ধ্যান করলেন, নিয়মিত পূজা করলেন, ইত্যাদি; তাহলে বুঝতে হবে, এটাই আপনার জীবনধারা। তমোগুণীরা তা করবে না। যে সত্ত্বগুণীর বর্ণনা ঠাকুর করছেন, তারা এটাই করবে, এটাই তার জীবনধারা। তমোগুণী করতে হয় করছে, যদি না করলে চলে যায় ভাল। তখন আবার সেখানে ভয় আছে লোকেরা কি বলবে, তার থেকেও ভয় – ঠাকুর যদি রেগে যান। সত্ত্বগুণী এত কিছু ভেবে কিছু করে না, সত্ত্বগুণী জানে এটাই আমার জীবনদর্শন। আর রজোগুণী কেউ যদি দেখার না থাকে এসব কিছু করবেই না, প্রশ্নই নেই। রজোগুণী যেটাই করে লোকেদের দেখানোর জন্য করে।

তখনকার দিনে লোকেদের টাকা-পয়সার অভাব ছিল, বেশির ভাগই ছিল তমোগুণী গরীব কাঙাল। আমাদের এক মহারাজ এক সময় বম্বেতে ছিলেন। একবার ওনাকে একজন বড় বিজনেসম্যান ডেকেছিলেন, কিছু ডোনেশান দেবেন। মহারাজ গেছেন, ওনাকে দেখেই বলছে, Oh Swamiji you have come? বলেই দেখিয়ে দিলেন, ওই কোণায় এক ব্যাগ টাকা রাখা আছে, take it। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, I am not a beggar I am a royal beggar। সন্ন্যাসীরাও সাধারণ কাপড়ে থাকেন। সন্ন্যাসী আর ভিখারীকে দেখতে একই রকম। আগে মঠ মিশনের অবস্থা অন্য রকম ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। কিন্তু তাহলেও, তাঁদের জিনিসপত্র সেই রকম কিছুই নেই। একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের যা সম্পত্তি তার থেকে অনেক কম থাকে একজন সন্ন্যাসীর, টাকা-পয়সা কিছুই থাকে না। তার মানে এই নয় যে তাঁরা ভিখারী। এনারা যে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন

নিজের ইচ্ছায় ছেড়েছেন, বাধ্যতামূলক না। তমোগুণী লোক সুযোগ পেলেই হাত পাতবে। রজোগুণীও হাত পাতবে, সত্ত্বগুণী কখনই তা করতে যাবে না। নিজের জন্যও হাত পাতবে না, অপরের জন্যও হাত পাতবে না। খুব একটা জরুরী অবস্থা হল, বড় কোন সঙ্কট হল; ঠাকুর যেমন নরেনকে বলছেন, তোর জন্য আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করব। এগুলো হল সত্ত্বগুণীর লক্ষণ। কিন্তু তোষামোদ করা মানে, আপনি নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছেন।

ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে একটি সোনার দানা। (সকলের হাস্য) যখন পূজা করে, গরদের কাপড় পরে পূজা করে। দেখলেই বোঝাই যাচ্ছে, ঠাকুর এখানে মজা করে বলছেন।

পরের পরিচ্ছেদে ঠাকুর ভক্তির তম নিয়ে বলবেন, এই তমোগুণ কিন্তু সংসারীর না। এখানে ভক্তের কথা বলছেন। অনেক সময় আমাদের মনে কৌতুহল হয় – ঠাকুর সব কিছুর সত্ত্ব, রজো, তমো বলেছেন; ভক্তিরও সত্ত্ব, রজো, তমো বলেছেন। কিন্তু জ্ঞানের সত্ত্ব রজো তমো বলেননি। আমার খুব কৌতুহল হয় যে, জ্ঞানের সত্ত্ব, রজো, তমো আদৌ হয় কি? হয়ত হয়, ঠাকুর বলেননি। যদি জ্ঞানের সত্ত্ব, রজো, তমো হয়, তাহলে সেটা কেমন হবে? এটাকে নিয়ে আমি মাঝে মাঝে ভাবি, তবে অনেক কিছু ঠিক পরিষ্কার হয় না। এখানে জ্ঞান মানে জ্ঞানযোগ না, সাধনার কথা বলা হচ্ছে। এখানে ভুল ভাবার কিছু নেই যে, ভক্তির তমো যেটা, সেটা তাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে না, তা না। এটাই ঠাকুর এখানে বলছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ – ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। এটা খুব interesting, ওই যতটুকু জানে, সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। ভক্তির তমো আলাদা জিনিস, যখন ভক্তি করছে তখন তার সাধনা কখন সাত্ত্বিক সাধনা হয়, কখন রাজসিক সাধনা হয় আবার কখন তামসিক সাধনা হয়। **ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো। এইরূপ ডাকাত পড়া ভাব'**। আসলে এগুলো তফাৎ করা একটু কঠিন হয়। কিন্তু এই রকম ভক্ত যে হয় না তা নয়, যদিও রামকৃষ্ণ মিশন এগুলোর অনুমতি দেয় না। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দিকের ইতিহাস যদি দেখি, সেখানে সাধুদের কাছে যেসব ভক্তরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে এই রকম কিছু কিছু ভক্ত আমরা দেখতে পাই।

কি! আমি তাঁর নাম করেছি – আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে। তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী! এমন রোখ হওয়া চাই।

"**তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বরলাভ হয়**"। মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ তিনটে গুণই আছে – মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। সত্ত্বগুণে সাধারণ ভাবে সুখের প্রতি, জ্ঞানের প্রতি একটা স্পৃহা থাকে। এই জ্ঞান, সুখ, এগুলো যখন ঈশ্বরের দিকে চলে যায়, তখন ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ঈশ্বরের নামে আনন্দ, মোড়টা ওই দিকে চলে যায়। ঠিক তেমনি যারা তমোগুণী, সে যদি জেনে যায় আমি তমোগুণী, সেও এই তমোগুণটাকে ঈশ্বরাভিমুখী করে দিতে পারে। কিভাবে? "**তাঁর কাছে জোর কর, তিনি তো পর নন, তিনি আপনার লোক। আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়**"। অপরের যে সেবা সেটাও করা যায়।

ঠাকুর বৈদ্য আর আচার্যকে নিয়ে বলছেন। **বৈদ্য তিনপ্রকার – উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য – রোগী খেলে কিনা এ-খবর লয় না**। ঠাকুরের ভাষায় বেশির ভাগ ডাক্তাররা হলেন অধম বৈদ্য। **যে বৈদ্য**

রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায় – যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে। লক্ষ্মীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও' – সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয় – সে উত্তম বৈদ্য। এই বৈদ্যের তমোগুণ, এ-গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না। মায়েরাও বাচ্চা ওষুধ খেতে না চাইলে অনেক সময় জোর করে ওষুধ খাইয়ে দেয়।

বৈদ্যের মত আচার্যও তিনপ্রকার। ধর্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লয় না – সে আচার্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বরাবর বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান – তিনি মধ্যম থাকের আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে কোন আচার্য জোর পর্যন্ত করে, তাঁকে বলি উত্তম আচার্য।

আগেও একটা কথা বলেছেন, বাইরে থেকে দেখতে সব এক রকম, কিন্তু ভিতরে পুরগুলো আলাদা। এখানে মূল কথা এটাই – সবারই ভিতরে সত্ত্ব, রজো, তমো আছে। আমাদের কাছে মনে হয় তমোগুণ খারাপ, রজোগুণ একটু ভাল, সত্ত্বগুণ ভাল। ঠিকই, গীতার একটা বড় শিক্ষাই হল, তমোগুণকে রজোগুণ দিয়ে জয় করে, সেখান থেকে সত্ত্বগুণে যেতে হবে। ঠাকুর গীতার এই জিনিসটাকে এখানে ঠিক সেইভাবে নিচ্ছেন না। ঠাকুরের যেন বলতে চাইছেন – তোমার ভিতর যা আছে সেটাকে তুমি তো আর পাল্টাতে পারবে না, ওটাকে মোড় ফিরিয়ে দাও। মোড় ফিরিয়ে পুরো জিনিসটাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাও, ঈশ্বরের প্রতি নিয়ে গেলে সেটার ফল পাওয়া যায়। আমরা আগে একটা যে আলোচনা করলাম, সংসারীদের তমোগুণ বা সাধু যদি তমোগুণী হয়ে যায়, ওটা কিন্তু আলাদা। ওটা ভক্তির তমো না, ওটা হল তমোগুণী মানুষ। তমোগুণী মানুষ আর ভক্তির তমো, দুটো পুরোপুরি আলাদা জিনিস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না

এতক্ষণ ঠাকুর সত্ত্ব, রজো ও তমোকে নিয়ে বলছিলেন, তার সাথে বললেন, মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম আছে, তেমনি ভক্তিরও কিভাবে সত্ত্ব, রজ ও তম হয় সেটাও বললেন। সেখান থেকে একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "**ঈশ্বর সাকার না নিরাকার**"?

এই ধরণের প্রশ্ন বহুবার আসে। বিশেষ করে ভারতবর্ষে খ্রীশ্চানিটি আর ইসলাম আসার পর থেকে হঠাৎ নিরাকার, formless, ধর্ম জগতে এটাই যেন একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াল। একটা ধর্ম, একটা ভাব, একটা সত্য যে fashionable হতে পারে ভাবলেই আতঙ্ক লাগে। প্রত্যেক সমাজে সমস্যা আছে। ইউরোপীয় সমাজের দিকে তাকান, আমেরিকান সমাজকে দেখুন, ওখানে হঠাৎ হঠাৎ একটা সত্য ফ্যাশানেবল হয়ে যায়। কিছু দিন যাওয়ার পর দেখা যায় ওটা আদপেই সত্য না। খুব নামকরা দার্শনিক, চিন্তাবিদ, প্রফেসার, গণিতজ্ঞ ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটা খুব সুন্দর কথা আছে – যুদ্ধের সময় সীমান্তে দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্য, শত্রুর গুলি খেয়ে মরার জন্য একটা শক্তি লাগে, সাহস লাগে। কিন্তু নিজের দেশে বসে এটা বলা যে, এই যুদ্ধটা ভুল, এর জন্য অন্য ধরণের একটা শক্তি লাগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেল যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধিতা করছিলেন। এমনকি তাঁকে সরকার গ্রেফতার করে জেলে বন্দী করে রেখেছিল।

আজকে আমরা যেটাকে সত্য বলছি, যেমন বিজ্ঞানেও যেটাকে সত্য বলছেন, ওটা সত্য না। যারা বলছে এটা সত্য, তারা সত্য বলে আপনার সামনে দিচ্ছে। আমাদের মন কাঁচা, যা বলছে মেনে নিচ্ছি। নেতারা বলছে, খবরের কাগজ বলছে, আজকাল সোস্যাল মিডিয়া হয়েছে, সবাই বলছে; আমরাও মেনে নিচ্ছি। ঠাকুরের সময় বা তারও আগে থেকে খ্রীশ্চান, মুসলমানরা এসে এমন ভাবে formless God নিয়ে বলতে লাগল যে, তার মধ্যে God with form এটা যেন কেমন একটা

পৌত্তলিক ব্যাপার, কেমন যেন নিকৃষ্ট ব্যাপার। তখনকার দিনের যাঁরা পড়াশোনা করা লোক, তাঁরা এই ধরণের হিন্দু ধর্মের সাথে নিজেকে জড়াতে চাইতেন না, এখনও অনেকে চান না।

আজকেই একটা লেখা পড়লাম। একজন নামকরা মহিলা, নামকরাই হবেন, অমন জায়গায় তাঁর লেখা বেরিয়েছে, খুব নামকরা না হলে ওখানে লেখা বেরোবে না, ওনার নাম আগে আমি কখন শুনিনি। উনি লিখছেন, গীতা হিন্দুদের কাছে কখন পপুলার গ্রন্থ ছিল না। তিলক, মহাত্মা গান্ধী, অরবিন্দ যখন গীতাকে নিয়ে লিখলেন, তারপরে হঠাৎ এটা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হয়ে গেল। তার সঙ্গে লিখছেন, হ্যাঁ এটা ঠিক যে, শঙ্করাচার্য, রামানুজরা গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন। আরে মুর্খ, এই ধরণের কথা যারা বলে তাদের মুর্খই বলতে হয়, তা সে যত বড়ই হয়ে থাকুক; ভারতের যে কজন নামকরা দার্শনিক আছেন, তাঁরা যদি ভাষ্য লিখে থাকেন, তাঁরা কি এমনিই লিখে দেবেন। পপুলার ওয়ার্ক যদি না হয়ে থাকে, তাহলে সবাই যে ভাষ্য লিখছেন, তাঁরা কি এমনি এমনি লিখবেন।

ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসীর কাছে কিছু না থাকুক, গীতা অবশ্যই থাকবে। গান্ধীজী ঠাকুরের অনেক পরে এসেছেন, ঠাকুর তিলকের নামও কোন দিন শোনেননি; তাহলে ঠাকুর এই কথা কি করে বলতে পারলেন? কিছু একটা বলে দিয়ে বিতর্ক তৈরী করে বাজার গরম করতে চায়, আর এরা হল সব ইংরাজী পড়া লোক। এখন যত so called modern আছে, এদের কাছে হিন্দু বিরোধী যা কিছু হবে সবটাই ঠিক। সেক্যুলারিজম্ মানেই হিন্দু বিরোধী, হিন্দুদের যা কিছু আছে সবটাই খারাপ, এই আওয়াজটা বাংলা থেকেই প্রথম শুরু হয়, যখন থেকে ব্রাহ্মসমাজ শুরু করেছিল। এখন এই রোগটা সারা ভারতেই আছে। ভোটে রিগিং প্রথম বিহার থেকে শুরু হয়, আর বাংলায় শুরু হয় হিন্দু বিরোধিতা। সেইজন্য ঠাকুর, স্বামীজীকে বাংলাতেই আসতে হল।

উপনিষদ সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, দুটোকে নিয়েই বলছেন। সগুণ ব্রহ্ম মানেই সাকার ব্রহ্ম। তাই যদি হয়, তাহলে কিসের সাকার, কিসের নিরাকার। আমাদের অনেক সময় কোন একটা কথা নিয়ে অনেকে বলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এটা কেন করেন'? আমি তাদের বলি, 'আচ্ছা দেখাতে পারেন কোথায় বারণ করা আছে'? কিছুই তো পড়েনি। বলবে, শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রে তো এটাও আছে যে, গৃহস্থ কখন সন্ন্যাসীকে উপদেশ দেবে না। আপনি শাস্ত্রের একটা কথা নেবেন, আরেকটা কথা নেবেন না, এটা হয় না। কোন্ শাস্ত্র বলছে, ঈশ্বরকে নিরাকার হতে হবে? কেন, মুসলমানরা, খ্রীশ্চানরা বলছে। আমরা ওদের মানি না, ঝামেলা চুকে গেল।

একজন মুসলিম ধর্মযাজক বলেন, 'হিন্দুদের মূর্তি পূজা নেই'। তুমি কোথায় পেলে? 'বেদে আছে'। বেদেই আবার মূর্তি পূজার কথাও আছে। অবশ্য মন্ত্রটাকে ভদ্রলোক ভুল ব্যাখ্যা করলেন। উপনিষদে দুটোর কথাই আছে। আসলে পড়াশোনা না থাকলে যা হয়, সবটাই ভাসা ভাসা। আমাদের যেমন বিজ্ঞানের জ্ঞান ভাসা ভাসা, কথায় কথায় বলবে scientific। Scientifi attitudeএর তুমি কি বোঝ, কতটুকু বিজ্ঞান পড়েছ? তুমি কি জানো বিজ্ঞান থেকে যত কথা আসে তার শতকরা নব্বই ভাগ কথার সবটাই ফ্রড? যত বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে, তারা Research Institute গুলিকে funding করে। যেমনটি রেজাল্ট চায় তেমনটি তাদের দিয়ে রিসার্চ করায়। ইদানিং কালে দেখবেন হার্টে প্রবলেম হলে স্টেইন্ট লাগানো হয়। এখন আমেরিকার হেলথ সোস্যাইটি স্বীকৃতি দিয়েছে যে, স্টেইন্ট লাগানোর কোন দরকারই নেই। এই যে গত পঞ্চাশ বছর ধরে সবারই বুকে এত খরচা সাপেক্ষ স্টেইন্ট লাগিয়ে যাচ্ছেন, এখন বলছে কোন দরকারই নেই। এটা কি scientific ছিল, এতদিন ধরে যেটা করছিলে? বিজ্ঞানের নামে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। গ্লোবাল ওয়ারমিং নিয়ে কয়েক বছর ধরে কত কি হল, নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত পেয়ে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে কিছুই না, একটা কিছু হলেই বলে দেবে গ্লোবাল ওয়ারমিং। অনেক আগেক আমার 'পরম' বইতে মজা করে লেখা আছে – মন যদি আপনার খিট খিট করে, ওটাকে গ্লোবাল ওয়ার্মিংএর উপর দিয়ে চালিয়ে দিন। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া গ্লোবাল

ওয়ারমিংএর কারণে, ডিভোর্সের সংখ্যা বেড়ে গেছে গ্লোবাল ওয়ারমিংর কারণে। সবটাই গ্লোবাল ওয়ারমিংএর উপর চাপিয়ে দিয়ে যান, কোন অসুবিধা নেই। এটাকেই বলছেন scientific attitude! বেশির ভাগই জিনিস বিজ্ঞানের নামে যা হয় সব ফ্রড। এরা এসে আমাদের বলে, আমি না ধর্ম মানি না, আমি scientific। কিসের তুমি scientific?

ঠিক ওই একই attitudeএ নিরাকার সাকার। ধর্মের তোমার কোন জ্ঞান নেই; পরে ঠাকুর আবার বলবেন, এদিকে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা – ইনি কোন কৃষ্ণ মানেন? ধর্মের ব্যাপারে তোমার কোন ধারণা নেই, কোন শাস্ত্র পড়োনি, কোন সাধনা করোনি, ফটর ফটর করে বলতে আসে, আমি না সাকার মানি না, আমি নিরাকার। ঠাকুর এবার এর উত্তর বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। পুরো অধ্যায়টা না শুনলে এই জিনিসটাকে ঠিক বোঝা যাবে না। আমরা অনেকবারই এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছি যে, হিন্দু ধর্ম কোথাও সাকার শেষ কথা, এই অর্থে নেন না। কিন্তু যাঁরা ভক্তি বেদান্তী, যেমন রামানুজ, মাধ্বাচার্য, নিম্বার্ক, এনারা যাঁরা ছিলেন, এনাদের এতে কোন আগ্রহ নেই। কি রকম? খুব সাধারণ উদাহরণ – আপনি যখন চার-পাঁচ বছরের বাচ্চা ছিলেন, তখন আপনার বাবা-মা কত বড়লোক তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। বাবা আমার বাবা, ওনার ভালবাসাটা যেন আমার প্রতি থাকে।

ওয়াল্ট ডিজনের একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল, ছয়-সাত বছর বয়স। স্কুলে পড়ে, একদিন ওর ক্লাশের সহপাঠীরা ওকে বলছে, তুমি জান তোমার বাবা হলেন ওয়াল্ট ডিজনে, যিনি মিকি মাউজের স্রষ্টা। বাচ্চাটা মিকি মাউজ জানে, ওয়াল্ট ডিজনে তার বাবার নাম, তাও জানে; কিন্তু এটাই যে তিনি সেটা জানে না। আরও অনেক কিছু বলতে বলতে ক্লাশের বন্ধুরা বলছে, তুমি ওনার অটোগ্রাফ নিয়েছ? সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি এসেছে, বাবাও এসেছে। মেয়ে তখন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে বলছে, 'Are you Mr. Walt Disney'? 'Yes! I am'। বাবা বুঝতে পারছে না, হঠাৎ মেয়ে কেন জিজ্ঞেস করছে। মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'Are you the creator of Micky Mouse'? 'Yes, I am'। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যাগ থেকে নোটবুক বার করে বলছে, give me your autograph। সত্যিকারের ঘটনা, খুব interesing।

বাচ্চারা এত কিছু বোঝে না, আমার বাবা-মা থাকলেই হল। এখন ঈশ্বরের কত ঐশ্বর্য, ঈশ্বর নিরাকার না সাকার, ভক্তের তাতে কি আসে যায়। আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার উপর কৃপা কর, কৃপা নাই কর; তুমি আমাকে ভালবাস, নাই ভালবাস; আমি তোমাকে ভালবাসি। এনারা হলেন ভক্তি বেদান্তী, ভক্তি বেদান্তী যাঁরা তাঁদের কাছে নিরাকার সাকার কোন কিছুরই গুরুত্ব নেই। তবে ভালবাসার জন্য একটা রূপ দরকার পড়ে। যাঁরা বলেন, আমি নির্গুণ নিরাকারকেই ভালবাসি, এর থেকে বেশি ধাপ্পাবাজী আর হয় না। নির্গুণ নিরাকারের অমূর্ত জিনিসকে ভালবাসা যায় না। নির্গুণ নিরাকার কোন ব্যক্তি না। ভগবান বুদ্ধ যেমন বলছেন, বুদ্ধ কোন পুরুষ না, নারী না, কোন মানুষ না, বুদ্ধ একটা অবস্থা। নির্গুণ নিরাকার এটা একটা সত্য, কিন্তু এটাকে ভালবাসা যায় না। কারণ, যখন আপনি জানবেন ওটাই আপনি, একমাত্র তখনই আপনি নির্গুণ নিরাকারকে জানতে পারবেন। এই জগৎ মন দিয়ে চলে, এই মন দিয়ে যখন নির্গুণ নিরাকারকে দেখা হয়, তখন ওই সত্যকে যেমনটি মন তেমনটি দেখা যায়।

আমরা মহাবীর হনুমানের উদাহরণ নিতে পারি। বাল্মীকি রামায়ণে মহাবীর হনুমান এক রকম, তুলসীদাসের রামচরিতমানসে মহাবীর হনুমান আর-এক রকম, আজকে আমরা যখন পড়ছি তখন ওটা আর-এক রকম। তাহলে আমরা মহাবীর হনুমানের কাছে যখন প্রার্থনা করছি, ধ্যান করছি, তখন আমরা কার ধ্যান করছি, কার প্রার্থনা করছি? আমরা এখন যে কজন বসে আছি, মনে করুন আমরা সবাই মহাবীর হনুমানের ধ্যান করছি, চিন্তন করছি, একটা স্টাডি করলে দেখা যাবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে মহাবীর

হনুমান আলাদা হবে। এই জিনিসটা যদি না বুঝতে পারেন, তাহবে জেনে রাখুন নিরাকার সাকার বুঝতে পারবেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে আপনি যখন পূজা করছেন, সেখানে এতটা তফাৎ হবে না। তার কারণ ঠাকুর এখন সবে দেড়শ বছরও হয়নি। এখনও আলাদা আলাদা attitude দিয়ে দেখা শুরু হয়নি। ঈশ্বরকে জানা মানে, সেই সচ্চিদানন্দ রূপে জানা। কিন্তু রূপটা আসে মন দিয়ে, সবারই মন আলাদা বলে সবারই ঈশ্বরদর্শন আলাদা। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের যত দর্শন হবে সব কটা আলাদা হবে। কিন্তু ওই আলাদাতে যে তফাৎ হবে, সেটা খুব হাল্কা তফাৎ হবে।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র আসার পর আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপে দেখছি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এত কাহিনী, এত রূপ নিয়ে আসা হয়েছে যে, ফলে ওটা খুব সোজা হয়ে গেছে। অন্য দিকে শ্রীরামচন্দ্রের এত রূপ নেই। যেমন শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টুমি করছেন, গোপীদের সাথে লীলা করছেন। আবার রাধাও আছেন। অথচ ভাগবতাদি আমাদের মূল ধর্মগ্রন্থগুলির কোথাও রাধার নাম নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে আমরা রাধা ছাড়া কল্পনাই করতে পারি না। বৃন্দাবনে সবাই সব কিছুতে 'রাধে' 'রাধে' বলে যাচ্ছে। তাহলে 'রাধা' এলেন কোথা থেকে? কোথাও থেকে রাধা আসেননি, তিনি চিরদিনই আমাদের ভাবরাজ্যে রাজত্ব করে আসছেন। সেই সচ্চিদানন্দকে তিনি রাধা রূপে দেখছেন। এটা কি আমাদের মনের কল্পনা, কখনই না। কারণ মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এক না হলে, এই দর্শন আপনার হবে না। কিন্তু এগুলোকে ধারণা করা কঠিন। ঠাকুর এই জায়গাটাকে নিয়ে এবার বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস। আমার আপনার কাছে পরিষ্কার; আমার দেহ প্রিয়, আমার মন প্রিয়, আমার সংসার প্রিয়, আমি যাকে ভালবাসি সে সত্য, যাকে ভালবাসি না সেও সত্য। যাকে পছন্দ করি না, সব সময় চাইছি তার ক্ষতি হোক, যাকে ভালবাসি সব সময় তার উত্থান চাইছি। আগামীকাল যদি ভালবাসা শত্রুতার দিকে চলে যায়, তখন আমাদেরও ভাব পাল্টে যাবে; ঠাকুর, এতদিন ওর ব্যাপারে যা বলেছিলাম ওটা বাতিল করে দিলাম, এখন নূতন করে ওকে টাইট দিতে হবে। আবার যে এতদিন আমার শত্রু ছিল, তার জন্য যে অমঙ্গল কামনা করে এসেছি, এখন ভালবাসা হয়ে গেছে, এরপর ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করে বলছি, এতদিন অমঙ্গল কামনা করাটা ভুল হয়ে গেছে। ঠাকুর এখন কি করবেন? কিছুই করেন না। আপনার কথা শুনতে তাঁর ভারি বয়ে গেছে। সকালে এক রকম প্রার্থনা, বিকালে আরেক রকম প্রার্থনা করছি; ঠাকুর যদি আমাদের প্রার্থনা শুনতে শুরু করেন, পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু জগৎটা আমার কাছে সত্য, কারণ আমি সত্য, আমি সত্য তাই জগৎও সত্য। এদের জন্য ঈশ্বর সব সময় সাকার। এই চতুর্থ পরিচ্ছেদ খুব মূল্যবান। ঈশ্বর তত্ত্ব যদি বুঝতে হয়, তাহলে এই পরিচ্ছেদটা বারবার পড়তে হবে।

বলছেন, **তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' (Personal God) হয়ে দেখা দেন**। ব্যক্তি রূপে দেখা দেন, 'মানুষ রূপ' শব্দটা ঠিক হবে না, ব্যক্তি রূপে মানে একটা আকার নিয়ে। যে রূপে আপনি ধ্যান ধারণা করেছেন, মনে করুন আপনি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত, শ্রীরামচন্দ্রের অনেক রূপ, কোন একটা রূপের ধ্যান ধারণা করে যাচ্ছে, যখন দর্শন হবে তখন ওই রূপেই দর্শন হবে। ইংরাজীতে একটা খুব সুন্দর কথা আছে, Love me love my dog, আমাকে ভালবাসতে হলে আমার কুকুরকেও ভালবাসতে হবে। ভারতবর্ষে একটা মেয়েকে কিংবা একটা ছেলেকে যখন বিয়ে করা হয়, শুধু ছেলে আর মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয় না, ছেলে আর মেয়ের যত গোষ্টি আছে, বিয়েতে সবার সঙ্গেই তারা দুজনে একসূত্রে বাঁধা হয়ে যায়। বিয়ে মানেই দুটো গোষ্টির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। শ্রীরামকে যখন আপনি ইষ্ট করলেন, তাঁর সাথে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সীতা, হনুমান সবাই এসে যাচ্ছেন। এখন আপনি শ্রীরামের ধ্যান করছেন, তখন শ্রীরামের একা ধ্যান হবে না। স্বাভাবিক ভাবে মন কখন না কখন

ওনাদের দিকেও যাবে। তাই ভগবান আপনাকে রাম রূপে দর্শন দেবেন, না হনুমান রূপে দর্শন দেবেন, বলা অসম্ভব। কারণ দুটোই সত্য।

বেলুড় মঠ থেকে যাঁরা ঠাকুরের মন্ত্র নিয়েছেন, তাঁরা ঠাকুরের পূজা, ধ্যান করতে বসলে শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এনারাও স্বাভাবিক ভাবে এসে যাবেন। তাই না, রাজা মহারাজ আদি ঠাকুরের পার্ষদরাও স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবেন। এরপর সেই সচ্চিদানন্দ কিভাবে আপনাকে দেখা দেবেন, বলা অসম্ভব। কারণ সবটাই সত্য। ঠাকুর যেমন সত্য, শ্রীশ্রীমাও তেমন সত্য, মা যেমন সত্য সেইভাবে ঠাকুরের সন্তানরাও সত্য, সচ্চিদানন্দ যেমন সত্য, ঠাকুরও তেমন সত্য। নির্গুণ নিরাকার যেমন সত্য, সগুণ সাকারও তেমন সত্য। ফলে সেই নির্গুণ নিরাকার ঠাকুরের যে কোন সন্তান বা ঠাকুরের যে কোন গৃহী ভক্ত, যাঁর নাম শুনে থাকতে পারেন, নাও শুনে থাকতে পারেন; যে কোন রূপে তিনি আপনাকে দেখা দিতে পারেন।

বলছেন, **জ্ঞানী–যেমন বেদান্তবাদী–কেবল নেতি নেতি বিচার করে।** মাস্টারমশায়ের সৌজন্যে আমরা জ্ঞানীর এই বিশ্লেষণটা পাচ্ছি। ঠাকুর এখানে ক্লাশিফাই করে দিচ্ছেন, জ্ঞানী মানে শুধু বেদান্তবাদী না, অন্য ভাবেও জ্ঞানী হতে পারে। আমরা জ্ঞানী বলতে সাধারণ ভাবে মনে করি নিরাকারবাদী। কিন্তু ভক্তিমার্গেও জ্ঞানের একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে, সুফিদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা এই রকমই, ভক্ত আসলে কিন্তু জ্ঞানী। ঠাকুর এখানে জ্ঞানী থেকে সরে বেদান্তবাদীতে চলে এসেছেন। **বিচার করে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা–স্বপ্নবৎ'। জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।**

দেববাণীতে স্বামীজী এই জিনিসটার উপর অনেকবার আলোচনা করেছেন – নিরাকার, সাকার তার সঙ্গে জগৎ। এটার ব্যাখ্যা করতে স্বামীজী এই উদাহরণটা নিতেন, এটা স্বামীজীর একটা খুব প্রিয়ে উদাহরণ – সমুদ্র আর তার ঢেউ। যখন আপনি সমুদ্র দেখছেন তখন আপনি ঢেউ দেখছেন না, যখন ঢেউ দেখেন তখন সমুদ্র দেখেন না। যদি আপনি জগৎ দেখেন তার মানে আপনি ঢেউ দেখছেন; তখন আপনি সমুদ্র দেখতে পারেন না। ফলে এখন আপনি ঈশ্বরকে যেভাবে দেখবেন, necessarily, compulsorily আপনি সাকার রূপেই দেখবেন। ঠাকুর পরে আবার বলবেন, যার কাছে জগৎ সত্য, জগতের একটু আঁশ পর্যন্ত যার আছে, তার জন্য সগুণ সাকার। একমাত্র যখন সব কিছু উড়ে গেল, যখন দেখে ঈশ্বর বৈ আর কিছু নেই; তখন এই সংসারকে স্বপ্নবৎ মনে হয়, মানে উড়ে গেল, আর কিছু নেই। আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি, খুব সঠিক উদাহরণ।

উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুতে সবটাই সমুদ্র আর বরফ। একটা আইসবার্গ ভেঙে সব বরফ ভাসছে। এখন আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি, বরফের একটা চেতন আছে, আমিত্ব ভাব আছে আর সমুদ্রেরও চেতনা আছে। কোন কারণে একটি বরফের চাঁইএর চেতনা এসে গেল, সে ভাবতে শুরু করল, আমিও যা সমুদ্রও তাই, আমরা দুজনই জল (H_2O)। জলরূপে আমিও যা সমুদ্রও তাই, আর এখানে যাবতীয় যা কিছু সবই তাই। ফলে এরপরে কি হবে। বাকি যত বরফের চাঁই আছে তারা তো জানে না, তারাও জল কিন্তু জানে আমি বরফ। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রূপ আছে, আলাদা আলাদা আকৃতি আছে, এবার আপনি তাদের সবার নাম দিয়ে দিন। নাম দিয়ে দিলেন – লম্বা বরফ, ছোট বরফ, মোটা বরফ, পাতলা বরফ, কুচি বরফ। এই আলাদা ব্যক্তিত্ব ওদের চলতেই থাকবে, অথচ ওরা সবাই বরফ। তার মধ্যে একটা বরফের চাঁই, সে জেনে গেল, আমি আসলে জল, আমি সমুদ্রের সঙ্গে এক। এখন ওদের মধ্যে যে মারামারি, ওদের অস্তিত্ব নিয়ে যে লড়াই, তাদের এই জিনিসটা বললে তারা মানবে না – সমুদ্রের জলও যা, এই বরফটাও তাই। সেই বরফের চাঁই যখন দেখছে – আমিই সমুদ্র, আমিই এই বরফের চাঁইগুলি হয়েছি; তার মানে তার বাকি সব কিছু মুছে গেছে। কিন্তু সে যখন বাকি বরফের চাঁইদের গিয়ে বলবে, ওহে ভাই আমরা সবাই এই সমুদ্রের সঙ্গেই জড়িয়ে আছি। তখন এটা ভক্তি পথ

হয়ে যায়। আপনার understanding কেমন সেটার উপর নির্ভর করে আপনার কাছে জগৎটা থাকবে না উড়ে যাবে। এরপর ঠাকুর বলছেন।

কিরকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র – কূল-কিনারা নাই – ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায় – বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে, কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন। জগৎ এখানে ওই ভাবে বলছেন না, ঈশ্বরকে নিয়ে বলছেন। ঠাকুর এখানে বরফ আর সমুদ্রের যে উদাহরণ দিচ্ছেন, স্বামীজী এটাই সমুদ্র আর ঢেউএর উপমা নেন।

জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।

এই যে ঠাকুর বলছেন, ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তিভাব; আশ্চর্য যে আচার্য শঙ্করও একই কথা বলছেন। যাঁরা বই-টই লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, এমন বিচিত্র বিচিত্র কথা লেখেন যে অবাক হয়ে যেতে হয়। একজন তো ঠাকুরকে নিয়ে বলে দিলেন – ঠাকুর শাক্ত-বেদান্ত। ব্যক্তি ভাবে কোথায় শক্তি বেদান্ত আসছে! যেমনি মনের এলাকায় এসে যায়, অনন্ত হয়ে যায়। আচার্য শঙ্কর একই কথা বলছেন – সেই ঈশ্বর ভক্তের কামনার পুর্তি করেন। ভক্তের জন্য ঈশ্বর। শঙ্করাচার্য পর্দার ওপারের কথা বেশি বলছেন, ঠাকুর পর্দার এপারের কথা বেশি বলছেন। ফলে মনে হয় যেন দুজনের মধ্যে একটা তফাৎ আছে, কিন্তু যেমনি common meeting groundএ নিয়ে আসবেন, তখন দেখা যাবে দুজন একই কথা বলছেন। কিন্তু meeting groundটা কম, কারণ শঙ্করাচার্য বেশির ভাগ সময় আত্মা, ব্রহ্মের কথা বলে যাচ্ছেন, অর্থাৎ পর্দার ওপারের কথা। ঠাকুর বারবার জগতের ব্যাখ্যা করছেন, তার মানে পর্দার এপারের কথা।

বিচার করতে করতে আমি-টামি আর কিছুই থাকে না। এইসব কথা আমাদের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। যেখানে খুব উচ্চ অবস্থার যে বিচার হয়, অত্যন্ত উচ্চ অবস্থায় যে সাধনা হয়, এখানে ঠাকুর সেই উচ্চ অবস্থার কথা বলছেন। *অহং ব্রহ্মাস্মি* খুব নামকরা কথা, সেখানে কি হয়, অহং বলতে আমরা যেটাকে মনে করি, সেটার উপর থেকে উপাধিগুলি সরাতে হয়। ব্রহ্মের যত রকমের উপাধি আমরা কল্পনা করতে পারি, সেটাকেও সরাতে হয়। তখন কি হয়? **পেঁয়াজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না**। বলছেন ঈশ্বরের কথা, উপমা দিচ্ছেন পেঁয়াজের; বোঝানর জন্য দিচ্ছেন। আচার্য শঙ্কর এই ধরণের অনেক উপমা দিয়েছেন, তাতে রামানুজাদিরা খেপে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন।

যেখানে নিজের আমি খুঁজে পাওয়া যায় না – আর খুঁজবেই বা কে? সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, কে বলবে? এই একটি বাক্যকে যদি ঠিক ঠিক বোঝা যায়, তাহলে বোঝা যাবে নির্গুণ নিরাকার কি। বেশির ভাগ ধর্মে যারা চব্বিশ ঘন্টা নির্গুণ নিরাকার করে যায়, আসলে ওরা আদপেই নির্গুণ নিরাকার না। কারণ তাদের কাছে ভগবানের একটা রূপ আছে। ভগবানের কাছে তিনি ভক্ত রূপে গেছেন, এরপর আর কিসের নির্গুণ নিরাকার থাকল। নির্গুণ নিরাকার মানেই – আমির উপর যত রকমের ভাব আছে, যত রকমের উপাধি আছে সব খসে পড়ে গেছে। ফলে কি হয়, তখন বোধ করার জন্যও কেউ থাকছে না, ওই অবস্থার কথা বলার জন্যও কেউ থাকছে না। কোন কিছুই থাকছে না, কারণ সবটা মিলে এক হয়ে গেছে কিনা।

আমরা যে বরফের উদাহরণ দিলাম, বরফটা যদি গলে যায়, সমুদ্রের সঙ্গে সে এক হয়ে গেল, বরফটাই আর নেই, এরপর আর কিসের নিরাকার, কিসের সাকার। ঠাকুর এক জায়গায় এটা বলছেন যে, কখন-সখন তিনি, সেই সচ্চিদানন্দ পুরোপুরি গলতে দেন না। এখানে মনে রাখতে হবে, আমরা বরফ, জল, লবণ যা কিছু সব বলছি, এগুলো হল উদাহরণ। আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে উপমাগুলি ঠিক

ঠিক মেলে না, একটা আভাস দেওয়ার জন্য, ধারণা করার জন্য এভাবে বলা হচ্ছে। ঠাকুর নিজের ব্যাপারে বলছেন – তিনি নুনের পুতুল হয়ে সমুদ্রের জলে নেমে মিলে যাবেন, তখন কে যেন তাঁকে আটকে দিল। সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের জ্ঞান তখনই হবে যখন তিনি সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন, তা নাহলে সেই জ্ঞান হবে না। এই ধরণের যাঁরা পুরুষ, যাঁরা সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের জ্ঞান পেয়েছেন, তাঁরা যদি এক হয়ে যান, তাহলে খবরটা কে দেবেন? এটাকেই ভাবমুখ বলে, এটা খুব unusual stage, যেখানে তাঁর পূর্ণ সমুদ্রের জ্ঞান আছে, তার সাথে তাঁর আমিত্বটাও থেকে গেছে। এই জিনিস হয় না, অবতারাদি ছাড়া এ একেবারেই সম্ভব না। একদিকে পুরোটা না মিশে গেলে জ্ঞান হবে না, তার সঙ্গে আবার নিজের আমিত্বটাকেও ধরে রাখছেন। এটাই এখন ঠাকুর বলছেন।

একটা লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক? এগুলো ঠাকুর উদাহরণ রূপে দিচ্ছেন, সচ্চিদানন্দের জ্ঞান যদি আপনি পেতে চান, আপনাকে ডুব দিতে হবে। কিন্তু যেমনি ডুববেন আপনি সচ্চিদানন্দের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবেন; নুনের পুতুল সমুদ্রে নামতেই গলে সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে গেল।

পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ – পূর্ণ জ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন 'আমি'রূপ লুনের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গলে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না। এই ভেদবুদ্ধি জিনিসটা, এটা জগৎকে পরিভাষিত করে। আমি আছি, জগৎ আছে, ঈশ্বর আছেন, এই ধরণের যা কিছু আছে সবটাই ভেদবুদ্ধি। ভেদবুদ্ধি পুরোপুরি না গেলে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে জানা যাবে না। সমস্যা হল, ভেদবুদ্ধি যদি চলেই যায়, তাহলে ফেরৎ এসে আমি কি করে সচ্চিদানন্দের কথা বলব? আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, এক সময় তিনি আমাদের আচার্য ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে তাঁর আচার্যকে একবার বলেছিলেন, মহারাজ, 'সব বইটই পড়ে মনে হয়, রামানুজ আচার্য শঙ্কর পর্যন্ত যাননি, সেইজন্য তিনি এত ভক্তি ভক্তি করেছেন'। শোনার পর তাঁর আচার্য প্রচণ্ড রেগে গেছেন, রেগে গিয়ে বলছেন – রামানুজের যে জ্ঞানের অবস্থা, সেখানে কি তুমি পৌঁছেছ যে, এই রকম কথা বলছ? মহারাজের এই কথাটা মারাত্মক দামী কথা।

আমরা যখন এই জিনিসগুলিকে একটা তুলনামূলাত্মক স্টাডিতে নিয়ে আসি, ভালমন্দের বিচার যখন করি, তার আগে বাস্তবিক আমাদের সেখানে পৌঁছাতে হবে। তা নাহলে সব কথাই হয়ে যাবে – মুখে মারিতং জগৎ। বড় কাঠগোলাতে দেখবেন মেশিন চলে, মেশিনের মুখের কাছে বড় বড় কাঠ লাগিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে যত বড় কাঠ হোক না কেন, চিরে রেখে দেবে। ওখানে মেশিন টানতে থাকে, শুধু লাগিয়ে দিতে হবে। নিন্দুকরা হল এই রকম কাঠ চেরাই করার মেশিন, ওদের যে কোন পার্সোনালিটিকে দিয়ে দিন, চিরে রেখে দেবে। নিন্দুকরা কাউকে ছাড়বে না, তিনি যীশুই হন, বুদ্ধই হন, ঠাকুরই হন, স্বামীজী হন, গান্ধীজী হন, সবাইকে চিরে রেখে দেবে। এরা হল সাধারণ নিন্দুক। যারা উচ্চমানের নিন্দুক, তারা নিজের বাবাকেও ছাড়ে না, নিজের গুরুকেও ছাড়ে না, নিজের ইষ্টকেও ছাড়ে না আর নিজেকেও ছাড়ে না; এরা হল ঠিক ঠিক বড়মাপের নিন্দুক। কারণ এটাই তার identity। সেইজন্য কি হয়, তিনি জ্ঞানের অনেক উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে গেছে, এগুলো আমাদের পক্ষে আলোচনা করা সম্ভব না। ঠাকুর যেমন স্পষ্ট বলছেন, সেই সচ্চিদানন্দ তিনি নিরাকার আবার সাকার রূপেও দেখা দেন। এরপর তো আর কিছু বলার নেই, তত্ত্বের দিক থেকে কোন তফাৎ নেই। এরপর যদি কেউ বলে, নিরাকার শ্রেষ্ঠ, সাকার তার নীচে, এগুলো একেবারেই বোকা বোকা কথা হয়ে যাবে। ঠাকুর বলে দিয়েছেন, সব সংশয় মিটে গেল। উপনিষদ সেটাই বলছেন, ঋষিরা ঈশ্বরকে নির্গুণ রূপেও দেখছেন, সগুণ রূপেও দেখেছেন।

বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়ফড় করে তর্ক করে। শেষ হলে চুপ হয়ে যায়। পার্কিনসন নামে একজন ম্যানেজমেন্ট গুরু ছিলেন। 'Parkinson's law' খুব মজার বই, বইটাতে

তিনি ম্যানেজমেন্টকে খুব ব্যঙ্গ করেছেন। ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারগুলি যাদের জানা আছে, তার বইটা পরে হাসতে থাকবেন। বলছেন, যে কোন বোর্ড মিটিংএ time devoted is universally proportion to its importance, কোন বোর্ড মিটিংএ হয়ত তিনখানা এজেণ্ডা আছে, এখন প্রত্যেকটা এজেণ্ডাতে সময় কত যাবে? বলছেন, যেটা সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, তাতে সময় সবচেয়ে বেশি যাবে; আর যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাতে সবচেয়ে কম সময় লাগবে। উনি তখন একটা উদাহরণ দিচ্ছেন – এনার্জি নিয়ে সরকারের একটা মিটিং হবে, প্রথম এজেণ্ডা অফিসে কফি মেশিন লাগানো, দ্বিতীয় এজেণ্ডা, কর্মচারীদের সাইকেল স্ট্যাণ্ড আর থার্ড এজেণ্ড এনার্জি। কফি মেশিন নিয়ে আলোচনা শুরু হল, কফি সবাই খায় তাই এর উপর সব থেকে বেশি সময় ধরে আলোচনা চলবে। কোথা থেকে মেশিন কেনা হবে, কফি কোথা থেকে আনতে হবে, কিভাবে কেনা হবে। সাইকেল স্ট্যাণ্ড ডিরেক্টলি কানেকটেড না, স্টাফরাই শুধু সাইকেল ব্যবহার করে, আরেকটু কম সময় নিয়ে আলোচনা চলবে। কফি মেশিনে এক ঘন্টা যাবে, সাইকেল স্ট্যাণ্ডে পনের মিনিট যাবে। আর যেটা আসল এজেণ্ডা, যেখানে শত শত কোটি টাকা জড়িয়ে আছে, যে কজন মেম্বার আছেন বেশির ভাগই এ্যটমিক এনার্জির ব্যাপারে বোঝেন না। তাদের বাদে বাকি যারা আছে, তাদের এনার্জির ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। আর একজন যে সত্যিই জানে, সে জানে এই মুর্খদের সামনে আমার মুখ খুলে কোন লাভ নেই, সেইজন্য তিনিও মুখ খোলেন না। যার ফলে আসল এজেণ্ডা দু-মিনিটে পাশ হয়ে যায়। যেটা হাজার টাকার ব্যাপার সেখানে এক ঘন্টা লাগে, আর দশ হাজার টাকার ব্যাপারে পনের মিনিটে হয়ে যায়। যখনই একটা বিষম পরিস্থিতি তৈরী হয়, যেখানে বেশির ভাগ লোকই আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে খুব কম জানে, সেখানে যে সব কিছু জানে সে চুপ করে থাকে। যারাই দেখবেন সোস্যাল মিডিয়ায় বেশি ফটর ফটর করে, আসলে এরা কিছুই জানে না। কারণ সে জানে মুখ খুললে এখন মারামারি লাগবে। তার থেকে বাবা শান্ত থাক।

ব্রহ্মজ্ঞানীদের এটাই হয়, যীশু খ্রীষ্ট যেমনি মুখ খুললেন, দিল ক্রুশবিদ্ধ করে। এই ভুলটা করবেন না – ঠাকুর কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী নন। ঠাকুর অবতার, জ্ঞানী আর অবতারে তফাৎ থাকে। জ্ঞানী হলেন, নীচ থেকে উঠে উঠে একটা স্তরে গেছেন। অবতার হলেন নিজের ইচ্ছায় উপর থেকে নেমে কোন রকমে জগৎকে ধরে আছেন। যেমন স্বামীজী, একজন আচার্য, অবতার শ্রেনীর লোক। এনারা উপর থেকে নীচে নেমে মনটাকে ধরে আছেন। একটা খুব শক্তিশালী গ্যাস বেলুনকে নীচে কিছুর সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখতে হয়, তা নাহলে উড়ে বেরিয়ে যাবে। জ্ঞানীরা সচরাচর মুখ খোলেন না, যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। কিন্তু যিনি অবতার, তিনি বলার জন্যই অবতার হয়ে এসেছেন, সেইজন্য তিনি কথা বলেন।

কলসী পূর্ণ হলে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হলে আর শব্দ করে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ। ঠাকুরের এটা খুব প্রিয় একটা উপমা। **আগেকার লোকে বলত, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না**। কালাপানি মানে আন্দামানের দিকে, ওদিকে সমুদ্র খুব উত্তাল থাকত আর আগেকার জাহাজগুলিও এখনকার মত উন্নতমানের হত না, সেইজন্য ওই জাহাজ অনেক সময়ই আর ফিরে ফরে আসতে পারত না। যাদেরকে কালাপানিতে পাঠাত, তারাও আর ফিরে আসতে পারত না। বিভিন্ন কারণ ছিল, তখনকার দিনে কাউকে আন্দামান পাঠিয়ে দিল মানে, আর সে বাঁচবে না।

আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল (হাস্য)। হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ-অভিমান ভাল। এখানে ঠাকুর 'আমার' শব্দটা আনছেন, এই 'আমার'টা ঠাকুরের আমার না। এটা বলার জন্য যে, আমিও তোমার মত। তোমার যদি বুদ্ধি থাকে, তুমি বুঝে নেবে তিনি তোমার মত নন। মঠে বড়রা যাঁরা আছেন; প্রেসিডেন্ট মহারাজ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ, ওনাদের কাছে গেলে অনেক সময় আমাদের বললেন, 'কি, চা খাবে তো'? এই কথা বলে উনি আমাকে সম্মান দিচ্ছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বলে দিই, 'না মহারাজ'; আমি তাঁকে সম্মান দিচ্ছি। আমরা সাধারণ সাধু, যখন সঙ্ঘে ছিলাম তখন ছিলাম, এখন বড়রা যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকের এ্যসিস্ট্যান্ট

ছিলাম, তখন ওনারও বয়স কম, আমারও বয়স কম ছিল। এগুলো বুঝতে হয়। তিনি যখন বলছেন, তুমিও যা আমিও তাই, তা কখনই না, আমি আলাদা আপনি আলাদা, জাতে আলাদা। ঠাকুর এটা বলছেন – তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ-অভিমান ভাল। অন্য দিকে যদি বলেন, ঠাকুর এই 'ভক্তের আমি' রেখে এই কথাগুলো বলছেন, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে ঠাকুর কখনই এনাদের মতন নয়।

"**ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি সগুণ – একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন। তিনি প্রার্থনা শুনেন**"। এই লাইনটাও খুব মূলবান। গীতার ভাষ্যে ঈশ্বরকে পরিভাষিত করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর ঠিক এই জিনিসটাকেই বলছেন। ঈশ্বর কে? যিনি ভক্তের প্রার্থনা শোনেন। আচার্য শঙ্কর যেটা বলছেন, ঠাকুরও একেবারে হুবহু এক কথা বলছেন – যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি যখন ভক্তের প্রার্থনা শোনেন, তিনি তখন সগুণ সাকার, সগুণ সাকার ঈশ্বর যিনি তিনি ভক্তের প্রার্থনা শোনেন। নির্গুণ নিরাকার প্রার্থনা শোনেন না। কারণ নির্গুণ নিরাকারের ক্ষেত্রে, যে প্রার্থনা করছে, আর যাকে করছে দুটো এক। সক্রিয় অভাব – নিজের উপর কোন ক্রিয়া হয় না, সেইজন্য প্রার্থনাও হবে না। এই কথাগুলো এমনি পড়তে ভাল লাগবে, বাঃ খুব ভাল কথা তো। আমরা যখন নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ বলি, আর যখন বলি ঠাকুর সচ্চিদানন্দ তখন তফাৎ হয়ে যায়। কি তফাৎ? ঠাকুর প্রার্থনা শোনেন, সচ্চিদানন্দ শুনবেন না। কারণ যখন আপনি সচ্চিদানন্দ বোধ নিয়ে আসছেন, তখন আপনি কিন্তু সচ্চিদানন্দের সাথে এক হয়ে যাচ্ছেন। সেইজন্য প্রার্থনা করলে কিছু হয় না। তখন আপনি সমস্ত জগতের মালিক, আপনিই সমস্ত সৃষ্টির কর্তা, পালন কর্তা; সেখানে আপনি কার কাছে প্রার্থনা করবেন, কিসের জন্যই বা প্রার্থনা করবেন? যখন আপনি মনে করছেন, আমি কিছুই না, আমি দাসানুদাস, আমি তাঁর চরণের রেণু; তখন প্রার্থনা করতে পারেন, হে প্রভু, আমি তোমার দাস, তোমার চরণের রেণু, আমাকে কৃপা কর। তিনি অবশ্যই কৃপা করবেন; ওই কৃপাটাও আসলে আপনিই নিজের উপর করছেন, অপরে কেউ করছে না।

তোমরা যে প্রার্থনা কর, তাঁকেই কর। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও–তোমরা ভক্ত। সাকাররূপ মানো আর না মানো এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ থাকলেই হল – যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি। কথামৃতের এই লাইনকটা খুব ভাল করে আণ্ডারলাইন করে রাখা দরকার। শেষে বলছেন – **ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়**।

এই যে কয়েকটা লাইন আণ্ডারলাইন করতে বলা হল; এই কটি লাইন বারবার পড়তে হবে, মনন করতে হবে, তবে গিয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা সম্যক্ ধারণা তৈরী হবে। এরপর কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ঈশ্বর কে? তখন ঠিক এইভাবে ঈশ্বরকে সহজে পরিভাষিত করে দিতে সক্ষম হবেন। ঈশ্বর কে? যিনি প্রার্থনা শোনেন, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, যাঁর অনন্তশক্তি। শঙ্করাচার্য গীতার ভাষ্য লেখা শুরু করে, প্রথম বাক্যেই এটাই বলছেন *স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্ন*। তাঁর যে অনন্তশক্তি, সেটা সব সময় বিদ্যমান। ভগবান কে? যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন। ভাষ্যের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফেই আচার্য বলছেন, *স ভগবান সৃষ্টেদং জগৎ*, সেই ভগবান এই জগতের সৃষ্টি করেন, আচার্য শঙ্করের কথা, কোন অবস্থাতেই এই কথাকে আর না করা যাবে না। কিন্তু লোকেরা কি সব বিচিত্র বিচিত্র কথা বলে, কত বই লেখে, তাতে কি লেখে ভগবানই জানেন। আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরের পরিভাষা হল – তিনি ভক্তের প্রার্থনা শোনেন, কারণ তিনি অনন্ত ক্ষমতাবান। যে ব্যক্তির অনন্তশক্তি, তাঁকে আপনি ব্যক্তি রূপে নিন, সাকার রূপে নিন, মা রূপে নিন, নারী রূপে নিন, পুরুষ রূপে নিন, শিশু রূপে নিন, তাতে কিছু আসে যায় না।

সেই সচ্চিদানন্দকে যেটা দিয়ে আপনি পরিভাষিত করছেন, সীমাবদ্ধ করছেন; সেই সীমাটাই হল সাকার। সীমা কি? অনন্ত শক্তিমান। সচ্চিদানন্দ কি? সৎ, চিৎ ও আনন্দ। যেমনি আপনি বললেন তিনি আনন্দস্বরূপ বা এই ধরণের কিছু বললেন, সঙ্গে সঙ্গে সচ্চিদানন্দ হয়ে গেলেন সাকার। আমরা

সচ্চিদানন্দ বলছি ঠিকই, তিনি সৎ, তিনি আছেন, ব্যস এরপর আর কিছু বলা যায় না। খুব হলে বলা যেতে পারে তিনি অনন্ত – এর বেশি বলা যায় না, এর বেশি যেটাই বলবেন, নির্গুণ নিরাকার থেকে তিনি সগুণ সাকার হয়ে যাবেন। আমরা যখন এই গুণগুলি লাগাই বোঝানর জন্য, আমরা আমাদের অজান্তেই সাকার বানিয়ে দিই। যে কোন গুণ যেমনি চাপিয়ে দেওয়া হল, নির্গুণ নিরাকার সাকার হয়ে যাবেন। তিনি আছেন, ব্যস এটুকু। কিন্তু কেউ যখন জিজ্ঞেস করবে, ভগবান কে, ভগবান কি, তখন তার উত্তর হবে – তিনি অনন্তশক্তিমান, অনন্ত ঐশ্বর্যবান, তারপরে বলতে পারেন অনন্ত জ্ঞানবান, যত খুশি আপনি গুণ লাগিয়ে যান। এরপর আপনি যাঁর সাধনা করছেন, তিনি সেই রূপেই আপনাকে দেখা দেবেন, সেই রূপেই তিনি কৃপা করবেন। ঠাকুর এখানে তিনটে জিনিস বলছেন – সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, অনন্তশক্তি আর প্রার্থনা শোনেন। এই হল ঈশ্বরের পরিভাষা; পরিভাষা ঠিক না, এই জায়গাতে গুণগুলো বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি হলেন অনন্ত গুণনিধান, তাঁর গুণের শেষ নেই। যে গুণের উপর আপনি তাঁর ধ্যান করবেন, তিনি কিন্তু সেই রূপেই আপনাকে দর্শন দেবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ঈশ্বরদর্শন – সাকার না নিরাকার?

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে আছেন। তখনকার ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, ব্রাহ্মভক্তরা বেশির ভাগই ইংরাজী পড়া লোক ছিলেন আর নিজেদের intellectual মনে করতেন। নিজের নিজের কালে এক-এক ধরণের intellectual হয়, বর্তমান কালে অন্য এক ধরণের intellectual। এদের মনে নানান রকমের প্রশ্ন। প্রশ্ন থেকেও বেশি হল বিশেষ ভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা। ঠাকুরকেও অনেক জায়গায় আক্রমণ করার চেষ্টা আমরা দেখতে পাই। এনাদেরই একজন এখন ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায়, দেখতে পাই না কেন? খুবই সাধারণ প্রশ্ন। আগেও এই প্রশ্ন হয়েছে, পরেও অনেকবার এই প্রশ্ন আসবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যতবারই এই প্রশ্ন আসছে, ঠাকুরের প্রত্যেকটি উত্তর একটু আলাদা আলাদা। কারণ যিনি প্রশ্ন করছেন, ঠাকুর তাঁর মন বুঝে উত্তর দিতেন।

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটা খুব simple anyalisis রাখা হচ্ছে। এটাকে যদি কেউ মনে রাখতে পারে, তাহলে ধর্মতত্ত্বের সব কিছু সে বুঝে নিতে পারবে। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, তিনি ভিতরেও আছেন বাইরেও আছেন, তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই আছেন। কোন একটা শক্তির দরুণ বা তাঁর মায়ার দরুণ, কোন ভাবে সেই সচ্চিদানন্দকেই এখন এই জগৎরূপে দেখাচ্ছে। সেখান থেকে কিভাবে কিভাবে আমরা আজ এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের জীবনে একটাই সম্বল, মা-বাবা, ভাই-বোন, টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি কোন কিছুই সম্বল না, সম্বল একটাই, সেটা হল আমার মন। জগতে ভাল কাজ আমরা এই মন দিয়েই করি, মন্দ কাজ মন দিয়েই করি, ঈশ্বরদর্শনও এই মন দিয়েই হয়। মনের স্বভাব – একটা জিনিসকে নিয়ে সে ধরে থাকে। যার জন্য দেখা যায়, যেমন লোকের সঙ্গে থাকছে, মনটাও তার মতন হয়ে যাবে। আগেকার আচার্যরা তাই বারবার, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বলতেন। শাস্ত্র অধ্যয়নও সাধুসঙ্গ; সাধুসঙ্গে মন একটা উচ্চ অবস্থায় থাকে। মন যখন সম্পূর্ণ ভাবে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দেয়, তখনই ঈশ্বরদর্শন হয়।

আমরা যতই এই আলোচনা করি না কেন, কিন্তু ঘুরে ফিরে আমাদের সব সময় এটাই মনে হবে যে, ঈশ্বর উপরে কোথাও আছেন, সামনে কোথাও আসছেন আর যে রকম আমি আপনাকে দেখছি, সেইভাবেই আমরা ঈশ্বরকে দেখি; এগুলো একেবারেই ভুল চিন্তা। ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, কিন্তু একটা পর্দার আড়াল দেওয়া আছে। মনটাই সেই পর্দা। পর্দার ওই দিকটা চৈতন্য, মনের

এই দিকটাও চৈতন্য। মনের দু দিকেই চৈতন্য। ওই পর্দাটা যদি পড়ে যায়, তখন দুটো মিলে এক হয়ে যায়। দুটো মিলে এক হয়ে যাওয়াটাই হল ঈশ্বরজ্ঞান।

আমরা যখনই ঈশ্বরদর্শন নিয়ে আলোচনা করি, তখন বেশির ভাগ লোকেদের মনে হয় ম্যাজিকালি ঠাকুর আমাদের সামনে এসে যাবেন। ভিতরে শক্তি নেই কিনা, বেশির ভাগ মানুষই ইমোশানাল, কারণ শক্তি না থাকলে মানুষ সব ক্ষেত্রে ইমোশানাল হয়ে পড়ে। বাচ্চাদের দেখবেন, এই হাসছে, এই কাঁদছে; এরা ইমোশানাল, কারণ ভিতরে শক্তি নেই। যেমন যেমন বড় হয়, তেমন তেমন শক্তি বাড়ে, তেমন তেমন নিজের ইমোশানের উপর নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি আসে। ভক্ত মানেই, বেশির ভাগেরই ইমোশানের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। একটুতেই লাফাবে, আর যাকে পাবে তাকেই বলবে, তার এই দর্শন হয়েছে, সেই দর্শন হচ্ছে। আমার সঙ্গে এইসব কথা কেউ বলতে এলেই আমি বলে দিই, আগে একজন ভাল ডাক্তার দেখান।

আবার বলবে, ঠাকুরেরও তো দর্শন হত। এরা জানে না যে যাঁদের দর্শন হয় ভগবান তাঁদের এই ক্ষমতাটা দিয়ে দেন – যেখানে সেখানে লোকেদের নিজের দর্শনের কথা না বলার ক্ষমতা। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যারা গুলি চালানোর ট্রেনিং নেয়, তেমন তেমন তাদের এই ট্রেনিংটাও দেওয়া হয়, যেখানে সেখানে গুলি চালিয়ে দিও না। অন্য দিকে সন্ত্রাসবাদীরা যেখানে সেখানে গুলি চালাতে থাকে। ক্যারাটে যারা শেখে, যেমন যেমন তারা বিদ্যাটা আয়ত্ত করে, তেমন তেমন তার ক্ষমতা আসে নিজের শক্তিকে ধরে রাখার। যাদের এই শক্তি ধরে রাখার ক্ষমতা নেই, তারা যেখানে সেখানে মারামারি করে বেড়ায়। যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত, যাঁদের সত্যিকারের ঈশ্বরদর্শন হয় বা দেবীদেবতার দর্শন হয়, সাধনার অবস্থাতেই ভগবান তাঁদের সেই শক্তিটা দিয়ে দেন, যাতে ওটাকে তিনি ধরে রাখতে পারেন।

একটা সেন্টারে একজন বুড়িমা একটা পাঁচ টাকার নোট সবাইকে গিয়ে দেখাচ্ছে। তখনকার দিনে পাঁচ টাকার অনেক দাম। সবাইকে টাকাটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'আচ্ছা এই ডোনেশানটা কোথায় দেব? সবাই জেনে গেল বুড়িমা পাঁচ টাকা ডোনেশান দিচ্ছে'। দেওয়ার সময় দেখা যাবে হয়ত আট আনা দিচ্ছে। যখনই লোক দেখানোর ব্যাপার হয়, বুঝতে হয় ভিতরে কিছু নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ–হ্যাঁ, অবশ্য দেখা যায়–সাকাররূপ দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন করে? খুব interesting। কারণ ঠাকুরকে যখনই কেউ নিষ্ঠার সাথে, সরল ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করছে; যেমন থিয়েটারওয়ালারা জিজ্ঞেস করছে, তিনি ব্যাখ্যা করছেন – ঈশ্বরদর্শন কিরূপ। এখানে প্রশ্নকর্তা ফ্রীলান্স প্রশ্ন করছে। যেখানে যা হল তাই নিয়ে ফ্রীলান্সিং ডিসকাসান করতে শুরু করে দেবে। একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আচ্ছা এই ব্যাপারে আপনার কি মত? তুমি নিজে এই ব্যাপারে কিছু জান যে তাঁকে প্রশ্ন করছ? বিশেষ করে এখন সাইবার ওয়ার্ল্ড এসে গিয়ে সবারই সব বিষয়ের উপর সমস্ত জ্ঞান হয়ে গেছে। আজকেই সকালে আমার কাছে একজন এসেছিল। কোথা থেকে আসছে জানি না, আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোকের বেদ নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে, মনুস্মৃতি নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে। বললাম, 'দুটো বইয়ের একটা বইও কি আপনি পড়েছেন'? বলল, 'না, বই কিনেছি, এবার পড়ব'। এ-সব লোকের সঙ্গে আমি কি কথা বলব! দু মিনিটের মধ্যে তাকে বিদায় করতে হল। ওই ভাসা ভাসা কিছু শুনেছে, আমাদের যে এত লেকচার আছে সেগুলোও শুনেনি।

একদিন এক ইউনিয়ন লীডার এসে হিন্দু ধর্ম, সেকুলার, লিবারাল এগুলোর উপর বড় বড় কথা আমাকে বলতে শুরু করেছে। আমি খুব রেগে গিয়ে বললাম, 'ভাই হিন্দু ধর্ম নিয়ে তুমি কি বই পড়েছ? অন্তত একটি বইয়ের নাম বল। হিন্দু ধর্মের উপর আমারই তিনখানা বই লেখা হয়ে গেছে'। আমি তাকে বললাম, 'তুমি আমাকে চেন, আমার লেখা কোন বই তুমি পড়েছ'? এই হল ফ্রীলান্স, যেখানে যেমন সেখানে সেই রকম আলোচনা করছে। এখানে এই ভক্ত ঠিক সেই রকম। কোথাও শুনেছে ঈশ্বরদর্শন হয়, কালীদর্শন হয়।

ব্রাহ্মভক্ত–কি উপায়ে দেখা যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ–ব্যাকুল হয় তাঁর জন্য কাঁদতে পার? আমরা যে আলোচনা দিয়ে শুরু করলাম, চৈতন্য, চৈতন্যের মাঝখানে মন হল পর্দা। এই মনকে ফেলা দরকার। মনকে কিভাবে ফেলবেন, এটা পুরোপুরি আপনার ব্যাপার। যোগ একটা পদ্ধতি শেখাচ্ছে, ভক্তিমার্গে অনেকগুলো পথ দেখাচ্ছে। নারদীয় ভক্তিসূত্রে দেবর্ষি নারদ কয়েকজন ঋষির কথা বলছেন, যাঁরা ভক্তির পথ অবলম্বন করে মহাপুরুষ হয়ে গেছেন। ঋষিরা জ্ঞানমার্গের, যেখানে ওনারা নিত্য ও অনিত্যের বিচার করে অনিত্যকে ফেলে নিত্যে প্রতিষ্ঠিত হতেন। নিত্য পাওয়া না, ঈশ্বরকে তো পাচ্ছে না, ঈশ্বর তো রয়েছেন; বাধাগুলিকে সরিয়ে দেওয়া। কর্ম যখন করা হয়, বৈদিক কর্ম বলুন; স্বামীজী সেবাকর্মের কথা বলেছেন, সেবাকর্মই বলুন, কর্ম করলে স্বার্থপরতার ভাবটা কমে যায়। স্বার্থপরতা কমতে কমতে মন এত শুদ্ধ হয়ে যায় যে, 'আমি'র লেশমাত্র থাকে না। পরে ঠাকুর যে আমিত্বর কথা বলবেন, সেই 'আমিত্ব' হল স্বার্থ। স্বার্থ যখন থাকে না, তখন ঈশ্বরকে দেখা যায়। যিনি সাধনা করছেন, তিনি কিভাবে ঈশ্বরকে দেখবেন, এটা বলা অসম্ভব। কারণ পর্দাটা মোটা পর্দা, পর্দাটা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পর্দা থাকবে। 'আমিত্ব' হল সেই পর্দা, যার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরকে দেখবেন। সেইজন্য দুজনের ঈশ্বরদর্শন কখনই এক বা সমান হবে না।

ব্যাকুলতা জিনিসটা একমাত্র ভাগবত ছাড়া আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে সেই ভাবে কোথাও নেই। ভাগবতে যেখানে রাসলীলার বর্ণনা করছেন, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে খেলা করছেন, খেলা করতে করতে হঠাৎ গোপীদের মাঝখান থেকে তিনি উধাও হয়ে গেলেন। গোপীরা তখন শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ছটফট করছেন, ব্যাকুল হয়ে কখন মৃদু স্বরে, কখন উচ্চস্বরে গান করছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে করছেন কিনা আমরা জানি না। কিন্তু যাঁরা ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকেন, তাঁরা ঠিক এভাবেই আচরণ করেন। আমাদের ঠাকুরের যে সাধনা, ঠাকুর নিজের মুখে তাঁর সাধনার বর্ণনা করছেন, একেবারে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, সেখানে আমরা দেখছি, তিনি ঠিক এইভাবে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। ব্যাকুলতা দিয়ে গোপীদের যে সাধনা, ঠাকুরেরও ঠিক একই সাধনা। যারা অন্য কিছু পারছে না, রাজযোগ পারছে না, জ্ঞানযোগ পারছে না, ভক্তির আদর্শ নিতে পারছে না, কোনটাই পারছে না, তাদের ঠাকুর বলছেন, ব্যাকুল হয়ে কাঁদো।

আমাদের মুশকিল হল, আমরা যখন সাধনা, ঈশ্বর, এই কথাগুলো বলি; সবটাই আমাদের মুখের কথা। আমাদের পূজ্যপাদ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ একবার আমাকে বলেছিলেন – We believe that we believe in God। আসলে বলতে চাইছেন, আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। মানুষ যখন কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করে, তখন তার একটা বিশ্বাস চাই – আমি এটা পাব। সেইজন্য গুরু কি করেন? গুরু জানেন এর তো বিশ্বাস নেই, শাস্ত্রও জানে এর বিশ্বাস নেই। কিন্তু কোন দিন বিশ্বাস এসেও যেতে পারে। কিন্তু যখন বিশ্বাস আসবে, তখন তো অনেক দেরী হয়ে যাবে। সেইজন্য গুরু মন্ত্র দিয়ে বলে দেন, সকাল বিকাল ঠাকুরের নাম করবে। তাতে ধরে রাখা হল। মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন বলেই যে আপনার ঈশ্বরদর্শন হয়ে যাবে, তা কখনই হবে না। মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন বলেই যে আপনার ব্যাকুলতা হবে, তা কখনই হবে না। কিন্তু কি করে? একটা প্রস্তুতি এনে দেবে। যখন ব্যাকুলতাটা এসে গেল, তখন আর আপনাকে চারিদিকে দৌড়াতে হবে না। এর কাছে যাব, ওর কাছে যাব, কোথায় যাব, কার কাছে যাব – এই জিনিসটা হবে না। তখন তার মনে হবে, আরে এই জিনিস তো চিরদিন আমার কাছেই ছিল; তখন নিজের উপর হাসি পাবে। আমার কাছে এতদিন ছিল, কিছুই তো করলাম না; এটা পুরোপুরি অন্য জিনিস। যদি কেউ সত্যিই ঈশ্বরকে চায়, স্বাভাবিক ভাবেই সে ব্যাকুল হয়ে যাবে। ঠাকুর যে এখানে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে বলছেন, কোন নূতন পথ যে দিচ্ছেন তা না; এটাকেই যে একমাত্র পথ বলছেন তাও না। কান্নার কথায় ঠাকুর এরপর আবার বলছেন।

লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, একঘটি কাঁদে। কারণ এগুলো তার বাস্তবিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী। যেটা দিয়ে আমার জীবন চলছে, সেটা ছাড়া আমি কি করে থাকব! একজন লোক সংসারে আছে, তার মন সংসারে ডুবে আছে, তার স্ত্রী লাগবে, তার সন্তান লাগবে, তার টাকা লাগবে – কি করে সে এটাকে ছেড়ে থাকবে। যদি সে দেখে এই জিনিসগুলো তার হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার অস্তিত্বটাই চলে যাবার উপক্রম হবে, তাকে তাই এগুলোকে ধরতে হয়। অন্যরা তার কান্নাকাটি দেখে যে হাসবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, আমরাও কম বয়সে এই রকম কাউকে কাঁদতে দেখলে হাসি পেয়ে যেত, তখন আমাদের বুদ্ধি কম ছিল। এখন বুঝি মানুষের কত কষ্ট, সংসারীদের স্ত্রী, সন্তান, টাকা এগুলো তার শরীরের অঙ্গ। সংসারে এদের একটা কিছু হলে মনে হয় যেন শরীর অঙ্গ কেটে যাচ্ছে।

যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাড়ির কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না–চুষি ফেলে চিৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়দুড় করে এসে ছেলেকে কোলে লয়। এই যে ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন, ছেলে, মা, রান্না, চুষি; এগুলো শুনলে আমাদের অনেক সময় মনে হয় ভগবান যেন বাইরের কেউ একজন, তিনি যেন একজন ব্যক্তি, কিন্তু ভক্তিমার্গে এই উপমাগুলি বোঝানর জন্য বলা হয়। যখন ওই টানটা আসে, তখন সব কিছু উড়ে যায়।

হিন্দুদের যে বর্ণাশ্রম ধর্ম, তাতে হিন্দু ধর্মে একদিকে উচ্চতম ঋষিরা রয়েছেন, যাঁরা ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ছেড়ে দিয়েছেন। অন্য দিকে পূজারী ব্রাহ্মণরা আছেন, যাঁরা বেদমন্ত্র দিয়ে পেট চালাচ্ছেন। ঋষি আর এই পূজারীদের মাঝখানে একটা নূতন জাত এসে গেল, এনারাই হলেন ঠিক ঠিক ব্রাহ্মণ বর্ণের; যাঁদেরকে বেদের বিদ্যাটা দিয়ে দিচ্ছেন। এনারা ঋষিও নন, পূজারীও নন। পূজারীদের মত তাঁরা অর্থোপার্জনের জন্য বেদ অধ্যয়ন ও বেদচর্চা করছেন না, আর ঋষিদের মত যে উন্নত, তাও না। এনারাই বেদের বিদ্যাটাকে ধরে রেখেছেন। আজকে যে আমরা হিন্দু ধর্ম পাচ্ছি, এই শ্রেনীর ব্রাহ্মণদের জন্যই পাচ্ছি। এনারা ধর্ম-সংস্কৃতিকে ধরে আছেন, সাধনা করছেন, স্বাধ্যায় করছেন, করতে করতে কোন একজনের মধ্যে এই ব্যাকুলতটা এসে গেল। এরপর তিনি একজন বড় ঋষি হয়ে গেলেন।

এখনও অনেক বাড়িতে, বিশেষ করে গ্রামদেশের বাড়িগুলিতে ধর্মের একটা সংস্কৃতি দেখা যায়। সন্ধ্যে হয়ে গেলে শাঁখ বাজাচ্ছে, ধূপ দিচ্ছে, নিত্য একটু গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ করছে, এগুলো হল ধরে রাখার জন্য। হিন্দুরা পুরো একটা জাতিকে এতেই উৎসর্গ করে দিলেন। লোকেদের যখন জ্বালা-যন্ত্রণা হবে তোমার কাছে আসবে, তুমি তাদের দুটি ধর্মের কথা বলে দিও, ওতে যতটুকু হওয়ার হল। এখন এই কাহিনীগুলো যে বলা হয়, লোকেদের বোঝানর জন্য। কারণ এখনও তত্ত্ব কথা নেওয়ার প্রস্তুতি এদের হয়নি। গীতা, উপনিষদ যদি পড়েও থাকে, কিন্তু ওর মধ্যে ঢুকে যে নিজের মত করে নেবেন, সেই ক্ষমতাটা এদের এখনও হয়নি। এগুলো বোঝানর জন্য বলা, যেমনি তোমার ব্যাকুলতা আসবে, তখন তোমার আর কিছু ভাল লাগবে না, শুধু ঈশ্বরকে চাই। আর এই ব্যাকুলতাটা ইমোশানালিজম্ নয়। ইমোশানালিজমে কি হয়, কিছু একটা পড়ল, বা কোন কথা শুনল, বা কিছু একটা হল আর হঠাৎ মনটা চার্জড হয়ে গেল – আমাকে এটা করতেই হবে। বাচ্চারা যেমন নূতন একটা কিছু দেখল, এখন তাকেও ওটাই করতে হবে। হঠাৎ যেটা মনে ঢুকে গেল, ওটাই তাকে এখন করতে হবে। দুটো কথা শুনে নিলাম, শুনেই তেতে উঠলাম। এবার দেখুন ব্রাহ্মভক্ত ঈশ্বরের উপর কৌতুহল থেকে সরে এসে পুরোপুরি অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন।

ব্রাহ্মভক্ত – মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন? কেউ বলে সাকার – কেউ বলে নিরাকার – আবার সাকারবাদীদের নিকট নানারূপের কথা শুনতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন? এই একটি শব্দ 'এত গণ্ডগোল কেন', এতেই বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোকের কোন ধারণা নেই। শুধু যে ধারণা নেই তা

না, শ্রদ্ধাও নেই। কালী, শিব, কৃষ্ণ, এনাদের যাঁরা মানছেন, অর্চনা করছেন, এগুলোকে যদি 'গণ্ডগোল' বলেন, তাহলে বুঝুন আপনি কি অবস্থায় আছেন। যে জিনিসগুলিকে নিয়ে হিন্দুরা হাজার হাজার বছর ধরে একটা ধর্মীয় জীবন চালিয়ে আসছেন, যে আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বিদেশীদের, বিধর্মীদের এত আক্রমণ, এত আপদ-বিপদ সহ্য করে এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাকে কিনা বলছেন, 'এত গণ্ডগোল কেন'।

শ্রীরামকৃষ্ণ – যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। মাণ্ডুক্যকারিকাতে বলে, *যং ভাবম্ দর্শয়েৎ যস্য*, গুরু যাকে যেমন ভাব দেখিয়ে দেন, তেমন ভাব নিয়েই সে সব কিছু দেখে। আমরা আগে আলোচনা করলাম, কিভাবে চৈতন্য ওইদিকে চৈতন্য এইদিকে, মাঝখানে মনের পর্দা। মনের যে চেতনা, অর্থাৎ এদিকে যে চৈতন্য, তার জন্যই হয়। এখন আপনার বাড়ির পরম্পরা, আপনার গুরুর কাছ থেকে উপদেশ শুনে বা যে কোন ভাবে আপনার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছে, শিবকে ভালবাসা, বা কালীকে ভালবাসা, যাঁকেই হোক একজনকে ভালবাসছেন। আপনি যখন ওই জিনিসটাকে নিয়েই আছেন, ভগবান যিনি তিনি অনন্ত, তিনি ঠিক সেই রূপেই আপনাকে দর্শন দেবেন। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরের মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন, ঠাকুরের মন্ত্রজপ করছেন, ধ্যান করছে; যিনি ঈশ্বর তিনি আপনাকে ঠাকুর রূপেই দর্শন দেবেন। তিনি চাইলে অন্য রূপেও দর্শন দিতে পারেন, এগুলোকে নিয়ে অনেক কাহিনীও আছে। কারণ তিনি হলেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনি অনন্ত, যেভাবে খুশি তিনি আমাদের সামনে আবির্ভূত হতে পারেন। আপনি তাঁর একটা রূপ বা ভাব নিয়ে আছেন; সেখানে তিনি অন্য রূপে বা অন্য ভাব এনে আপনার গোলমাল পাকাতে চাইবেন কেন?

স্বামীজী ঘন্টাকর্ণের গল্প বলতেন। শিব আর বিষ্ণুর যে লড়াই, অনেক পুরনো লড়াই, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে শিব আর বিষ্ণুর লড়াইকে কেন্দ্র করে বিবাদ-বিতণ্ডার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ঘন্টাকর্ণ ধূপধুনো দিচ্ছে, ধূপের গন্ধ তার ইষ্ট শিবের নাকেও যাচ্ছে, আর বিষ্ণুর নাকেও যাচ্ছে। কারণ সেখানে তিনি শিব ও বিষ্ণু দুজন হয়ে গেছেন। সেইজন্য শিবের ভক্ত উঠে গিয়ে বিষ্ণুর নাকে তুলে গুজে দিল যাতে ধূপের গন্ধ না যায়। তার মানে, তিনি যদি দর্শন দেন, যদি দেখিয়েও দেন, ভক্ত মানবে না। ঠাকুর পরে মহাবীর হনুমানের কথা বলবেন। আমার আপনার সবারই সঙ্গে এই ব্যাপারটা আছে। ইসলাম ধর্মে দেখুন, খ্রীশ্চান ধর্মে দেখুন, ভগবান বুদ্ধের কথায় দেখবেন, সব কটার ক্ষেত্রে সেই একই যুক্তি থাকে – তিনি সাধনা কাকে নিয়ে করেছিলেন। অবশ্যম্ভাবি দেখা যাবে যে, তাঁর সাধনা যেটাকে নিয়ে, আর পরে তিনি যখন উপদেশ দিচ্ছেন, সেটাকে নিয়েই দিচ্ছেন, এর কোন ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যাবে না। এই যে চারিদিকে যে বিভিন্ন মতের কথা বলা হয়, একবারও তারা ভেবে দেখে না যে, বিভিন্ন মতের পিছনে মতান্তর যেটা হচ্ছে, এটা তত্ত্বের জন্য হচ্ছে না, হচ্ছে মনের জন্য। তত্ত্বের মধ্যে কোথাও কোন অন্তর নেই, অন্তরটা রয়েছে মনে।

এটাই ঠাকুর এবার বলছেন। **বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোনরকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তাহলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন**। আসলে সবটাই এক কিনা। আমাদের সমস্যা একটাই, কোন কিছুতেই সাধনা নেই। একবার একজন আমাকে কি একটা কথা বলছিল, আমি বললাম, 'বাবা, তুমি কোনটার সাধনা করেছ'?

সে পাড়াতেই গেলে না – সব খবর পাবে কেমন করে? এটাই হল আমাদের আসল দুর্ভাগ্য। মাঝে মাঝে বাসে-ট্রেনে যেতে লোকেরা বলাবলি করছে শুনতে পাই – আমি তো মনে করি সব ধর্মই সত্য। আপনি মনে করেন সব ধর্ম সত্য? কোন ধর্মের সাধনা আপনি করেছেন? এরপর ঠাকুর একটা গল্প বলছেন, খুব নামকরা গল্প।

একটা বহুরূপী সরিসৃপ, গিরগিটির জাতীয়, তার কথা বলছেন। একটা গাছে গিরগিটি দেখতে পেয়ে একজন বলল সবুজ রঙ, আরেকজন দেখে এসে বলল লাল রঙ। সেই গাছের তলায় একজন

থাকেন। শেষের দিকে বলছেন, ''**আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি – তোমরা যা যা বলছ সব সত্য – সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল আরও সব কত কি হয়। বহুরূপী। আবার কখন দেখি, কোন রঙই নাই। কখন সগুণ, কখন নির্গুণ**''। এই যে একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, intitutive knowledge, যাতে তিনি বিভিন্ন রঙেও দেখছেন আর তার সঙ্গে দেখছেন কোন রঙই নাই, এই জিনিস তখনই হবে, যখন আপনি ওটার সাথে চব্বিশ ঘন্টা লেগে থাকছেন। আমরা যখন হিমালয়ে বেড়াতে যাই, তখন অনেক হিসেব করে যাই। আবহাওয়া যেন ঠিক থাকে, সব রাস্থা যেন খোলা থাকে, থাকা-খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা যেন থাকে। সেখানে গিয়ে বলছি, 'ওই যে ছবিতে দেখা যায় পুরো বরফ আর বরফ, সেটা কোথাও দেখছি না তো'। পাহাড়ে যদি থাকেন, তাহলে সবটাই দেখতে পারবেন। এক বছর থাকলেও হবে না, বছরের পর বছর থাকতে হবে। সেই ভগবানের চেতনাতে যিনি সব সময় ডুবে আছেন, তিনি দেখতে পান, কখন এই ভাব, কখন ওই ভাব। একটা লোকের ব্যাপারে জানতে হলে, তা সে ভাল হোক, মন্দ হোক, পুরোটা তার সঙ্গে থাকতে হবে, তা নাহলে লোকটিকে বোঝা যাবে না। এটাই ঠাকুর বলছেন। সেইজন্য যারা ভাসা ভাসা বলে দিচ্ছে, ঈশ্বর এই রকম, এ-ভাবে কখনই বলা যায় না।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে সেই বলতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? তা নাহলে বলা যায় না। বইয়ে দুটো কথা পড়ে, বাইরে দুটো কথা শুনে হয় না। **সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন – তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ – আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোক কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়**। স্বামীজীও এই কথা বারবার বলতেন, ঈশ্বরকে নিয়ে তুমি যখন কথা বলছ, বিশেষ করে যখন বিবাদ করছ, এগুলো করার আগে একবার ভেবে দেখো – তোমার কি ঈশ্বরদর্শন হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এটা নিয়ে তোমার বিবাদ করার কি অধিকার আছে? সারা বিশ্বে তাকিয়ে দেখুন, চারিদিকে কেমন একটা অসহিষ্ণুতার ভাব এসে গেছে। এ তাকে সহ্য করে না, সে তাকে সহ্য করে না। এ বলে আমার ধর্ম বড়, সে বলে তার ধর্ম বড়, তোমার ধর্ম কিছুই না। তোমার কি ঈশ্বরজ্ঞান হয়েছে? তোমার কি কালী বা শিবের দর্শন হয়েছে, তোমার কি আল্লা বা গডের দর্শন হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, ঈশ্বরকে নিয়ে বলার তোমার কি অধিকার? না, আমার ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে। সে তো আমার ধর্মগ্রন্থে অন্য রকম লেখাও আছে। তাহলে এখন উপায় কি? দুজনে বন্দুক বার করে ফয়সালা করে নাও। ধর্মকে নিয়ে এটা কি কোন আলোচনা হল?

কবীর বলত, 'নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা'।

ভক্ত যে রূপটি ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন – তিনি যে ভক্তবৎসল।

ভক্তি নিয়ে, ভক্তিশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, তাঁরা জানবেন, সেখানে অনেকে খুব সুন্দর সুন্দর গল্প বলছেন। সেখানে এই জিনিসের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। ভক্ত যেখানে সত্যিকারের একটা রূপ দেখছেন, হঠাৎ তাঁর মনে হবে, আরে আমি তো এই রূপে দেখতাম, তিনি ভক্তকে সেই রূপে দেখা দেন। আমাদের ভিতরে যিনি চৈতন্য, যাঁকে আমরা অন্তর্যামী বলি বা জীবাত্মা বা অন্য যে রূপেই বলে থাকি, তিনি আমাদের মনকে চেতনা দিয়ে রেখেছেন। ওই চেতন মন দিয়ে সেই চৈতন্যকে যখন জানার চেষ্টা করছি, তখন মনের যেই ভাব সেই ভাব দিয়ে চৈতন্যকে দেখার চেষ্টা করি। এটা কোন ভাবেই কল্পনা না; কল্পনা আর ঈশ্বরদর্শনে বিরাট তফাৎ। কল্পনা হলেই পরে আপনার সন্দেহ এসে যাবে, আরও অন্যান্য অনেক রকমের গোলমাল হবে। ঠিক ঠিক ঈশ্বরদর্শন যখন হয়, তখন ওখানে আর কোন রকম সন্দেহ হবে না। আগুনে যদি হাতে একবার ছ্যাঁকা লাগে, এরপর যতই বলা হোক, আগুন শীতল, বিশ্বাস হবে না।

পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি রামরূপ ধরেছিলেন। এগুলো আবার বর্ণনা, ঠাকুর গল্প রূপে বলছেন। ভাগবত পুরাণে অন্য একটা কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববানের যুদ্ধ, খুব নামকরা কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণ আর জাম্ববানের যুদ্ধ হয়েছে, সেই যুদ্ধ আর থামতে চায় না। কৃষ্ণ দেখছেন, এভাবে যুদ্ধ হলে যুদ্ধ চলতেই থাকবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখালেন, তিনিই সেই রাম। এবার রামরূপ দেখে জাম্ববান সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এলেন। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিদ্যমান, ভক্ত যেমনটি চাইবেন, সেই রূপে তিনি তাঁকে দর্শন দিতে পারেন। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়, তা হল – আপনি যে রূপ ভালবাসেন, যে রূপ নিয়ে সাধনা করেছেন, সেই রূপটাই তিনি আপনাকে দেখাবেন। তার মানে এই অর্থ না যে, তিনি অন্য রূপে আসতে পারেন না; যদি না আসতে পারেন, তাহলে তিনি ঈশ্বর নন। তিনি আসতে পারেন, আসেন, কিন্তু কারুর ভাব তিনি নষ্ট করেন না। এখানে ঠাকুর ভক্তিমার্গে সাকার দর্শনের বর্ণনা করলেন, সেখান থেকে এবার তিনি জ্ঞানমার্গে নিরাকারে বা অরূপে কি হয় বলছেন।

বেদান্ত-বিচারের কাছে রূপ-টুপ সব উড়ে যায়। সে-বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই – ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। এখানে 'মিথ্যা' শব্দটা বুঝতে হবে, এই 'মিথ্যা' মায়া, বেদান্তে এই শব্দগুলির একটা বিশেষ অর্থ হয়। খুব সাধারণ ভাবে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন, মায়া শব্দের অর্থ কি? উত্তরদাতা অবশ্যই এটা বলবে – যেটা আমাকে মুগ্ধ করে দেয়, যেটা ভুলিয়ে দেয়। মায়া শব্দের অর্থ একেবারেই তা নয়। মায়া একটা টেকনিক্যাল শব্দ, এর একটা বিশেষ অর্থ আছে, 'মিথ্যা' শব্দেরও একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। তেমনি 'স্বপ্নবৎ' এরও একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে।

অর্থ কি রকম? আমাদের মন একটি ভাব নিয়েই থাকে, মন কখনই এক সঙ্গে দুটো ভাব নিতে পারে না। মন কোন একটা ভাবকে নিয়েই চলে। সোনাকে আপনি গয়না বানিয়ে দিলেন। সোনা এখন কানের দুল হয়ে গেল বা গলার নেকলেস হয়ে গেল বা অন্য কিছু হয়ে গেল। আমরা তখন ওই রূপটা দেখি, যার একটা নাম আছে। যে কোন রূপ থাকলে তার একটি নাম হবে। রূপের সব সময় নাম থাকবে, রূপ থাকলেই তার একটি নাম আসবে। কিন্তু সোনা জিনিসটা নাম-রূপের বাইরে। আমরা যখন গয়না দেখি তখন সোনা দেখি না, যখন সোনা দেখি তখন গয়না দেখি না। আমরা সমুদ্র যখন দেখি তখন ঢেউ দেখি না, আর যখন ঢেউ দেখি তখন সমুদ্র চোখের নজরে আসে না। এটা বলা সহজ, কিন্তু যেখানে সমুদ্র আছে সেখানে সবাই ঢেউই দেখে, সমুদ্র দেখে না। এই যে নাম আর রূপ; ছোট ঢেউ, বড় ঢেউ, উত্তাল ঢেউ, শান্ত ঢেউ, এটা হল নাম আর রূপ – কানের দুল, নাকছাবি, আঙটি, নেকলেস, এগুল সব নাম আর রূপ। বেদান্ত বলছেন, এই নাম আর রূপটা মিথ্যা। মিথ্যা মানে হল – যার জন্ম হয়েছে, তার নাশ হবে। যে কোন জিনিস, তার একটা উৎপত্তি আছে, তারপর একদিন তার নাশ হয়ে যাবে। কানের দুল, আঙটি, এগুলো যা দেখছি, এগুলো কেউ একজন বানিয়েছে, ফলে নাম আর রূপে এসে গেল। অবতার পুরুষ, ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে দেখছেন, সেই সত্য সনাতন ব্রহ্ম, অনন্ত চৈতন্য, সেখানে নামরূপের ঢেউ। সেই নামরূপের ঢেউয়ে, একটা আমি, একটা আপনি, একটা তিনি সবাই আছি। নাম-রূপটা মিথ্যা। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই একমাত্র সত্য, এটাই এখানে বলছেন।

বেদান্তবাদীরা যখন সব কিছু বাদ দিতে শুরু করে, তখন তাদের কাছ থেকে নাম-রূপ সব উড়ে যায়, কোন রূপই থাকবে না। তাহলে সাধনা কিসের করছে? এমনিতে আমরা যখন সাধনা করি তখন একটা ভাবকে আলম্বন করে সাধনা করছি, তাঁরা এই ভাবটাই রাখেন – আমি কোন ঢেউতে নেই, আমি কোন নাম-রূপে নেই। তাঁদের কাছে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ এক মহাপুরুষ, তার বেশি কিছু না। কোন নাম-রূপ নেই, এমনকি নিজের যে নাম-রূপ সেটাকেও উড়িয়ে দিচ্ছেন।

ঠাকুর এরপর বলছেন, **যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপদর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ সম্ভব হয়**। কথামৃতের এই লাইনটাকে আণ্ডারলাইন করে রাখার মত, খুব important line। ঠাকুর যে কথা বলতে চাইছেন, আমরা যার উপর ব্যাখ্যা করছি, এই লাইনটা

হল তার কেন্দ্রবিন্দু। ''যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান'', অভিমান হল 'অহং', 'অহং' বলতে অহঙ্কার না, আমিত্ব ভাব; এই বোধ আছে যে 'আমি ভক্ত', ততক্ষণই ঈশ্বর সেই রূপে দেখা দেন। আমিত্ব যখন নাশ হয়ে যাবে, তখন ওই রূপটারও নাশ হয়ে যাবে। যিনি রামের ভক্ত, ভগবান তাঁকে রাম রূপেই দর্শন দেবেন। স্বামীজী এত কিছু বললেন, কিন্তু ঠাকুরকে নিয়ে খুব বেশি কিছু বলতেন না। খুব আপনজন যাঁরা, তাঁদের ছাড়া বাইরে তিনি ঠাকুরকে নিয়ে কথা বলতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্দেহটা থাকছে। ঠাকুরের নিজে স্বামীজীকে বলতে হচ্ছে, যে রাম যে কৃষ্ণ ইদানিং সেই দেহে রামকৃষ্ণ। এই কথা ঠাকুরকে আর কাউকে বলতে হয়নি। পরেও কিন্তু স্বামীজীর সন্দেহ হচ্ছে, আচ্ছা ঠাকুর কি সত্যিই অবতার? ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, হ্যাঁ, আমি অবতার। এই ব্যাপারটা কোথাও মনের মধ্যে থেকে যায়। ঠাকুরও অনেকবার স্বামীজীর নামে বলছেন, ওর অখণ্ডের ঘর। যাঁর অখণ্ডের ঘর, তিনি হলেন বেদান্তী, অদ্বৈতবাদী। তাঁদের কাছে রূপটুপ থাকে না। ঠাকুর পদে পদে দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমি সত্য। স্বামীজী যে মানছেন না, তা না, কিন্তু অখণ্ডের ঘর কিনা, অবতারকে নিতে গিয়েই আবার ডুবে যাচ্ছেন। প্রথমের দিকে কথামৃতে দেখবেন, মাস্টারমশাই যখন এসেছেন সেই সময় ঠাকুর ভাবসমাধিতে ডুবে যাচ্ছেন। মাস্টারমশাই কিছু কথা বলছেন, ঠাকুর কোন রকমে উত্তর দিচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য সময়ে ঠাকুর কথা বলেই যাচ্ছেন। যাঁরা অখণ্ডের ঘরের হন, তাঁদের ঠিক এই রকমই হয়। অখণ্ডের ভাবে ডুবে থাকেন, মাঝে মাঝে সেখান থেকে উঠে এসে ভক্তির কিছু কথা বলেন।

বলছেন, **বিচারের চক্ষে দেখলে, ভক্তের 'আমি' অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে**। যারা ভক্ত, তারা এই কথাগুলো শুনলে চটে যেতে পারেন। আসলে 'আমি'র একটা পর্দা এসে যায় কিনা, তাই ঈশ্বর থেকে একটু দূরে রেখেছে মনে হয়। 'আমি তাঁর ভক্ত', 'আমি তাঁকে ভালবাসি', এগুলো ভক্তির পর্দা, তাতে কিন্তু কিছু আসে যায় না। কারণ জ্ঞানী যেটা পাবেন, ভক্তও সেটাই পান।

এই বলে ঠাকুরের খুব নামকরা বর্ণনা, ''**কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে বলে। দূরে বলে সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূরে বলে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালোবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীলবর্ণ দেখায়, কাছে দেখ, কোন রঙ নাই**''। আমিত্ব ভাব আসার জন্য ঈশ্বরকে যেন দূরে মনে হয়। দূরে মনে হওয়ার জন্য তাঁর একটা রঙ, একটা আকার, একটা রূপ, সবই এসে যায়।

তাই বলছি, বেদান্ত-দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মুখে বলা যায় না। আমরা আগে এর আলোচনা করেছি, পরে আবার আলোচনা করব। **কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য**। এই লাইনটাকেও আণ্ডারলাইন করে রাখার মত, খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ইদানিং বেদান্ত বেদান্ত করে চারিদিকে বেদান্তকে নিয়ে লোকেদের মনে সব ভুলভাল ধারণা ছড়িয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ আপনি সত্য, ততক্ষণ রূপ সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য। যদি আমি চলে যায় তাহলে কি হবে? তাহলে তো বলার কিছু নেই, এটাকে নিয়ে আলোচনা করার কি আছে! তোমার আমিত্ব যখন চলে যাবে, তখন জগৎ থাকবে কি থাকবে না দেখে নিও। ঠাকুর বলে দিচ্ছেন তখন কিছু থাকে না। আমাদের সমস্যা হল, আমরা ক্লাশ ফোর ফাইভে পড়ছি অথচ পিএইচডিতে কি হয় এটাকে আগে বুঝিয়ে দিতে বলছি, না বোঝালে আমি এগোব না। আরও বাজে হল যে, এর কোন দরকারই নেই আমাদের। ঈশ্বরের নানারূপও সত্য, ঈশ্বরকে একজন ব্যক্তি রূপে বোধ করাটাও সত্য। ব্রাহ্মভক্ত কিনা, ইসলাম, খ্রীশ্চানিটি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা নিজেদের পৌত্তলিক ভাবতে লজ্জাবোধ করেন – ইনি এখনও কালীঘরে যান, ইত্যাদি বিচিত্র বিচিত্র জিনিসের ধারণা করে আছে। ইদানিং তো বুদ্ধিজীবিরা নিজেদের হিন্দু বলতেও লজ্জা পায়, কারণ এটাই। কিন্তু এই যে ঠাকুর এখানে বলছেন, তুমি যদি সত্য হও ততক্ষণ জগৎও সত্য। এরপর বেদান্তের যে একটা সাধারণ ধারণা, সেটাকে ঠাকুর কাটছেন।

ঈশ্বরের নানারূপও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য। যারা পপুলার কথাগুলো বলে বেড়ায়, আমি formless মানি, আমি নিরাকারকে মানি, এটাকে ঠাকুর contradict করছেন। সবটাই সত্য, যত মন তত রূপ। তাই না, এক মন আবার বিভিন্ন জিনিস ভাবতে পারে, ঈশ্বরও তখন সেই রূপেই আসবেন। হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবীদেবতা কেন বলছেন? আর তেত্রিশ কোটি দেবীদেবতাও তো খুব কম, সেই সময় জনসংখ্যা ওই রকম ছিল বলে এই সংখ্যা বললেন, এখন যদি বলতে হয়, তাহলে বলতে হবে একশ চল্লিশ কোটি দেবীদেবতা। যত মন তত ঈশ্বর, যত গুণ তত ঈশ্বর। আপনি নিজে যত রূপের কল্পনা করতে পারবেন, ঈশ্বরের তত রূপ।

ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল – এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষ জন্ম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

যদি আমার একঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই – শুঁড়ির দোকার কত মন মদ আছে, এই হিসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জানার দরকারই বা কি?

এই যে আগের অনুচ্ছেদে বললেন, দুর্লভ মানুষ জন্ম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়, এই ভাব আগেও এসেছে, পরেও আসবে, এখন যেটা বলতে যাচ্ছি, আগেও বলেছি, পরেও আবার বলব – কারণ এই জিনিসগুলো বারবার শুনলে তবে গিয়ে ধারণা হয়। ঠাকুর দেখবেন বারবার এই কথা বলছেন – মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। এটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করা উচিত, জিনিসটা ঠিক ঠিক কি। মানুষ তো অনেক কিছুই করছে। যেমন কুকুর, সে একটা কাজ করে, বেড়াল একটা কাজ করে, সিংহ আবার আরেক রকম ব্যবহার করে। মানুষের ক্ষেত্রে যদি ঈশ্বরদর্শনই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হত, তাহলে আমরা সবাই সেই দিকেই যেতাম, সবাই না হোক, কিছু লোক তো যেতাম। কিন্তু আমরা তো যাই না। কেন যাই না? এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, আগেও অনেকবার এই উদাহরণ নেওয়া হয়েছে, আমার খুব প্রিয় উদাহরণ।

কাঠের টুকরোগুলিকে দেখতে একই রকম লাগে। কাঠগোলায় গেলে দেখা যাবে, সেখানে সব কাঠগুলো সমান। সেই কাঠ দিয়ে যদি একটা চেয়ার বানানো হয়, এবার ওই চেয়ারটা একটা চেয়ার আবার একটা কাঠের টুকরোও। যদি আপনি চান তাহলে জ্বালানি কাঠ রূপেও ব্যবহার করতে পারেন। কাউকে মারার জন্যও ওটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে ওটা একটা চেয়ার। ওই চেয়ারটাকে যদি অলঙ্করণ, ডিজাইনাদি করা হয় তখন ওটা হয়ে যাবে Ornamental Chair। এবার ওই কাঠের তিনটে ব্যক্তিত্ব এসে গেল – একটা দামী চেয়ার, একটা চেয়ার, একটা কাঠ। এবার যদি সিংহাসন হয়ে যায়, তখন তার চারটে ব্যক্তিত্ব হয়ে গেল। সিংহাসন রূপেও ব্যবহার করা যাবে, আবার কাঠ রূপেও ব্যবহার করা যাবে। মজার জিনিস হল, আপনি যত specialized হচ্ছেন, আপনার আইডেনটিটি যত focused হচ্ছে, তত কিন্তু আপনি universal হয়ে যাচ্ছেন। যে কোন মানুষের যদি বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেই মানুষটি ইউনিভার্সাল। কারণ বাকি যা কিছু আছে, উনি সব কিছুর সাথে ইউনিফাইড। যিনি ফিজিক্সে পিএইচডি করছেন, তিনি যে শুধু ফিজিক্স জানেন তা না, অন্যান্য সাবজেক্টও জানেন। নাইন-টেনেও তিনি ফিজিক্স ও অন্যান্য অনেক সাবজেক্ট পড়েছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি উচ্চমানের specialized হয়ে গেছেন। ওই স্পেশালাইজেশানটাকে কাজে লাগানো দরকার। এবার যদি তাঁকে বলেন, মশাই, আপনি কি ক্লাশ নাইনের ছেলেকে অঙ্ক পড়াতে পারবেন? কেন পারবেন না, সহজেই পড়িয়ে দেবেন।

আমি এর উপর একটা কাজ করছি, কবে শেষ হবে ভগবান জানেন। তাতে একটা গল্প আছে। ছোট করে গল্পটা হল, যিনি ভগবান, তিনি সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড। তিনি তাঁর শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি করলেন, সেই শক্তির মাধ্যমে সচ্চিদানন্দকে এবার দেখায় – Strength, Wisdom and Love, এই তিনটে রূপে। সৎ শক্তি রূপে দেখায়, Wisdom চৈতন্য রূপে দেখায় এবং আনন্দ ভালবাসা রূপে দেখায়। এটা গল্প কিনা, এটা এবার ছড়িয়ে গেল। এমন ছড়িয়ে গেল যে, জগৎ মানেই দুইই রয়েছে – শক্তি রয়েছে, শক্তির অভাব রয়েছে। তেমনি জ্ঞান রয়েছে, জ্ঞানের অভাব রয়েছে। আর আনন্দ রয়েছে, আনন্দের অভাব রয়েছে। এবার এই তিনটে মিশতে শুরু করল, যেমন সত্ত্ব, রজো, তমো মিশতে থাকে। এখন অনেক infinite points রয়েছে, প্রত্যেকটি পয়েন্ট যেন আইডিয়া। আইডিয়াসগুলি ছিল, ভালই ছিল। ভগবানকে গিয়ে বলছে, ঠিক জমছে না, কেমন একঘেঁয়েমি এসে যাচ্ছে। ভগবান তখন তাদের শরীর দিয়ে দিলেন। সেই আইডিয়া থেকে দেবতারা জন্ম নিলেন, দেবতা মানে একটা আইডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করছে। তেমনি কুকুর বেড়াল সব কিছু একটা আইডিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে। যে কোন জিনিসকে সেইজন্য জগতে দেখবেন একটা আইডিয়াকে মূর্তরূপে তুলে ধরছে। এখন ওই আইডিয়াসগুলির যে রাজকুমার, সেও এখন ভগবানকে গিয়ে বলছে, আমাকেও একটা শরীর দিন। ভগবান তখন অনেক ভেবে তাকে মানুষ রূপ দিয়ে দিলেন। এই যে প্রিন্স অফ আইডিয়াস, তার মধ্যে সমস্ত রকম আইডিয়াস সমন্বিত। যত আইডিয়াস হতে পারে, Strength থেকে Weakness পর্যন্ত যত ইনফাইনাইট পয়েন্টস, জ্ঞান থেকে অজ্ঞান পর্যন্ত যত ইনফাইনাইটস পয়েন্টস আর ভালবাসা থেকে ঘৃণা পর্যন্ত যত ইনফাইনাইট পয়েন্টস সবটাই মানুষের মধ্যে রয়েছে। ফলে মানুষ বিছার মতও ব্যবহার করে, সাপের মতও ব্যবহার করে আবার দেবতার মতও ব্যবহার করে, সিংহ বাঘের মত আবার হিংস্র হয়ে যায়, ভালও বাসে। কিন্তু প্রিন্সের যেটা বৈশিষ্ট্য তা হল, চেতনাটা তার কক্ষণ যায় না, রাজার বেটা কিনা। তার মানে সে ঈশ্বরদর্শন করতে পারে। অন্য কোন প্রানী, অন্য কোন প্রজাতি ঈশ্বরদর্শন করতে পারবে না। এটাকে আমি একটা কাহিনীর মাধ্যমে রেখেছি।

কিন্তু আপনি যদি মনের দিক দিয়ে দেখেন, তাহলে কেউ কোন দিন দেখতে পারবে না। তার কারণ হল, স্বর্গাদিতে যাঁরা যান, তাঁদের মনে এত কামনা-বাসনা থাকে, সেইজন্যই তাঁরা সেখানে গেছেন, সেটাকে ত্যাগ করবেন কি করে। আপনি যে জিনিসটাকে নিয়ে এসেছেন, সেটাকে ছাড়বেন কি করে? যারা নরকে আছে বা নিম্ন যোনিতে আছে, তাদের অনুভূতিটা এমন, যার জন্য তার ওই যোনিতে গেছে, সেটাকে ছাড়বে কি করে? একমাত্র মানুষ, যে দেবতা হতে পারে, দানব হতে পারে, পশু হতে পারে, সব হতে পারে, এই সব কিছুর সাথে সে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হতে পারে। অবতার যখন আসেন, তিনি এই জিনিসটাকে মনে করিয়ে দেন – বাপু, তুমি সব হতে পার; সিংহ চিরদিন সিংহ থাকবে; হাতি চিরদিন হাতি থাকবে; দেবতারা দেবতাই থাকবে, ইন্দ্র ওই রকমই লম্পটগিরি করে বেড়াবে, কিন্তু থাকবে দেবতাদের রাজা হয়ে। একমাত্র মানুষ সবটাই হতে পারে। কারণ মানুষ হল ইউনিভার্সাল, বাকিরা সবাই বাঁধা।

বৈশিষ্ট্যটা যখন আসে, ইউনিভার্সাল কেন? কারণ এর মধ্যে বিশেষত্ব এটাই যে, মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, মানুষ ভক্তিসাধন করতে পারে, জ্ঞানসাধন করতে পারে, এটাকে নষ্ট হতে দিও না। একটা কাঠের সিংহাসনকে আপনি জ্বালানি কাঠ রূপে ব্যবহার করতে পারেন না। আপনি চাইলে করতেই পারেন, আপনি বলতে পারেন – আমার চেয়ার আমি যা খুশি করতে পারি। কম্যুনিস্টদের রাজত্ব কালে রাশিয়ায় একজন খুব উচ্চমানের গণিতজ্ঞ ছিলেন, যেহেতু উনি ওদের পছন্দের ছিলেন না, তাই ইউনিভার্সিটির নামকরা প্রফেসরকে ওখানকার বাথরুম পরিষ্কারের দায়ীত্ব দিলেন। বারো বছর তিনি তাই করলেন। তাঁকে অঙ্ক করতে দেওয়া হত না, তাই বাথরুমে লুকিয়ে দেওয়ালে অঙ্ক করতেন। আপনার হাতে ক্ষমতা আছে, আপনি আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীকে দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করাতেই

পারেন। কিন্তু তাতে মানবজাতির জন্য কি বিরাট ক্ষতি করছেন, সেটাও একটু বিচার করে দেখুন। পঞ্চম পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরলাভের কারণ – সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান

পঞ্চম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন, ঈশ্বরকে দেখা যায় কিনা আর ঈশ্বরের এত রূপ, এত মতান্তর কেন? এখান থেকে ঠাকুর এবার যে বর্ণনা করবেন, এটা হল Science and Technology of God realisation। ঈশ্বরদর্শন ব্যাপারটা কি, এই ব্যাপারে মনে যদি কোন সন্দেহ হয়, এর পুরো বিজ্ঞান ও পদ্ধতি যদি বুঝতে হয় তাহলে রাজযোগ আপনাকে ভাল করে বুঝতে হবে। কথামৃতের আলোচনাগুলি মন দিয়ে শুনে থাকলে আশা করতে পারি যে, আপনাদের মনে একটা ধারণা হয়েই গেছে, তাই আমাদের এই আলোচনাটা বুঝতে সুবিধা হবে।

আমরা কয়েকবার আলোচনা করেছি, যিনি ভগবান, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি তাঁর ইচ্ছাতে এই জগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎ মানে একটাই, তা হল মন। আমরা যে স্থূল জগৎ দেখছি, আসলে তা জগৎ না, এটা হল মন। যার জন্য সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন, বেদান্ত দর্শন যখন বর্ণনা করেন সৃষ্টি কিভাবে হয়, ওনারা প্রথমেই মন, কসমিক মাইণ্ড বা ইউনিভার্সাল মাইণ্ডের কথা বলবেন। সেখান থেকে আস্তে আস্তে নামতে থাকবেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকে ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি পড়ে পড়ে আমরা এমন হয়ে গেছি যে, এ্যটমিক স্ট্রাকচার আর এ্যটমিক নেচার অফ ইউনিভার্স এগুলো আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্মে এর কোন দাম নেই। কেন দাম নেই? কারণ তোমার জগৎ এ্যটম দিয়ে তৈরী, নাকি মলিক্যুল দিয়ে তৈরী, নাকি ইলেক্ট্রন দিয়ে তৈরী, তাতে আমার কি আসে যায়; যেটা দিয়েই তৈরী হোক আমি জগৎকে নেব আমার পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে। লোহা থাকুক, সোনা থাকুক, রসগোল্লা থাকুক, গোলাপ ফুল থাকুক, আমি সব কিছু দেখব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ দিয়ে। পাঁচের বদলে আমার যদি ছটা ইন্দ্রিয় থাকত বা সাতটা ইন্দ্রিয় থাকত তখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জায়গায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা সপ্ত ইন্দ্রিয় এসে যেত। তিনখানা যদি ইন্দ্রিয় থাকত, ওই তিনটে ইন্দ্রিয় দিয়েই জগৎকে দেখতাম। তার মানে আমি যখন ঈশ্বরদর্শনের কথা বলছি, তখনই মনকে নিয়ন্ত্রণের কথা আসছে।

ধরুন একটা নিম্নযোনির প্রানীর যদি তিনটে ইন্দ্রিয় থাকে, সেখানে কিভাবে তার চেতনা জেগে গেল যে, আমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ওরা তখন জগৎকে ওই তিনটে ইন্দ্রিয় দিয়েই বিশ্লেষণ করবে। ঠিক তেমনি যখন কোন উন্নত প্রজাতি থাকে, যাদের সাতখানা কি আটখানা ইন্দ্রিয়ে আছে, বিশ্লেষণ করার সময় তারা ঠিক ওই ভাবেই করবে। কিন্ত একটা দুটো পরেই, যেখানে বলা হয় – প্রথমে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে এবার পর পর বেরিয়ে আসে পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ। ওখানে ওরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ না বলে বলবে, যদি তিনটে ইন্দ্রিয় থাকে তাহলে বলবে তিনটে ইন্দ্রিয় তিনটে প্রাণ। যদি আটটা ইন্দ্রিয় থাকে তখন বলবে আটটা ইন্দ্রিয় আটটা প্রাণ। কিন্তু সব কটা গিয়ে মিলবে অহঙ্কারে। আর অহঙ্কার থেকে আসে সমষ্টি মন বা কসমিক মাইণ্ড, ওখানে কোন পরিবর্তন হবে না। সৃষ্টি মানেই মন, মনের বাইরে কিছু নেই; এই মন আমার আপনার মন না, এটা হল বৈষয়িক মন।

আমাদের বাইরে যা কিছু আছে, একই জিনিস কিন্তু আমাদের ভিতরেও আছে। ভগবান যেমন সর্বব্যাপী চৈতন্যরূপে আছেন, ঠিক সেই রকম আমার ভিতরে ভগবান অন্তর্যামী রূপে আছেন। বাইরে যে শক্তির প্রবাহ চলছে, যেমন রেলের ইঞ্জিন, ইঞ্জিন চলে হয় ডিজেলে, না হয় ইলেক্ট্রিসিটিতে। ইলেক্ট্রিসিটি তৈরী হচ্ছে হাইড্রো-ইলেক্ট্রিসিটি থেকে বা অন্য ভাবে; তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাইড্রো-ইলেক্ট্রিসিটি থেকে। হাইড্রো-ইলেক্ট্রিসিটি মূলতঃ জলাধার থেকে জলের প্রবাহ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। জলের প্রবাহ

আবার সূর্যের শক্তি, বাতাসের শক্তি দিয়ে হচ্ছে; আবার এই জল মেঘ হয়ে বৃষ্টি থেকে আসছে, বরফ গলে আসছে। তার মানে একটা শক্তি আরেকটা শক্তিতে অনবরত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ওই শক্তি যেমন বাইরের জগতে মেঘ তৈরী করছে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই বৃষ্টির জল নদী হয়ে জলাধারে যাচ্ছে, সেখান থেকে ইলেক্ট্রিসিটি তৈরী হচ্ছে। ঠিক ওই শক্তিই আমার আপনার ভিতরে গিয়ে, আমাদের এই শরীরকে সঞ্চালন করছে। শরীরের এই শক্তির সাধারণ শব্দটা হল প্রাণ। বাইরেও প্রাণ ভিতরেও প্রাণ, আমরা এনার্জি শব্দটা ব্যবহার করি না। আসলে ওটাই প্রাণশক্তি, যে কোন জিনিসের যেখানে কম্পন আছে, যে জিনিসটা চলছে, সেটাই প্রাণ।

ঠিক তেমনি আমার যেমন মন আছে, বাইরে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেতেও মন আছে, যাকে বলছি সমষ্টি মন বা কসমিক মাইণ্ড। একমাত্র হিন্দুরাই বলে, এই তিনটে, চারটে, পাঁচটা জিনিসের ব্যাপারে যা বলা হচ্ছে, এগুলো বাইরেও আছে ভিতরেও আছে, আমরা কিন্তু এটাকে বাইরে ও ভিতরে সংযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি। আমার ভিতরে যে প্রাণ, এই প্রাণকে বাইরের প্রাণের সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া যায় – যোগ পুরোপুরি এই সংযোগ প্রক্রিয়াকে নিয়েই চলে। আমরা যে অঘিমা, লঘিমা, গরিমার কথা বলি, এই ছোট হয়ে গেলাম, এই বড় হয়ে গেলাম, এই শক্তিমান হয়ে গেলাম; এগুলো সম্ভব হয় শুধু ভিতরের প্রাণকে আর বাইরের প্রাণের সাথে লিঙ্ক করে দিচ্ছে বলে। ভিতরের ইন্দ্রিয় আর বাইরের ইন্দ্রিয় দুটোকে যদি সংযোগ করে দেওয়া যায়, তখন তার শক্তিগুলিও অন্য রকম হয়ে যাবে। ভিতরের মন আর বাইরের মনকে যখন লিঙ্ক করে দিল, তখন সে সমস্ত মনের মালিক হয়ে গেল। ভিতরের আত্মার সাথে বাইরের আত্মার সাথে যখন লিঙ্ক করে দিল, তখন সে একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে গেল। ভিতরে যা বাইরেও তা, ব্যাপারটা হল শুধু জুড়ে দেওয়া।

কিন্তু আমাদের যে বন্ধনগুলি রয়েছে, দেহের বন্ধন আছে, ইন্দ্রিয়ের বন্ধন আছে; এই বন্ধনকে মানুষ অতিক্রম করে যখন সে ধ্যান করতে শুরু করে; ধ্যান করা মানে ছড়ানো মনকে একটা জায়গায় নিয়ে আসার সচেতন প্রক্রিয়া শুরু করা অর্থাৎ মনকে যখন নিগ্রহ করতে শুরু করা হল; তখন মন ধীরে ধীরে একাগ্র হতে থাকে। মন যত একাগ্র হবে, তত সে বাইরের মনের সাথে যুক্ত হতে থাকবে। আজকে আমার ক্ষমতা এত সীমিত কেন, কারণ আমি এখন এই দেহে আবদ্ধ। আমি যদি সব দেহের সাথে এক হতে পারতাম তাহলে কি আনন্দই না হত। আজ আমি ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকি, আমার কত দুঃখ-কষ্ট; আমি যদি জগতের যে কোন জায়গায় থাকতে পারতাম, তাহলে আমি কতই না খুশি থাকতাম, কোন দুঃখ-কষ্ট থাকত না। আমার ক্ষমতা এত কম কেন? কারণ আমি আমার ভিতরের ওই সীমিত প্রাণটুকুতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছি; কারণ আমি আমার এই ক্ষুদ্র মনেতেই আবদ্ধ হয়ে আছি, বৃহতের সাথে সংযোগ স্থাপিত করতে পারছি না। বিশ্বের সমস্ত শক্তির যে এনার্জি সিস্টেম, তার সঙ্গে যদি এক থাকতে পারতাম, তাহলে আমরা ক্ষমতা অসীম হয়ে যেত।

এগুলোর যেটাই আমরা করতে চাইব, আমাদের মনকে দিয়েই করতে হবে। অথচ আমাদের মনের ক্ষমতা কত সীমিত, একটা বই পড়তে গিয়ে দম বেরিয়ে যায়, সামান্য স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করতে গিয়ে দম বেরিয়ে যায়। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে নূতন নূতন অনেক ব্রহ্মচারীরা জয়েন করেছেন, প্রত্যেকের বিরাট বিরাট ডিগ্রি। পাঁচ-ছয় জন আছেন, যাঁরা বিদেশের সব নামকরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন। আমি ওনাদের দেখে ভাবি, তোমরা ক্লাশ ফাইভ সিক্সে পাশ করতে কি করে, আমার তো দম বেরিয়ে যেত। কারণ এনাদের মন একাগ্র ছিল, আমার মন একাগ্র ছিল না। আপনার আজ এত দুঃখ-কষ্ট কেন, মন আপনার একাগ্র নয়। আমাদের সবারই মন হল, এই যে কসমিক মাইণ্ড বা বৈষয়িক মন, তারই একটা ছোট্ট প্রতিবিম্ব। বাইরে যা আছে, ওটাই ভিতরে একটা ছোট্টর মধ্যে আবদ্ধ। এটা খুব আশ্চর্যের যে, যেদিন থেকে আপনি মনকে একাগ্র করতে শুরু করলেন, আপনি একাগ্র করছেন মানে আপনি ছোটর দিকে নিয়ে আসছেন, ওর ক্ষমতা কিন্তু তত বৃহৎ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের এই শরীরটা বাইরে, প্রাণ শরীরের ভিতরে, মন আরও ভিতরে আর আত্মা আরও ভিতরে। তার মানে বড় থেকে সূক্ষ্ম হচ্ছে। বাইরের দিকে তাকালে জিনিসটা ঠিক উলটো হয়ে যায়। আত্মা সর্বব্যাপী, মনটা তার থেকে ছোট, এনার্জি তার থেকে আরও ছোট, শরীর তার থেকে আরও ছোট – সত্যিই কি আশ্চর্য। সমষ্টির যে সৃষ্টি আর ব্যষ্টির যে সৃষ্টি, পুরো বিপরীত। সমষ্টিতে যেটা সবচেয়ে বড় ভিতরে এসে সেটা ছোট হয়ে যায়। সমষ্টিতে যেটা সব থেকে ছোট, ব্যষ্টিতে এসে সেটা সবচেয়ে বড় হয়ে যায়। যেমনি মন নিজেকে একাগ্র করতে শুরু করে, যত একাগ্র হতে থাকে তত মন বিস্তার হতে শুরু করে। মনের শক্তি তখন বেড়ে যায়, শক্তি বেড়ে যাওয়া মানে, মন সূক্ষ্ম হয়ে গেল। যে জিনিস যত সূক্ষ্ম হয় তার ক্ষমতা তত বেড়ে যায়। বোঝার জন্য আমরা মশারির উদাহরণ দিতে পারি।

আপনি একটা মশারি খাটালেন, মশারি থেকে আপনি বেরোতে পারবেন না। কারণ আপনার শরীরের যে আয়তন, ওই আয়তন মশারির জালের ছিদ্র দিয়ে বেরোতে পারবে না। মশাও আটকে যায়। মশারিতে যদি বড় ফুটো হয়ে যায়, মশা সেখান দিয়ে ঢুকবে। আর ধুলোবালি অনায়াসে মশারির জাল দিয়ে ঢুকে যেতে পারবে। কিন্তু মশারির নেটকে যদি আরও ফাইন করে দেওয়া হয়, যেমন এসি মেশিনে যে ফিল্টারগুলি থাকে, সেগুলো ধুলোবালিকেও আটকে দেবে। বাতাস কিন্তু চলতে পারবে, কারণ বাতাস আরও সূক্ষ্ম। আমাদের মনটা খুব স্থূল, স্থূল হওয়ার জন্য মন শরীরে আবদ্ধ। একাগ্র মন মানে সূক্ষ্ম মন, সূক্ষ্ম মন মানে বিরাট মন। যত সূক্ষ্ম হবে আয়তন তত তার বাড়ে, ক্ষমতা তার তত বাড়ে। এই জিনিসটাকে এনারা তন্ত্রে বলেন কুণ্ডলিনী, এই শক্তি একটা একটা চক্র ভেদ করে উপরে উঠে আসে। ঠাকুর এখানে সপ্তভূমির কথা বলছেন, সপ্তভূমির কথা তিনি কোথাও কারুর কাছে শুনেছিলেন। আমার ঠিক জানা নেই এর রেফেরেন্স কোথায় আছে, জানার দরকারও নেই। কারণ ঠাকুর যেটা বলছেন, নিজের অনুভূতি থেকে বলছেন আর অনেকবার বলেছেন; কখন কুণ্ডলিনী দিয়ে বলেছেন, কখন বেদের সপ্তভূমি দিয়ে বলছেন। আমাদের সহাধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী যতিশ্বরানন্দজী মহারাজ, উনি এটাকে Planes of consciousness বলতেন, চেতনার ভূমি।

মন সূক্ষ্ম হচ্ছে, এটা আমরা কি করে বুঝব? যে কোন লোক বলতে পারে আমার মন সূক্ষ্ম হয়েছে, আমার তো দেবীদেবতার দর্শন হয়, যেমন ঠাকুরের দর্শন হত। আমাকে একজন মহারাজ মজা করে বলতেন – আপনাকে এখনও বই পড়তে হয়? আমাকে তো মা সরস্বতী সরাসরি জ্ঞান দিয়ে দেন। মজা করে বললেও, কথাটা খারাপ কিছু বলেননি। কুণ্ডলিনী জাগছে কিনা, সপ্তভূমিতে এগোচ্ছেন কিনা, সেটাই ঠাকুর এখানে বর্ণনা করছেন। কুণ্ডলিনীর কথাতে ঠাকুর বলছেন, যে মহাবায়ু, যা কিনা এনার্জি সেন্টার, যেটা স্পাইনের নীচে স্থিত হয়ে থাকে, সেই মহাবায়ু যখন উপরের দিকে ওঠে, পরিষ্কার বোঝা যায় যে বায়ু উঠছে। সপ্তভূমির আলোচনায় ঠাকুর এই বর্ণনাটা করছেন। তবে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, এই কুণ্ডলিনী নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে প্রচলিত ধারণাগুলি আমাদের রয়েছে, এগুলোর কোন দাম নেই। যার মন যখন একাগ্র হবে, কুণ্ডলিনী তখন নিজে থেকেই উঠবে, আর তার চেতনারস্তরও পাল্টাবে। চেতনা আপনার পাল্টাচ্ছে কিনা, ওটার জন্য আপনার কুণ্ডলিনী বোঝার কোন দরকার পড়ে না, আপনার ব্যবহার দেখলেই বোঝা যাবে। কি ধরণের খাওয়া-দাওয়াতে আপনার রুচি, কোন বিষয়ের উপর আপনার কথাবার্তা বলতে ভাল লাগছে, কোন ধরণের জিনিস আপনার পছন্দ, কোন জিনিস আপনার অপছন্দ আর অপরের সাথে আপনার ব্যবহার কেমন, এগুলো দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে আপনার মন এখন চেতনার কোন ভূমিতে অবস্থান করছে। এই পরিচ্ছেদে আলোচনার শুরু করতে গিয়ে ঠাকুর জ্ঞানপথকে নিয়ে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। জ্ঞানপথ – বড় কঠিন পথ। বিষয়বুদ্ধির – কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকলে জ্ঞান হয় না। এ-সব কলিযুগের পক্ষে নয়।

আজকেই একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি বলছেন, আজকালকার লোকেদের কোন পড়াশোনা নেই। আমি বললাম – পড়াশোনা আগেও ছিল না, আগেও লোকেরা হাভাতে ছিল। কিন্তু এই যুগে সাইবার ওয়ার্ল্ড, ফেসবুক হয়ে একটু যাও বা ছিল সেটাও শেষ হয়ে গেছে। এক অপরকে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে, এক অপরকে জোকস্‌গুলো হোয়টসাপে, ফেসবুকে ফরোয়ার্ড করে যাচ্ছে। সমস্ত জ্ঞান শুধু হোয়াটসাপ আর ফেসবুকে। এরাই জগতে একটা বিপ্লব আনতে যাচ্ছে।

নোবেলজয়ী পার্ল বার্কের চীনের উপর লেখা 'The Good Earth' খুব নামকরা বই। চীনে যে বিপ্লব হয়েছিল, তার বর্ণনা বইতে আছে, খুব সুন্দর বই। চীনে বিপ্লব হয়ে গেছে, বিপ্লব হওয়ার পর যে চাষী বড়লোক ছিল, সে এখন ধীরে ধীরে জমিদার হয়ে গেছে। এখন কমরেডরা সেখানে এসে থাকতে শুরু করেছে। কমরেডরা ওদের খাওয়া নিচ্ছে, তাতে ওদের কোন সমস্যা নেই। সমস্যা এলো, এরপর যখন বাড়ির মেয়েদের উপর হাত পড়তে শুরু করল। নিরুপায় হয়ে বলছে, 'এর কিছু একটা বিবিত কর'। বলছে, 'চীনে এখন একটাই উপায় – সবাইকে আফিংএর নেশা ধরিয়ে দাও'। 'আফিং! অনেক দাম পড়বে'। 'কিছু করার নেই, ওতে আমাদের বাড়ির মেয়েদের ইজ্জত অন্তত রক্ষা পাবে'। তারপর খুব কায়দা করে ওরা আফিং খাওয়াতে শুরু করল। সন্ধ্যে হয়ে গেলে সবাই আফিংএর নেশায় বুঁদ হয়ে থাকছে, মেয়েদের উপর হাত পড়াও বন্ধ। এখন আমাদের কাছে আফিংএর বদলে এসে গেছে মোবাইল ফোন আর তাতে ফেসবুক, হোয়াটসাপ। বেশি গোলমাল করছে, একটা মোবাইল ধরিয়ে দিন, তাতে দুটো গেমস্ লোড করে দিন, সব শান্তি। মানুষ বিরক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু ছেড়ে থাকতেও পারে না, আফিংএর মত নেশা চেপে গেছে। ঠাকুর বলছেন, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র যদি থাকে, আপনি এগোতে পারবেন না।

এই যে পপুলার কথাগুলো কুণ্ডলিনী এই, কুণ্ডলিনী সেই, এই কথাগুলোতে সারবত্তা কিছু নেই। এসব ছেড়ে আগে দেখুন আপনার মন কোথায় আছে, আগে দেখুন আপনার মনকে একাগ্র করার শক্তি আছে কিনা। মনকে একাগ্র করার শক্তি যদি আপনার না থাকে, তাহলে আপনার মন শিথিল, আপনার মন অলস প্রকৃতির। আর কামিনী-কাঞ্চনে গিয়ে মন যদি আঠার মত আটকে থাকে, তার মানে আপনার মনে শক্তি আছে, কিন্তু ভুল জায়গায় গিয়ে আটকে আছে, ওখান থেকে টেনে নিজেকে আপনি সরাতে পারছেন না। দুটো ক্ষমতা লাগে – একটা হল ঘোড়া যেন দৌড়াতে পারে, দ্বিতীয় ক্ষমতা হল, দুরন্ত ঘোড়াকে আমি যেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি। ঘোড়সওয়ারকে একটা ঘোড়া দেওয়া হল, যেটা শান্ত, শিষ্ট; যতই চাবুক লাগান, খোঁচা দিন, সে নড়বে না, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে; এই ঘোড়া নিয়ে আমার কি হবে। সেটাকে পালটে ঘোড়সওয়ারকে এমন একটা ঘোড়া দেওয়া হল যে এমন দুরন্ত আর দুর্দান্ত, ঘোড়া নিজের মত এখানে ছুটছে, ওখানে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা খুব সুন্দর জোক আছে, একজন জমিদার একটা ঘোড়ার উপর বসে আছে, আর ঘোড়া দৌড়াচ্ছে, জমিদার ঘোড়াকে সামলাতে পারছে না। রাস্থার ধার থেকে একজন জিজ্ঞেস করছে, বাবু কোথায় যাচ্ছেন? আমি জানি না, ঘোড়াকে জিজ্ঞেস কর। গ্রামের জমিদারের মত আমাদেরও ঠিক একই অবস্থা, আমরা জানি না কোথায় যাচ্ছি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের মন হয় অলস, কিছু করতে চায় না, সব সময় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। আর ক্ষমতা যদি থাকে, তখন একবার ওদিকে গিয়ে এঁটে যাবে, আরেকবার ওটাতে গিয়ে এঁটে যাবে।

আর যে Lazy brain syndrom, সে কিছু করবে না। কল্পনাতেই টাকা-পয়সা আয় করে যাবে – সরকার ট্যাক্স কেন কমাচ্ছে না, সরকার ভরতুকি কেন দিচ্ছে না, সরকার কেন বাড়িতে এসে আমাকে টাকা দিচ্ছে না; নিজেরা কিচ্ছুটি করবে না। একধার থেকে এরা সবাই অলস মনের অধিকারী। এর বিপরীতে, খুব যদি সক্রিয় হয়ে যায়, তখন একবার এদিকে দৌড়াবে, আরেকবার ওদিকে দৌড়াবে।

এই মন যখন কামিনী-কাঞ্চনের আকর্ষণ থেকে, জগতের আকর্ষণ থেকে সরে আসে, তখন এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন –

এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। সপ্তভূমি মনের স্থান। মনের স্থান মানে, মন যত একাগ্র হবে তত তার শক্তি বাড়বে। ঠাকুর বলছেন, **এই সাতভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি মনের বাসস্থান, মনের তখন উর্ধ্বদৃষ্টি থাকে না – কেবন কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে**। মূলতঃ এগুলো হল নিম্নভূমি। প্রথম হল যারা একেবারেই কিছু করে না, চরিত্রবান গরুর মত চুপচাপ পড়ে আছে। দুধ দেয়নি, দেবে না; বাছুর দেয়নি, দেবে না; কোন দিন ষাঁড়ের সাথে পাল খায়নি, খাবে না। তাহলে এই গরুর কি আছে? শুধু চরিত্রটুকু। এই চরিত্রবান গরুর মত হওয়া যা আর লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতে বাস করাও তা। আর যখন কামিনী-কাঞ্চনে মন আছে, সেটাও ওই তিনটে নিম্নভূমিতে পড়ে আছে, ওটাও এগোয়নি।

কিন্তু যখন গুরুকৃপা হবে, ঈশ্বরের কৃপা হবে, তাঁর কৃপায় চেতনা জাগলে মন তখন ওই তিন বাসস্থান থেকে উপরে চলে আসে, মন তখন একাগ্র হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন – **চতুর্থভূমি – হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে 'একি'! 'একি'! তখন আর নিচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না**। আমরা যে জাগতিক আলো দেখছি জ্যোতি-দর্শনের আলো তার মত না, এ হল ঐশ্বরিক জ্যোতি, চৈতন্যজ্যোতি। ঈশ্বর মনের জগতে এখন আপনাকে জ্যোতি রূপে দর্শন দিচ্ছেন। কামিনী-কাঞ্চন যেটা সেটাও ঈশ্বরেরই রূপ, এই রূপ আমাদের বেঁধে রাখবে। এই জ্যোতিটা তাঁরই রূপ, এই রূপও বেঁধে রাখবে। লীলাপ্রসঙ্গে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, ঠাকুর হৃদয়কে ছুঁয়ে দেওয়ার পর হৃদয় দেখছে সব কিছু জ্যোতির্ময়। হৃদয়রাম চিৎকার করে বলছে, 'মামা মামা চল আমরা জগৎকে শিক্ষে দিই'। ঠাকুর বলছেন, 'চুপ কর চুপ কর'। সেটাই ঠাকুর এখানে বলছেন, তখন অবাক হয়ে বলে 'একি'! 'একি'! হৃদয়রামেরই বর্ণনা যেন করছেন, 'একি'! 'একি'! এই অবস্থায় চলে এলে মন আর নিচের দিকে যায় না।

ব্যাপারটা ঠিক এতটা না, খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। যাঁরা একটু জপধ্যান করেন, একটু মানে কম করে আধঘন্টা আর বিশেষ স্থানে যদি বসেন, যেমন বেলুড় মঠের মন্দিরে বা বাড়িতে যদি একটা ঠাকুর ঘর থাকে, যেখানে কোন চেঁচামেচি নেই, কোন আওয়াজ নেই। তারপর সেখানে খুব মন দিয়ে, একাগ্রভাবে খুব কম করে আধঘন্টা জপধ্যান করলেন। তারপর উঠে আসার পর আপনার আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগবে না, কথা বলতে হলে বিরক্ত অনুভব হবে। এটা একটা আইডিয়া, ঠিক হৃদয়ে না, তার থেকে আরেক ধাপ উপরে। বলা হয়ে থাকে যে, জ্যোতি দর্শন হলে স্থায়ী ভাবে মনটা সংসার থেকে সরে আসে। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা হয়, মন হৃদয়ে ওঠার পরেও মন আবার নিচে নেমে যায়।

মনের পঞ্চমভূমি – কণ্ঠ। সেই মন এবার কিভাবে একাগ্র হচ্ছে, জগৎকে মন এখন কিভাবে দেখছে, সেই অনুসারে বলে মন এখন পঞ্চমভূমিতে অবস্থিত। আর তন্ত্রশাস্ত্রে বলে, বায়ু পরিষ্কার বোঝা যায়। ঠাকুর বলছেন, **মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়**।

আসলে কণ্ঠ পর্যন্ত খুব কম যোগীর মন যায়। বিশেষ করে যাঁরা সমাজে আছেন, তাঁদের পক্ষে কণ্ঠে মন নিয়ে যাওয়া খুব মুশকিল। আগেকার দিনে তাই তাঁরা কোন জঙ্গলে বা গুহায় চলে যেতেন। সংসারে থেকে কারুর যদি কণ্ঠে মন চলে যায়, তাঁরা সংসারে থাকতে পারবেন না, সংসার থেকে বেরিয়ে যাবেন। কারণ সংসারে থাকলে তাঁকে চার-পাঁচটা কথা বলতে হবে, যেটা তাঁর একেবারেই তখন আর ভাল লাগবে না। ঠাকুরের যাঁরা সন্তান ছিলেন, তাঁদের জীবনী দেখুন, বা আমরা বড় বড় মহারাজদের দেখেছি কোন বৈষয়িক কথাবার্তা একেবারেই পছন্দ করতেন না।

আমাদের একজন বৃটিশ মহারাজ ছিলেন, তাঁর মুখে আমি একটা ঘটনা শুনেছিলাম। উনি এক মহারাজের নামে বলেছিলেন, দুপুরবেলা গিয়ে উনি সেই মহারাজের মাথা ম্যাসেজ করে দিতেন। বৃদ্ধ মহারাজের মাথা ম্যাসেজ করার সময় উনি জপ করতেন। ম্যাসেজ করার সময় জপ ছাড়া বা ঠাকুরের বাইরে অন্য কোন চিন্তা যদি আসে, সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ ঘাড় নেড়ে 'উঁহু' 'উঁহু' করতে থাকতেন। পরিষ্কার উনি বুঝতে পারতেন, এর মনে অন্য চিন্তা চলছে। উনিও ঘাবড়ে গিয়ে আবার জপে মন দিতেন। কিন্তু তখন তিনি একজন ইয়ং ব্রহ্মচারী, ওই বয়সে মন এদিক ওদিক একটু তো দৌড়াতে চাইবে। যেমনি মনে একটু অন্য চিন্তা আসছে, মহারাজও সঙ্গে সঙ্গে 'উঁহু' 'উঁহু' করতে শুরু করে দিতেন। এইভাবে উনি আধঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট ম্যাসেজ করার সময় পুরো আতঙ্কে থাকতেন। আর উনি নিজে ভালবেসে মহারাজের কাছে যেতেন, ওনাকে যে কেউ বলেছে যেতে, তা না। যাঁদের মন কণ্ঠে উঠে গেছে, তাঁরা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন চিন্তা নিতেই পারেন না।

মনের ষষ্ঠভূমি – কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। যাদের মন নীচের দিকে আছে, তাদেরও কিন্তু ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। যাদের হৃদয়ে মন উঠে এসেছে, তাদেরও ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। কিন্তু এখানে বলছেন, 'অহর্নিশ', সব সময় রূপ দর্শন হচ্ছে। এটাতেও মাঝে মাঝে একটু ফাঁক হবে, তখন তাঁর ছটফটানি হবে, কিন্তু অহর্নিশ, সব সময় ওনার ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। **তখনও একটু 'আমি' থাকে**। এই যে ভক্তির কথা আগে বলা হল, ভক্তিতে একটু 'আমি' থাকে। ফলে ভক্তির রস আস্বাদ করা যায়।

সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপদর্শন করে, উন্মত্ত হয়ে সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। একটু আগে ভক্তিকে নিয়ে আলোচনা করার সময়, বলা হয়েছিল যে, ভক্তি ভালবাসার শেষ কথা, আর ভালবাসা খুব গভীর; এত গভীর যে বলছেন, ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে যায়। চৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনা আছে, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে তিনি কিভাবে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন।

ঠাকুর এই যে বলছেন রূপকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করতে যান, কিন্তু পারেন না, সেটারই তুলনা করছেন – **যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম ছুঁলাম; কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না**''। এটাই ভক্তির শেষ কথা। তবে এতেই হয়ে যায়, কারণ এই অবস্থায় গেলে আর কোন পরিস্থিতিতে তাঁর মন এই জগতে আর নামবে না। অন্য জায়গায় ঠাকুর বলছেন, এই রকম অবস্থায় গেলে খুব হলে ওখান থেকে মন কণ্ঠ পর্যন্ত আসবে, কিন্তু হৃদয়ে আর মন নামবে না। কারণ মন ওখানে ঈশ্বরীয় ভাবে এমন ডুবে গেছে যে, ওখান থেকে আর মন বেরিয়ে আসতে চাইবে না। ঠিক ঠিক যিনি সতী, স্বামীকে সত্যিকারের ভালবাসে, এখন যেই এসে যাক তাঁর সামনে, তাঁর মন আর কোন দিকে যাবে না।

শিরোদেশ – সপ্তভূমি। সেইজন্য মস্তককে শিবের স্থান বলা হয়, মাথাকে তাই কারুর পায়ে লাগাতে নেই। মাথাকে অনেকে অহঙ্কারাদি রূপে দেখে, কিন্তু তা না, মাথা শিবের স্থান। মাথায় শিবের নিত্যবাস, সব সময় তিনি এখানে আছেন। আগে আমরা এর একটা আলোচনা করেছিলাম, সেখানে তন্ত্রমতে সহস্রারের কথা বলা হয়েছিল। এখানে বেদ মতে বলছেন। **সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়**। ভক্ত এতে যাবেন না, এতে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। বোঝার জন্য আমরা যদি ভাবি – রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসেন, সেখানে কৃষ্ণ যদি বলেন, এই আমার অখণ্ড রূপ, এই রূপটাই তুমি নাও। রাধা বলবেন, এই রূপ নিয়ে আমি কি করব, আমার তো ওইটা লাগবে। কোন বাচ্চা মাকে চাইছে, তাকে যদি বলা হয়, এই দেখ মায়ের ছবি, এটা মায়ের সম্পত্তি, বাচ্চা বলবে, এসবে আমার নিকুচি করেছে, আমার মাকে চাই।

একটা গল্প আগেও বলেছিলাম, একটা বাচ্চা ছেলেকে কামারপুকুরের মেলায় নিয়ে এসেছে। মেলায় এসে মার জন্য কান্নাকাটি করছে। তখন তাকে ঠাকুর আর মায়ের মাটির খেলনা দিয়ে বলছে, 'এই দেখ তোমার বাবা-মা'। বাচ্চাটি খেলনাটা নিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলে ভেঙে দিয়ে বলছে, 'এই নাও তোমার মা, এই নাও তোমার বাবা, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল'। ওর মাকে চাই, মাকেই এনে দিতে হবে, অন্য কিছু তার লাগবে না। ঠিক তেমনি, যাঁরা ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাঁদের এ-সব চলবে না। এটাকেই ঠাকুর অন্য জায়গায় বর্ণনা করছেন, এই গোপীরা যখন পরে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, গিয়ে দেখছেন কৃষ্ণ রাজমুকুটাদি পরে আছেন। ওই দেখে গোপীরা বলছেন, 'এ কি দেখছি আমরা, পরপুরুষকে দেখে আমরা কি আবার পতিত হব। আমাদের সেই কৃষ্ণকেই আমরা চাই, ময়ূরপুচ্ছধারী, পীতবসনা, কণ্ঠে বনফুল, ওষ্ঠে যাঁর বাঁশি, যে কৃষ্ণকে আমরা বৃন্দাবনে দেখেছিলাম, সেই কৃষ্ণকেই চাই'। এই হল ভক্তের ঠিক ঠিক ভাব। তারপর আরও বলছেন।

কিন্তু সে-অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের এই ধরণের একটা বর্ণনা আছে। ওই অবস্থায় ঠাকুরের মুখে দুধ দিতে গেলে দুধ গড়িয়ে যাচ্ছিল। কপাল এমন ওই সময় দক্ষিণেশ্বরে হঠাৎ একজন সাধুবাবা হাজির হয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে ভাবি, আজকে কথামৃতের জন্য ঠাকুরের এই কথাগুলো পাচ্ছি। আমরা যদি কথামৃতকে জীবন থেকে সরিয়ে দিই, আমরা কি কোন দিন এত কথা জানতে পারতাম? জানতে পারার কোন প্রশ্নই নেই। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করছেন, সাধনায় ঠাকুর ঠিক সেই অবস্থায় চলে গেছেন, দুধ দেওয়া হচ্ছে, মুখ থেকে গড়িয়ে যাচ্ছে। সেই সময় কোথা থেকে একজন সাধুবাবা এসে হাজির। তিনি সব দেখে বুঝে গেছেন, ঠাকুরের মাথায় কিল মেরে মেরে দুধ ঢোকাতে লাগলেন। সেই সময় আবার মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। রক্তের রঙ দেখে সাধুবাবা বলছেন, এই অবস্থা সমাধিবান পুরুষের হয়।

আমি যখনই এই ঘটনা পড়ি আমার শরীরে কাঁটা দেয়, ভাবুন ভারতের ঋষি পরম্পরা কত উন্নত। শুধু রক্তের রঙ দেখে বলে দিচ্ছেন, আরে এতো সমাধির অবস্থায় আছে। বলছেন, কুণ্ডলিনী একটু অন্য দিকে চলে গিয়েছিল, এই রক্ত না বেরোলে শরীর থাকত না। আপনারা দেখবেন, যখন আমরা কোন কিছু করি তখন শরীর অনেক রকম কেমিক্যালস্ রিলিজ করে। রেগে গেলে শরীরের রক্তপ্রবাহ এক রকম হয়ে যায়, কাম-বাসনা এলে রক্তপ্রবাহ অন্য রকম হয়ে যায়, ভয় পেলে আরেক রকম হয়ে যায় আবার ধ্যানের গভীরে চলে গেলে রক্তপ্রবাহ পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। এই রক্তপ্রবাহ যে ভাবে ফোকাসড্ হয় জিনিসটা ঠিক ওই ভাবে চলতে থাকে। ফলে যখন সমাধি হয়, তখন পুরো রক্ত মাথা নিয়ে নেয়, যার জন্য আস্তে আস্তে শরীরটা নষ্ট হয়ে যায়। আর নিজের চেতনা থাকে না বলে খেতে পারে না, খেলে কোন ক্রিয়া করে না।

তখন ঠাকুর বলছেন, **এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু**। এই ব্যাপারটা ঠাকুর বোধ হয় ত্রৈলঙ্গস্বামী থেকে শুনেছিলেন, কারণ এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, উনি বলেছিলেন। কারণ, ঠাকুরের যখন দেহ যায়নি, তার মানেই তিনি এটা কারুর কাছ থেকে শুনেছেন বা কোন পরম্পরাতে পেয়েছেন। **এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ**।

আমরা এই কথাগুলো কুণ্ডলিনীর আলোচনার মাধ্যমে শুনলাম, যেখানে বলা হল যখন কুণ্ডলিনী জাগে তখন এই ভাবে হয়। যে জায়গাতে আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম, সেখানে দেখবেন ঠাকুর কুণ্ডলিনীকে নিয়ে বলছেন। এখানে কিন্তু ঠাকুর জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ, যোগপথ, তন্ত্রপথ সব পথকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছেন। ইদানিং কালে হিন্দু ধর্মের উপর যে বইগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে অনেক জায়গায় স্বামীজীকে নিন্দা করা হয়েছে, স্বামীজী নাকি এগুলো নিজের মত ব্যাখ্যা করেছেন। এরা বুঝতে পারে না যে, ঠাকুর, স্বামীজী, এনারা হলেন শাস্ত্রের মূর্তরূপ। এনারা শাস্ত্রের কোন কিছুকে যদি না করে

দেন, তার মানে ওটা শাস্ত্রে থাকলেও ওটা ভুল। যদি কোন কথা বলেন, তার মানে শাস্ত্রে না থাকলেও ওই কথা ঠিক। ঠাকুর যখন এখানে তন্ত্রমত, বেদমত, ব্রহ্মজ্ঞানী, সমাধি, সব কটাকে মিলিয়ে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন, তার মানে এটাই ঠিক। যদি কেউ বলে, এটা তো রামকৃষ্ণ পরমহংস নিয়ে এলেন, আসলে তন্ত্রমত, বেদমত এগুলো সব আলাদা। কিছু কিছু লেখক আছেন, বিশেষ করে বিদেশী লেখকরা, যাঁরা কোন দিন হিন্দু ধর্মের অনুশীলন করেননি, কোন ভাল সাধু মহাত্মার সঙ্গ করলেন না, হিন্দু ধর্মের কোন আইডিয়া নেই, নিজের দেশে বসে দু-চারটে বই পড়ে হিন্দু ধর্মকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। আমরাও পয়সা দিয়ে কিনে ওদের কথাগুলো গিলে যাচ্ছি। আর যখন সুপ্রিম কোর্ট নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে, তখন আবার রায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করছে।

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের সাথে কথা বলছেন। কথার মধ্যে সাধারণ কথাও আছে, মাঝারি কথাও আছে আবার উঁচু কথাও আছে।

আমায় একজন বলেছিল, 'মহাশয়! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন'? (সকলের হাস্য)। এর আগে শুরুতে একজন ব্রাহ্মভক্ত ঈশ্বরদর্শন নিয়ে বলেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, তা কি করে তোমাকে বোঝাব। নরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, তিনিও ঠাকুরকে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন – ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? ঠাকুর কিন্তু নরেনকে বলেননি যে, 'তা কি করে তোমাকে বোঝাব'। ঠাকুর নরেনকে বলেছিলেন, আমি দেখেছি, তোমাকেও দেখাতে পারি। এখানে ব্রাহ্মভক্ত যখন জিজ্ঞেস করছেন, ঠাকুর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন, তোমাকে কি করে বোঝাব।

এখন সমাধি নিয়ে ঠাকুর যেটা বলছেন, ঠাট্টা করে বলছেন। সেখানেও উদ্দেশ্য একটাই – তোমার কোন প্রস্তুতি নেই। অনেক আগে শুনেছিলাম, বেলুড় মঠে একজন মহারাজ ছিলেন, ওনার কাছে কোন ভক্ত এসে বলছেন, 'দেখুন আগেকার মহারাজরা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ঠাকুরের কথাই বলতেন, এখন আপনারা যাঁরা আছেন সবাই খোশগপ্প করেন'। মহারাজ ভক্তটিকে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে বসুন, আজকে আপনার সঙ্গে শুধু ঈশ্বরীয় কথাই বলব'। কিছুক্ষণ কথা বলার পর উনি হাঁপ ছেড়ে পালাতে চাইছেন। এদের কথাই ঠাকুর বিষ্ঠার পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখার মত বলছেন। আসলে কি হয়, এই কথাগুলো কোথাও শুনেছেন, সেখান থেকে মনে নানা রকমের ভাব এসেছে, সেখান থেকে excited হয়ে উঠেছে। তারপর বুঝতে পারে না, এলেমেলো হয়ে যায়, নিজের মত বোঝাতে থাকে। যেমনি কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক একটা কোন ভাল আইডিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত ওই আইডিয়াটাকে নিয়ে সবাই আলোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে। এটা মানুষের স্বভাব, ভিতরে ফাঁপা কিছু নেই, যেমনি একটা কোন আইডিয়া পেল, সমর্থন করবে তাতেও, বিরোধিতা করবে তাতেও সবাই জুটে যেত আর বানরের মত নাচতে শুরু করে দেবে।

রুডিয়ার্ড কিপ্লিং খুব নামকরা লেখক, জাঙ্গলবুকের স্রষ্টা, তিনি ওই জাঙ্গলবুক স্টোরিতে খুব সুন্দর বানরের স্বভাবটাকে নিয়ে এসেছেন। বানরদেরও খুব ইচ্ছে যে শিখবে, কিন্তু একটু শিখেই বলবে আমরা শিখে গেছি। শেখার ইতি হয়ে গেল, এটাই বানরের স্বভাব। জর্জ বার্ণার্ড'শ খুব সুন্দর নাটক লিখতেন, একটা নাটকে ব্যঙ্গ করে একটা দৃশ্যে তিনি দেখাচ্ছেন, যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার উপর চলে যাচ্ছে, সব দোষ ব্যাকটেরিয়ার উপর চলে যাচ্ছে। কোথায় একটা শুনে নিয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এরপর সব কিছুতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং দেখছে। আপনার মেজাজ খারাপ কেন হয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিংএর জন্য, ঝগড়া কেন হচ্ছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিংএর জন্য। একটা কিছু পেয়ে গেল, সেটাকে নিয়েই মানুষ লাফাতে শুরু করে দেবে। এটা মানুষের স্বভাব। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে দেখবেন, ইলেক্ট্রিসিটি যখন এলো, ব্যাটারি দিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি পাশ করাচ্ছে, তাতে নাকি বাতের ব্যাথা সেরে যাবে। এটা মানুষের স্বভাব, বিশেষ করে কোন একটা শব্দ বা নূতন কোন আইডিয়া পেল, সেটাকে নিয়ে এবার লাফাবে।

ঠাকুর আসার পর সমাধি জিনিসটা লোকেদের মধ্যে একটা আলোচনার বিষয় হয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সমাধি জিনিসটা লোকেদের মধ্যে খুব পপুলার হয়ে গেল। ভদ্রলোক শুনেছেন, ঠাকুর প্রায়ই সমাধিতে চলে যান, তিনি চাইলে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিতে পারেন, ঠাকুর এটা ব্যঙ্গ করে বলছেন। এরপর তিনি ব্যাখ্যা করছেন, এইজন্যই ব্যাখ্যা করছেন, কারণ ব্রাহ্মভক্ত যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে কিছুটা আছে, একেবারেই যে কিছু নেই তাও না, কিছু যে আছে, সেটাও না।

সমাধি হলে সব কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। কথামৃতে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বাক্য। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে, এমনকি উপনিষদের ভাষ্যেও বারবার একটা কথা বলছেন – যিনি ঈশ্বরের পথে চলে যান, তাঁর সমস্ত কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। এখন কর্ম থাকবে, কর্ম থাকবে না; পাপ থাকবে, পাপ থাকবে না; পূণ্য থাকবে, পূণ্য থাকবে না; এগুলোকে যদি সহজে বুঝতে হয় তাহলে যোগের মাধ্যমে বুঝতে হবে। যোগের মাধ্যমে বোঝা বলার আগে একটা সাধারণ কথা বলা যেতে পারে, যদি আপনি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা বোঝেন, কার্য-কারণ যেটা বলা হয়; যেমন আপনি যদি সুইচ অন করেন আলো জ্বলবে, পাখা ঘুরবে। যে কোন মেশিন মানেই তাই। প্রথম গ্যালিলিও আদিরা কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে এলেন, আর সেখান থেকে নিউটন যখন গতির সিদ্ধান্ত আদিগুলি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত এসে গেল – God is the great watchmaker। নিউটনের ফিজিক্সের যত সিদ্ধান্তগুলি এলো, এই থিয়োরি অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু দাঁড়িয়ে গেল। আজকেও যে ঝামেলা চলছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের কথা যাঁরা শোনেন, যাঁরা বিজ্ঞানকে আধার করে ধর্মকে উড়িয়ে দিচ্ছেন, তারাও কিন্তু আসলে ও-ভাবেই নেন – ঈশ্বর একজন গ্রেট ওয়াচম্যান।

আগেকার দিনে সুইস ঘড়ি যেগুলো হত, সব কটা একেবারে পারফেক্ট সময় দিত, সময়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন খুঁত পাওয়া যেত না। তাদের কাছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা মেশিন, আর ভগবান এত ভাল একটা মেশিন বানিয়েছেন যে, যার সব কিছু একেবারে ঠিক ঠিক চলছে। কিন্তু যদি একটু বিচার করে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে স্বাভাবিক ভাবে কোন মেশিনেরই নিজের ইচ্ছা থাকতে পারে না। সেখান থেকে দ্বিতীয় সমস্যা শুরু হয়ে যায়, যেটা খ্রীশ্চানদের খুব পুরনো সমস্যা – ঈশ্বরের ইচ্ছা আর স্বাধীন ইচ্ছা। এখন ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করে রেখেছেন, আমি এই জগতের লোক, আমার এখানে মন আছে, আমার মনের কোন স্বাধীন ইচ্ছা হতে পারে না। কারণ এই মেশিনকে ঈশ্বর চালাচ্ছেন। খ্রীশ্চানিটি আর বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান খ্রীশ্চানিটিকে আধার করে চলে, এরা সারা বিশ্বের যে কি সর্বনাশ করে রেখেছে কল্পনা করা যায় না। একজন ঋষির চিন্তা-ভাবনা, সেটাকে নিয়ে লাফাচ্ছে। তারপর বিজ্ঞান এসে একটা করে থিয়োরি দিচ্ছে, চার্চ সেটাকে ধরে নিজের মত একটা সিদ্ধান্ত বানিয়ে নিচ্ছে। আর ওই সিদ্ধান্তকে আধার করে এরা ধর্মের মডেলটাকেই পাল্টে দিচ্ছে। যদি মেশিন হয়, তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা আসবে না, মেশিন যদি তা না হয়, তাহলে নিউটন যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিউটনকে ভুল মানার উপায় নেই। পরে যখন আইনস্টাইনের থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি, বিগব্যাঙ এগুলো এলো, হঠাৎ তখন দেখা গেল চার্চ সেটাকে আধার করে নিজের মত সিদ্ধান্ত দিচ্ছে। তখন একজন ফাদার, উনি একজন বড় পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন, উনি খ্রীশ্চান চার্চকে গিয়ে নিষেধ করলেন – প্লীজ্ এ-রকম কথা আর বলবেন না, আপনারা যেটা বলছেন, আসলে এটা বিজ্ঞান নয়।

সেখান থেকে আমরা যদি আরেকটু উপরে যাই, কম্প্যুটারে যখন আসছি, এই কম্প্যুটার একটা মেশিন। কম্প্যুটারে হল ইয়েস নো, শুধু ইয়েস নো, কিন্তু কম্প্যুটারে ডাটা অনেক বেশি থাকে, সমস্ত ডাটাকে নিয়ে কম্প্যুটার কাজ করে। ইদানিং একটা জিনিস শুনে থাকবেন – artificial intelligence বা big data mining, এত ডাটা থাকে যে, যেটা সুপার-কম্প্যুটার আদিকে চালায়, দেখে মনে হয় আমাদের মতই চলছে। কিছু দিন আগে কলকাতায় একটা রোবট এসেছিল, যে কিনা অনেক কমাণ্ড ফলো করছে, অনেক রকম কথা বলছে। কিন্তু কোন মেশিন মানুষের মত কোন দিন চলতে পারবে না। আমাদের এখানে একজন মহারাজ, artificial intelligenceএর উপর অক্সফোর্ড

থেকে পোস্ট ডক্টরেট করা, উনি মাঝে মাঝে আমাকে এগুলোকে নিয়ে প্রশ্ন করেন। আমি ওনাকে বলি, artificial intelligence কোন দিন মানুষের ধারে কাছে আসতে পারবে না। কারণ যত তুমি artificial intelligence কর, যতই big data mining কর, সবটাতেই কিন্তু থাকবে ওদের – আমার এই সিদ্ধান্ত, আমি এই করব। সব কিছু নিয়ে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াল, এটাই করা হবে।

কিন্তু যেখানে real intelligence, মানুষের মধ্যে যেটা, সেখানে সেটা অনুসরণ করে না। এখানেই মানুষ আর মেশিনে তফাৎ হয়ে যায়। যত বড় সুপার কম্প্যুটার হক না কেন, কোন দিন মানুষের মত হতে পারবে না। একমাত্র মানুষ, যে জানে এটা ঠিক, তাও সে ওটা করবে না। মানুষ জানে যে এটাই ঠিক, কিন্তু ওটা করবে না। কেন? কারণ আমি তোমাকে ছোট করব। বলবেন, ওটাও তো ডাটার মধ্যে পড়ে। আপনি এবার কিন্তু ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছেন সেই গ্রেট মেশিনের চক্করে, কিন্তু তা না। সে জানে এটা করলে কষ্ট হবে। তার কারণ হল, মানুষ ইয়েস নো'তে চলে না, কার্য-কারণ নিয়ে মানুষ চলে না, মানুষ চলে ইমোশানে। কোন মেশিন, কোন দিন ইমোশানকে নিয়ে চলতে পারবে না। রজার পেনরোজ, খুব নামকরা বৈজ্ঞানিক, তাঁর লেখা বিখ্যাত বই হল 'The Emperor's Mind। খুব মোটা বই, অনেকেই বাড়িতে রাখেন, কিন্তু দু-চার পাতা পড়ার পর কেউ কিছু বুঝতে পারে না উনি কি বলতে চাইছেন। আমিও চেষ্টা করেছিলাম পড়ার, দু-চার পাতা পড়ার পর ছেড়ে দিয়েছি, কিছুই বুঝতে পারিনি।

বইটাতে প্রথমেই আছে, একজন একটা মেশিন নিয়ে দেখাচ্ছে, একটা বাচ্চা জিজ্ঞেস করেছে, Can it feel? শুনে সবাই হো হো করে হেসে ফেলেছে। বাচ্চাটা বুঝতে পারছে না, কেন সবাই হাসছে। এই হল সমস্যা। একটা মেশিন কি কোন দিন অনুভব করতে পারবে! কোন দিন পারবে না। এনারা বড় বড় কথা বলছেন, ক্রীক আর ওয়াটসন যখন ডিএনএ বার করল, তখন তারা বলল, আমরা নূতন সিক্রেট বার করে দিয়েছি, এবার নূতন জীবনও বার করে দেব। একশ বছর হয়ে গেল এখনও নূতন জীবন বার করতে পারেনি। একটা জায়গায় গিয়ে মেশিন সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ মেশিন হল মেশিন, মেশিন শুধু বোঝে ইয়েস নো, মেশিন বোঝে কমাণ্ড। মেশিন যতই উন্নতমানের হোক, ইয়েস নোর বাইরে সে যাবে না। মানুষই একমাত্র জানে যে এটা করা ঠিক না, তাও করবে বা এটা করা ঠিক, তাও করবে না। আর কখন কোনটা করবে, এরও কোন ঠিক থাকে না।

গাড়ির চালকদের বলা হয় যে, গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছ, কুকুর বেড়াল তোমার সামনে যদি চলে আসে, তোমার কোন চিন্তা নেই; কারণ ওরা জানে কিভাবে প্রাণ বাঁচাতে হয়, তুমি গাড়িয়ে চালিয়ে যাও, ও ঠিক ওর প্রাণ বাঁচিয়ে নেবে। গরু যদি চলে আসে, তাহলে গরুর পিছন দিয়ে যাও, কারণ গরু শুধু জানে সামনে যেতে হবে। আর যদি দেখ মানুষ এসে গেছে, তখন ইঞ্জিনটা বন্ধ করে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেবে, কারণ মানুষ কোন দিকে যাবে কোন ঠিক নেই। ও তোমার সামনে যাবে, না পিছনে যাবে, না পাশ যাবে কোন ঠিক নেই। কুকুর, বিড়াল নিয়ে চিন্তা নেই, ওরা ঠিক জানে কিভাবে আমার প্রাণ বাঁচাতে হবে। গরু ওসব কিছু জানে না, ও জানে আমাকে সামনে যেতে হবে। আর মানুষ হলে ইঞ্জিন বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যাও। এই হল মানুষের বৈশিষ্ট্য, কারণ মানুষ intelligenceএ চলে না, চলে ইমোশানে। আমাদের খিদে পাওয়া, তেষ্টা পাওয়া, ঝগড়া করা, ভালবাসছি, সব কিছু ইমোশান দিয়ে চলে। Intelligence আর ইমোশান দুজন দুজনকে জড়িয়ে রয়েছে। Intelligence থেকে ইমোশানস্ আসে ইমোশানস্ থেকে intelligence আসে। কোথাও গিয়ে এই মন আর আত্মা, এই দুটোর ভাব ওই জায়গাটায় মেশে, ফলে ওর থেকে যে reaction হয় সেটা অনন্ত।

কর্ম নিয়ে আগেও আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি; কর্ম দুই প্রকার – কর্তব্য আর অকর্তব্য। হিন্দুদের প্রাচীন পরম্পরা যদি দেখা হয়, তাহলে কর্তব্য কর্মের ক্ষেত্রে দেখা যাবে, যেগুলো নিত্যকর্ম, রোজ করতে হয়; সেটাই কর্তব্য কর্ম। যেমন জপধ্যান, পূজা, অর্চনা এগুলো নিত্য করতে

হয়। তারপর হয় নৈমিত্তিক কর্ম, বিশেষ বিশেষ দিনে বা বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবারের বিশেষ অনুষ্ঠানাদি, যেমন বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি, এগুলো সব নৈমিত্তিক কর্ম। তৃতীয় কাম্যকর্ম, ইদানিং কাম্যকর্মের জন্য বেশি পূজাদি কেউ করে না, আগেকার দিনে করা হত। কেউ কিছু চাইছে, আমার সন্তান হোক, তখন তার জন্য একটা বিশেষ পূজা করল। আর শেষে আসে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, জান্তা অজান্তায় অনেক দোষ হয়েছে, তখন তার জন্য বিশেষ কিছু পূজা বা ক্রিয়া বা তীর্থাদি করে দিল।

আজকের দিনে আমরা এই কর্মগুলিকে আদ্যিকালের ধ্যানধারণা বলে যদি ছেড়ে দিই, তাহলেও দেখা যাবে কর্তব্য-অকর্তব্য কর্ম থেকে আমরা এখনও বেরিয়ে আসতে পারিনি। কলকাতার একজন গৃহবধূর জীবনকে যদি নেওয়া হয়, সেখানে দেখা যাবে, তারও একটা সাধারণ বোধ আছে, যেটা তার বাড়ি থেকে শিখে এসেছে, সমাজ থেকে শিখে এসেছে, তার নিজের বোধ থেকে হয়েছে – এটা আমার কর্তব্য এটা আমার অকর্তব্য। আবার অনেক সময় আমরা বলি তোমার কি কোন কর্তব্যবোধ নেই? আপনি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখছেন কিছু মানুষ অন্যায় কাজ করছে, আপনি তাকে আটকাবেন কি আটকাবেন না? একজন লোক খুন করছে, পুলিশকে জানাবেন কি জানাবেন না? এগুলো সব কর্তব্য অকর্তব্যের মধ্যে পড়ে। জপধ্যান করাটাও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, আপনি ভগবানকে ভালবাসেন, ভজন-কীর্তন করাটাও আপনার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কর্তব্যের উপরে আর একটা অবস্থা আছে, যেখানে ইমোশান শুধু নিজেকে নিয়ে চলে। কর্তব্য হল সমাজকে নিয়ে, আরেকটা শুধু নিজের জন্য হয়, যেটা শুধু নিজের স্বার্থে। আমার নিজের ভাল লাগে, তাই করছি – এটা পুরো ইমোশান। সমাজের জন্য যখন করছি, আসলে সেখানেও নিজের ব্যাপারটা জড়ানো থাকে।

যোগে বলা হয়েছিল যে, সমাধি মানে – মনে কোন ধরণের কোন ভাব নেই। ভাব মানে ইমোশান, মনে যদি কোন ইমোশান থাকে, যদি আপনার মনে হয়, আমাকে এখন কিছু করতে হবে; তার মানে আপনার মনে একটা চিন্তা এসে গেল। কর্তব্য – যে কোন কর্তব্য, বৈধী কর্তব্য, পূজা কর্তব্য, ভক্তি কর্তব্য, যে কোন কর্তব্যের কথা যখন আপনি বলছেন, তখন আপনার মনে কিন্তু ইমোশানস চাড়া মারছে। এখানে শুধু কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না। কার্য-কারণ থেকেও বেশি এগিয়ে, যেখানে আপনার অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্ব যে ইমোশানটাকে নিয়ে আসছে, সেটাই তাকে চালায়। একজন লোক একটা ভুল কাজ করে, সে হয়ত ধূমপান করে। লোকটি জানে ধূমপান করলে তার স্বাস্থ্যের হানি হয়। প্রত্যেক সিগারেটের খাপে বড় করে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ করা আছে, তাও লোকে ধূমপান করছে। কোথাও তার অস্তিত্বের একটা ব্যাপার আছে, যেখানে গিয়ে দেখছে আমাকে এটা করতে হবে। Opposing কক্ষণ instruction machine নিতে পারে না। যার জন্য যখন ফিজিক্স আদিতে এলো, ইলেক্ট্রন এটা ওয়েভ, এনার্জি প্যাকেজ আবার এটা একটা পার্টিকেল। এটাকে বৈজ্ঞানিকরা নিতে পারছেন না। মেশিন পরিষ্কার, হয় এটা হবে, নয়ত ওটা হবে।

সমাধি মানেই ইমোশান জিরো, আপনার বুদ্ধি যেটা করছে সেটাও শূন্য, মন পুরোপুরি স্থির। রাজযোগে এগুলোকেই বিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতক্ষণ যেটা আমরা বললাম এটা টেকনিক্যাল, শুনে আপনাদের হয়ত একটু একঘেঁয়েমি লাগতে পারে। কিন্তু যদি ইমোশান আর ইন্টেলিজেন্স এই দুটো জিনিসকে একবার বুঝে নেওয়া হয়, বাকি জিনিসগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঠাকুর এখানে কথাটা বলছেন – সমাধি মানে কর্মত্যাগ। কর্ম মানেই, মন তখন চাড়া মারছে আর বলছে, এটা করো, ওটা করো। সকাল হল, আপনার মনে হল, আমি রোজ মন্দিরে যাই, আমাকে এখন তাই মন্দিরে যেতে হবে – এই চিন্তাটা ধাক্কা মারতে শুরু করল। বলছেন, "**পূজা-জপাদি কর্ম, বিষয়কর্ম সব ত্যাগ হয়**"। ঠাকুর দুটো জিনিসকে নিয়ে আসছেন – বৈদিক কর্ম ও বিষয়কর্ম। সমাধি মানে সমস্ত কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। বাবা-মার প্রতি কোন কর্তব্য থাকে না, সমাজের প্রতি কোন কর্তব্য থাকে না।

অনেক আগেকার কথা, স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ আমাদের খুব মজা করে বলতেন। আগেকার দিনে, এই ষাট-সত্তর সালে খুব বেশি লোক বেলুড় মঠে আসত না। আশির দশকেও আমরা দেখেছি আরতির সময় মন্দির অর্দ্ধেকরও বেশি ফাঁকা থাকত। গুরু পূর্ণিমার দিনে প্রসাদ নিতে কয়েকজন লোক মাত্র আসতেন। আর পয়সা-কড়ি বেলুড় মঠের কোন কালেই ছিল না, এখনও নেই। আরতির সময় সব মহারাজরা আরতিতে চলে যেতেন। শুধু একজন মহারাজ পুরনো মিশন অফিসে বসে থাকতেন। একবার ঠিক আরতির সময় গুজরাত থেকে কয়েকজন লোক বেলুড় মঠে এসেছে। অফিসে একজন মহারাজ বসে আছেন দেখে তাঁকে বেলুড় মঠ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে। আরতির আওয়াজ আসছিল, জানতে চাইল, 'ওটা কিসের আওয়াজ আসছে'? মহারাজ বললেন, 'ঠাকুরের আরতি হচ্ছে, আরতির আওয়াজ আসছে'। 'তাহলে আপনি কেন আরতিতে না গিয়ে এখন এখানে বসে আছেন'? খুব মজার প্রশ্ন, 'মঠে আরতি হচ্ছে, আপনে এখানে কেন বসে আছেন'? মহারাজ বললেন, 'এখানে বসে থাকাটাই আমার এখন ডিউটি'। মঠে তখন দারোয়ান বেশি থাকত না, একজনকে তো অফিসে থাকতে হবে। ভদ্রলোক তখন হেসে বলছেন, 'সন্ন্যাসীর আবার কিসের ডিউটি'? হিন্দুদের ধর্মভাব মানুষের মনে কত গভীরে ঢুকে আছে, এই একটা কথাতেই বোঝা যায়। একজন সাধারণ মানুষ কোথায় গুজরাত থেকে বেড়াতে এসেছে, সাধুকে বলছে, সন্ন্যাসীর আবার কিসের ডিউটি।

আমাদের ছিলেন স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ, খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। কম বয়সে তাঁর বয়সে সন্ন্যাস হয়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগ সময় তিনি হরিদ্বারে থাকতেন। হরিদ্বারে গঙ্গা আরতি হয়, উনিও সেখানে আরতি দেখতে গেছেন। ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে আরতি দেখছেন। তখন গ্রামের একজন লোক ওনাকে আলাদা ডেকে বলছেন, 'বাবাজী আপনি এখানে কেন এসেছেন'? 'গঙ্গা আরতি দেখতে'। 'আমরা গৃহস্থ মানুষ, সংসারে পড়ে আছি, ধর্মকর্ম খুব বেশি করতে পারি না। আমরা কখন সখন যখন সুযোগ পাই তখন এগুলো দেখতে আসি যাতে একটু ধর্মকর্ম করা হয়। আপনারা তো নিত্য এই ধর্মে পড়ে আছেন, আপনাদের জন্য এগুলো কেন লাগবে'? এই যে সন্ন্যাসী, তার কোন কর্ম নেই – বৈদিক কর্মও নেই, বিষয়কর্মও নেই। কর্তব্য বলে কিছু নেই, আমি করছি ঠিকই, কিন্তু কোন কর্তব্যবোধে করছি না। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, সব সন্ন্যাসীরই কি কর্তব্যবোধ চলে যায়? না, তা যায় না, তবে সন্ন্যাসী, যিনি এই পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁরা এখন এই পথে এগোতে চেষ্টা করছেন। তাই বলে যে উদ্দেশ্য পুর্তি হয়ে গেছে তা তো না।

যে পান বিক্রি করে সেও বিজনেসম্যান, ওদিকে টাটা, বিড়লারাও বিজনেসম্যান। যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি কি করে পেট চালাও? বিজনেস করে। কিসের বিজনেস? পান বিক্রি করি। তার মানে সবাই যে টাটা, বিড়লা হয়ে গেছে তা তো না। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যেন কখন হারিয়ে না যায়।

সমাধির ব্যাপারে ঠাকুর অনেকবারই বলেছেন, যেমন এক জায়গায় বলছেন – সমস্ত মন কুড়িয়ে এক জায়গায় চলে আসে। আমরা এটাকে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করলাম। কিন্তু যেটা মূল কথা, সমাধি হলে মন খসে যায়; আর মন যতক্ষণ না খসে যাচ্ছে সমাধি হবে না। ফলে কি হয়, লোকেরা জোর করে মনের সব রকম ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দেয়। পুরো উত্তরাখণ্ডের সাধুসমাজ তাই। কিন্তু এখানে বলছেন, বিষয়কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। বিষয়কর্ম তাঁর ত্যাগ হয় না। নিজের খাওয়া-দাওয়া, নিজের যে থাকা, চলা-বসা, ওখানে ঠিক আছে। মাতাল যতই মাতলামি করুক, ওর পকেটে কেউ যদি হাত দেয় সঙ্গে সঙ্গে খপ্ করে হাতটা ধরে নেবে, ওখানে সে কাউকে হাত দিতে দেবে না।

প্রথমে কর্মের বড় হৈ-চৈ থাকে। এখানে কর্ম মানে বৈদিক কর্ম ও বিষয়কর্ম দুটোই আসছে। বৈদিককর্ম বলতে পূজা-জপাদি কর্ম। প্রথমের দিকে বৈদিককর্ম ও বিষয়কর্ম, দুটোতেই খুব হৈ-চৈ থাকে। মহারাজরা আমাদের বলতেন, রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করার পর মোটামুটি পনের-কুড়ি বছর পার করার পর স্টেডি হতে শুরু হয়। প্রথম পনের-কুড়ি বছর যেটা করছে, ওর কোন দাম নেই। মনে হবে

যেন বিরাট তপস্বী, বিরাট ত্যাগী; কোন দাম নেই, পনের-কুড়ি বছর যাক। সন্ন্যাসীদেরই স্থিত হতে কত সময় লাগছে, তাহলে ভাবুন সংসারে যে ভক্তরা আছেন তাদের কত সময় লাগবে। কারণ, সবাই ইমোশানসে চলে। ঠাকুরের মন্দিরে বসে একটু জপ করতে করতে মন বসে গেল, কিংবা একটু রোমাঞ্চ হল, মনে করছে, বিরাট কিছু হয়ে গেল। কিছু দিন পরে বুঝতে পারেন, ওগুলো কিছুই না। নূতন বন্ধুত্ব হলে বেশি বেশি কথা বলে, নূতন প্রেম হলে বেশি বেশি কথা বলে। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের প্রতি নূতন ভক্তি উদয় হলে, একটু লাফালাফি করে, কয়েকদিন পর থেকে ধীরে ধীরে স্থিত হতে শুরু করে।

আগেকার দিনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তিরিশ বছর চল্লিশ বছর হয়ে গেছে, এরপর তাদের মধ্যে হয়ত সেই রকম কোন কথাবার্তাও হয় না, কিন্তু এমন একটা আস্তিত্ব এসে গেছে যে, একের অস্তিত্বকে অপরের অস্তিত্ব ছাড়া ভাবা যায় না। ভক্তিতে ঠিক তাই হয়। সাধনার অবস্থায় এই ভাব, সকালে এক ঘন্টা জপ করতে হবে, সন্ধ্যেবেলা এক ঘন্টা করতে হবে। পরে এগুলো সব উড়ে যায়, তখন একটাই থাকে, এটাই তো আমার জীবনধারা।

আমাদের ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে পুকুর আছে, পুকুরে মাছ আছে। এখানকার কর্মচারীদের মাঝে মাঝে দেখি ওদের কেউ কেউ পুকুরে গিয়ে ঝাঁপ মারে, স্নান করে, স্নান করে উঠে আসে। আর ওই পুকুরে যে মাছগুলো আছে, ওরা পুকুরের মধ্যে সব সময় আছে, সব সময় খেলা করছে। যিনি সাধনার গভীরে চলে গেছেন, তা তিনি সন্ন্যাসীই হন আর গৃহস্থই হন, এনারা পুকুরের মাছের মত হয়ে যান। সব সময় জলের মধ্যেই আছেন, যা কিছু সব জলেই। পুরী, দীঘার সমুদ্র দেখতে যারা যায়, কলকাতা থেকে গিয়ে প্রথমবার ওই বিশাল সমুদ্র যেই দেখল, তখন একবার ঝাঁপ মারে, একবার সাঁতার কাটে, একবার চিৎ হয়ে স্নান করবে, একবার উপুড় হয়ে স্নান করবে। কিন্তু মাছগুলো ওর মধ্যেই আছে, ওদের কাছে কোন কিছুই কোন ব্যাপার না। কর্মের হৈ-চৈ মানে পুজো, জপ এইগুলো।

একই জিনিস বলছেন, **যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নামগুণগান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়**। প্রথমের দিকে পড়লে ঠাকুরের এই কথাগুলো বোঝা যাবে না। নামগুণগান বন্ধ করলে সাধনা কি কর হবে? সাধনা না করলে ঈশ্বরের দিকে এগুবে কি করে? ঠিকই বলছেন, নামগুণগানের জন্যই আছে। নামগুণ যেটা হয়, সেটাও ইমোশানস্ থেকেই আসে। প্রথমের দিকে যে নামগুণগান করছেন, সেটা কর্তব্যবোধ থেকে আসছে, আমাকে করতে হবে। সেখান থেকে নামীর প্রতি একটা ভালবাসা জন্মায়। এরও উপরে যখন যায়, তখন সে বিধি-নিষেধ দুটোকে পার করে যায়। তখন কর্তব্য-অকর্তব্য, ভালবাসা-অভালবাসা সব বন্ধ হয়ে যায়। মনটা তখন ধীরে ধীরে স্থির হয়ে আসে। যত এই স্থৈর্যের দিকে যাবে তত ভাল আর মন্দ দুটোই বন্ধ হয়ে যায়। যে নামগুণগান নিয়ে সে সব সময় থাকতে চাইছে, সেই নামগুণগানটাও বন্ধ হয়ে যায়। গীতাতে বলছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*; হিন্দু ধর্মের এটাই শেষ কথা। বেদ সব সময় তিনটে বিষয়কে নিয়ে বলে, তুমি এই তিনটে গুণ ও সমস্ত রকম দ্বন্দ্বের পারে চলে যাও। অর্থাৎ বলতে চাইছেন, মনে কোন চাঞ্চল্য থাকবে না। মন সব সময় সত্ত্ব, রজ, তম দিয়ে বাঁধা; চাঞ্চল্য তো হবেই। কিন্তু এর পারে অবস্থিত হতে হবে।

যাঁরা ঠাকুরের এই কথাগুলো শুনছেন তাঁরা হয়ত কিছুই বুঝতে পারছেন না। সেইজন্য ঠাকুর এবার খুব সহজ উদাহরণ নিয়ে আসছেন। আসলে যখনই কেউ খুব ভাল উদাহরণ বা উপমা দেন, তখন বুঝতে হয়, ইনি পুরো জিনিসটাকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। উপমার কথা বললেই বলা হয়, উপমা হল কালিদাসের। কালিদাস জিনিসটাকে জানতেন, কালিদাস ভাষা জানতেন, সৌন্দর্য বোধ ছিল, বিষয়কে বুঝতেন, সেইজন্য সুন্দর সুন্দর উপমা দিতেন। ঠাকুর আধ্যাত্মিক জগতের রাজা, তিনি যদি বোঝাতে চাইতেন, দেখবেন আলাদা আলাদা জায়াগায় আলাদা আলাদা উপমা নিয়ে আসছেন, উপমাতে তিনি ছিলেন মাস্টার। যিনি মাস্টার তিনি বোঝানর জন্য যে কোন ধরণের উপমা নিয়ে আসবেন।

শিবনাথকে ঠাকুর বলছেন, **যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি তোমার নাম, গুণকথা অনেক হয়েছে। যাই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সে-সব কথা বন্ধ হয়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, 'এই যে শিবনাথবাবু এসেছেন'। তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হয়ে যায়**। আসলে কি হয়, আমরা এই জগতের মধ্যে আছি, জগতে পঞ্চাশটা জিনিস আছে, জগতে ভাল আছে, মন্দ আছে। এই জগৎ থেকে যখন বেরোতে হবে, প্রথমে জগতের ভাল জিনিসে মনকে একাগ্র করে জগতের মন্দ জিনিসগুলিকে বাদ দিতে হয়। এরপর মন্দ জিনিসগুলি বেরিয়ে গিয়ে ভালটা জমে গেল, শেষে ওটাও বাদ চলে যায়। এর উদাহরণ দিচ্ছেন, মনে করুন আপনি কোন সভায় গেছেন, সেখানে বড় কারুর আসার কথা, ফিল্মস্টার বা ক্রিকেটস্টারের আসার কথা। লোকেরা সবাই তাঁকে নিয়ে কথা বলছে। তিনি যখন সেখানে এসে হাজির হলেন, তখন কে আর তাঁকে নিয়ে কথা বলবে, সব কথা বন্ধ। সেখান থেকে আরও সহজ উদাহরণ দিচ্ছেন, ঠাকুরের নিজের জীবনের খুব নামকরা কথা বলছেন।

আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে, হাতের আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। পাঁচ রকমের যজ্ঞের কথা এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি, এবং অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনাতেও পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা অনেকবার এসেছে। হিন্দুরা মনে করে প্রত্যেকের পাঁচ রকমের ঋণ হয় – ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ, মনুষ্যঋণ আর ভূতঋণ। ঋষি, দেবতা, পিতৃগণ, মানুষ আর ভূত; আমাদের জীবন এই পাঁচজনকে নিয়ে চলে। পিতৃঋণ মানে, মা-বাবা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, পূর্বপুরুষদের বংশধারা দিয়ে আমাদের এই শরীর তৈরী হয়েছে, সেইজন্য তাঁদের প্রতি আমাদের একটা ঋণ আছে, যেটা আমাকে শোধ করতে হবে, সেটার জন্য তর্পণ করা হয়। হিন্দুরা তাই আগেকার দিনে পুকুর, নদী আদিতে স্নান করার সময় হাতে জল নিয়ে পূর্বপুরুষদের নামে তর্পণ করতেন। এখন প্রত্যেক দিন না করে শুধু মহালয়ার দিনে পিতৃতর্পণ করেন। তবে যাঁরা আচারি লোক, তাঁরা এটা নিত্য করেন। ঠাকুর আগে এগুলো করতেন না। একদিন তাঁর ইচ্ছে হল পূর্বপুরুষদের নামে তর্পণ করবেন। অঞ্জলিবদ্ধ করে জল নিতে গিয়ে দেখছেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে।

তখন হলধারীকে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা, একি হল! হলধারী বললে একে গলিতহস্ত বলে। ঈশ্বরদর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম থাকে না। যে কোন কর্ম যখন করা হয়, বৈদিক কর্মই হোক আর বিষয়কর্মই হোক, আমি-তুমি ভেদ আছে বলেই কর্ম করা হয়। আমি আর তুমিকে সংযোগ করে ক্রিয়া। সেইজন্য যেখানে আমি-তুমি ভেদ মুছে গেছে, সেখান ক্রিয়াও থাকবে না। সেখানে বিষয়ক্রিয়াও থাকবে না, বৈদিক ক্রিয়াও থাকবে না। এরপর আবার সঙ্কীর্তনাদির কথা বলছেন।

সংকীর্তনে প্রথমে বলে 'নিতাই আমার মাতা হাতি'! 'নিতাই আমার মাথা হাতি'। ভাব গাঢ় হলে শুধু বলে 'হাতি! হাতি'! তারপর কেবল 'হাতি' এই কথাটি মুখে থাকে। শেষে 'হা' বলতে বলতে ভাবসমাধি হয়। তখন সে ব্যক্তি, এতক্ষণ কীর্তন করছিল, চুপ হয়ে যায়। দেখবেন, যাঁরা সত্যিকারের খুব উচ্চমানের গায়ক, যখন গান ধরেন তখন খুব সেজেগুজে, চাদর গায়ে দিয়ে গান করতে শুরু করেন। যতই গানের গভীরে যাচ্ছেন, আস্তে আস্তে সব খসে পড়ে যেতে থাকে, কোন হুঁশ থাকে না। চাদর কোথায় খসে পড়ে গেল, কোন হুঁশ নেই, গানের গভীরে ঢুকে যাচ্ছেন। সেই জায়গাতে গিয়ে মন একেবারে হারিয়ে যায়, এমনকি গানের যে শব্দগুলি বলছিলেন, সেগুলোও হারিয়ে যায়। উচ্চমানের গায়করা যদি গান দিয়ে সাধনা করেন, তাহলে কিন্তু তিনি একটা স্তরের পর গান করতে পারবেন না। ঠাকুর একটার পর একটা উদাহরণ নিয়ে আসছেন, যাতে এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারি।

যেমন ব্রাহ্মণভোজনে – প্রথমে খুব হৈ-চৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে করে বসলে, তখন অনেক হৈ-চৈ কমে গেল, কেবল 'লুচি আন' 'লুচি আন' শব্দ হতে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারি খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ করে গেছে। যখন দই এল তখন সুপসুপ (সকলের হাস্য) – শব্দ নাই বললেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

তাই বলছি, প্রথম প্রথম কর্মের খুব হৈ-চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই কর্ম কমবে। শেষে কর্মত্যাগ আর সমাধি। এরপর বলছেন, গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্ব হলে শাশুরি বউমার কাজ কিভাবে কমিয়ে দেয়। গর্ভস্থ শিশু যত বড় হতে থাকে, তত তার কাজ কমিয়ে দেওয়া হয়। কাজ একটু করতে হয়। তারপর সন্তান হয়ে গেলে, তখন সেই শিশুকে নিয়েই মা শুধু নাড়াচাড়া করে। আগে আমর এর ব্যাখ্যা করেছি।

সমাধিস্থ হবার পর প্রায় শরীর থাকে না। আগে বলা হয়েছিল – বৈদিক কর্ম চলে গেল, সেখান থেকে সামাজিক কর্মগুলি, যেখানে কর্তব্যবোধ রয়েছে; সেটাও চলে যায়। কিন্তু তারপরে যে কর্মগুলি পড়ে থাক, খাওয়া-দাওয়া, সাজপোশাক, এগুলোও চলে যায়। ফলে কি হয়, তার শরীর থাকে না। মানে শরীরের দিকে তাঁর মন থাকে ন, খাওয়া-দাওয়াটাও তাঁর দ্বারা ঠিক মত হয় না। আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠতে পার। তাহলে সমাধিতে গিয়ে কি হবে, যদি শরীরই না থাকে? শরীরই যদি চলে যায় তাহলে সমাধি কেন? আসলে কি হয়, একটু ঈশ্বরের পথে এগোলে মনে যে শান্তি আসে, যে আনন্দ আসে, সেটা ধীরে ধীরে মানুষকে আরও গভীর নিয়ে চলে যায়। তখন এই সংসার, যেটাকে আমাদের মনে হয় বিরাট কিছু, সেই বিরাট কিছু আর বিরাট থাকে না, খড়কুটো মনে হয়।

এতক্ষণ সমাধি নিয়ে বলে গেলেন। এবার বলছেন সমাধির পরে আরেকটা জিনিস কি হয়। **কারু কারু লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে – যেমন নারদাদির। আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের**। এখানেও উদাহরণ দিচ্ছেন। **কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে, কেহ কেহ ঝুড়ি-কোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয় – ভাবে, যদি পাড়ার কারুর দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর**। এখানে আমাদের কাছে ভগবান বুদ্ধের খুব সুন্দর উদাহরণ আছে। ভগবান বুদ্ধ সাধনা করে সিদ্ধি পেলেন, কিন্তু সাধনার সময় মাড় এসে ভগবান বুদ্ধকে অনেক প্রলোভন দেখাতে লাগল। ভগবান বুদ্ধ কোন প্রলোভনের ফাঁদে পা দিলেন না, কোন কিছুতে তিনি লুব্ধ হলেন না। শেষ প্রলোভন বুদ্ধকে বলছেন, 'তুমি কেন লোকেদের এই শিক্ষা দিতে যাচ্ছ? যাদের জ্ঞান হবার তাদের জ্ঞান হবেই, যাদের হবার নেই, তাদের হবে না; মাঝখান থেকে তুমি কেন এতে নামছ'? ভগবান বুদ্ধের মনে হল যে, ঠিক কথাই যেন বলছে।

এই জিনিস বেদান্তেও দেখা যায়। যিনি জ্ঞানী, তাঁর জন্য তো শাস্ত্র নয় আর যে অজ্ঞানী, শাস্ত্র পড়ে তার কিছুই হবে না। তাহলে শাস্ত্র রাখার কি দরকার? গীতাতে এই আলোচনাগুলি নিয়ে আসা হয়েছে। বেশির ভাগ লোকের যে বুদ্ধি আছে বলি, আসলে সেটা দুর্বুদ্ধি, এরাই এইসব তর্ক নিয়ে আসে। ভগবান বুদ্ধের মনে তখন করুণার উদয় হল। তিনি দেখছেন, জগতে মানুষের কত কষ্ট। এই জিনিসটাই রামকৃষ্ণ ভাবধারাতে খুব সুন্দর দেখা যায়। নরেনকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে, তুই কি চাস? নরেন বলছেন, আমি চাই সমাধিতে ডুবে থাকতে। শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর যখন লোকের কল্যাণের জন্য থাকতে বলছেন, মাও রাজী হচ্ছেন না। ঠাকুর কিন্তু এক এক করে সবাইকে টেনে ওতেই লাগিয়ে দিচ্ছেন।

এটা খুব interesting, এই রহস্যটা ঠিক পরিষ্কার নয়, এটা কেন হয়, কারুর কাছে স্পষ্ট না। ঠাকুর এখানে বলছেন, **এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হল**। যাঁরা জ্ঞানী, জ্ঞানলাভ করে নিজেই বুঁদ হয়ে আছেন, ঠাকুর এনাদেরকে স্বার্থপর পর্যন্ত বলছেন। তবে যে অর্থে আমরা স্বার্থপর বলি, সেই অর্থে হয়ত ঠাকুর বলছেন না। কিন্তু বলতে চাইছেন, তুমি যদি অপরের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা না কর, তাতে হলটা কি।

এখানে অনেকগুলো ব্যাপার হয়। প্রথম কথা হল, যাঁরা সত্যিকারের ঈশ্বরের পথে চলে যান, সাধনার পথকে জীবনধারা করে নিয়েছেন, তাঁরা তো প্রথমেই সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন; সংসার তাঁর কাছে একটা বিরক্তির জায়গা। ফলে জগতের মঙ্গল করতে তাঁর ভারি বয়ে

গেছে। প্রথম থেকে একটু ভালবাসা যদি না থাকে, যেমন ভগবান বুদ্ধ ঘরবাড়ি ছেড়েছেন ঠিকই, কিন্তু ওনার জীবনী পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, ওনার মধ্যে ভালবাসাটা ছিল। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ছিল, সন্তানের প্রতি ভালবাসাও অবশ্যই ছিল। কিন্তু জগতে যে পরিমাণ দুঃখ সেখানে ভালবাসাটাও সেই পরিমাণে অনেক বেশি দরকার। স্বামীজী – তাঁর মায়ের প্রতি ভালবাসা ছিল, ভাই-বোনদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল। কিন্তু সমাজে যে কল্যাণ করা হবে, এখানে দুঃখ অনেক বেশি। কিন্তু সবাই এভাবে সমাজের দুঃখে কাতর হন না। অনেকে যেমন নিজের দুঃখে জগতের প্রতি তিতিবিরক্ত হয়ে বলেন, আমি এই জগৎ থেকে বেরোতে চাই, আমার আর কিছু লাগবে না। বেশির ভাগ লোক যাঁরা সাধনার পথে যান, ঈশ্বরের পথে যান, তাঁরা এই ধরণের লোক হন।

দ্বিতীয় আসে অবতারের কথা, এটা আরও interesting, আমরা যদি দূর থেকে পুরো বিষয়টাকে দেখি, জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর তফাৎ যদি দেখা হয়; তখন দেখি ঠিক ঠিক যিনি জ্ঞানী, যাঁর সমাধিলাভ হয়েছে, তিনি দেখেন ঈশ্বরই কর্তা; তিনি দেখেনে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। এরপর তিনি কাকে শিক্ষা দেবেন, উপদেশই বা কাকে দিতে যাবেন? অন্য দিকে আছেন অজ্ঞানীরা, যাঁরা নিজেরাই অজ্ঞানে আছেন, তাঁরা কাকে শিক্ষা দেবেন? অবতাররা হলেন unusual। অবতাররা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত অথচ যারা অজ্ঞানে আছে তাদের অজ্ঞানী দেখেন। এটাকেই বলে ভাবমুখ। এটা খুবই unusual। একমাত্র যাঁরা অধিকারপ্রাপ্ত তাঁরাই পারেন অপরের দুঃখে কাতর হতে, এনাদের বাইরে জগতের দুঃখে কাতর হওয়া যায় না। আপনি হয় অজ্ঞানী, না হয় জ্ঞানী। যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। রাজা মহারাজ তাঁর শিষ্যদের বলছেন, 'আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাই, কিন্তু যখনই ঈশ্বরীয় ভাবে চলে যাই, তখন তোমাদের দেখছি নারায়ণ; নারায়ণকে কি উপদেশ দেব আমি'? ভগবান বুদ্ধ, ঠাকুর, স্বামীজী; এনারা হলেন একটা বিশেষ শ্রেনীর; জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু অজ্ঞানকে অজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখেন। ফলে তাঁদের মনে করুণার উদয় হয়, অজ্ঞাননাশের জন্য তাঁরা তখন ধর্মোপদেশ দেন।

এরপর ঠাকুর আলোচনাটাকে একটু হাল্কা করে দিচ্ছেন – **স্বার্থপর লোকের কথা তো জানো। এখানে মোত্ বললে মুত্‌বে না, পাছে তোমার উপকার হয়। (সকলের হাস্য) এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুষে চুষে এনে দেয়। (সকলের হাস্য)** স্বার্থপর মানে exclusive, নিজেরটুকু ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

কিন্তু শক্তিবিশেষ। সামান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখি এসে বসলে ডুবে যায়। কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। এ-কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। উত্তরকাশী, হৃষিকেশের ওদিকে গেলে অনেক সাধু দেখা যায়। এনারা সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যান। এনারা জানেন আমার মন এখনও কাঁচা। এই কাঁচা মন নিয়ে আমি যদি সমাজের সাথে মেলামেশা করতে যাই, তাহলে সাধনা করে আমার দুধটা একটু যে গাঢ় হয়েছে, দুধের এই গাঢ়ত্বটা সমাজের জলে মিশে নষ্ট হয়ে যাবে। মঠে নূতন জয়েন করার পর সমাজ, পরিবার, ভক্ত, বন্ধুবান্ধব, এই জিনিসগুলি থেকে প্রচুর সাবধান করা হত। কারণ হল, একা একা থেকে নূতন নূতন ব্রহ্মচারীরা খাটছে, এতে তাঁদের জোলো দুধটা একটু একটু করে গাঢ় হতে থাকে। কিন্তু যেমনি আবার সমাজে গিয়ে মিশতে গেল, গাঢ় দুধটা আবার জোলো হয়ে গেল। ফলে কি হয়, এনাদের যদি জ্ঞান আদি থাকে, এনারা অপরের সঙ্গে ভাগ করতে চান না। এনারা ভয়তারাসে, কোথায় কি গোলমাল হবে জানা নেই, বহু কষ্টে এত দূর এসেছে, গোলমালে সবটাই যাবে। কিন্তু যিনি এগিয়ে গেছেন, তিনি জানেন আমার এগুলো লাগবে না। সেইজন্য এনাদেরকে বলছেন, বাহাদুরী কাঠ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাপদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা

শুরু করার আগে একটা সাধারণ জিনিস আলোচনা করে নিলে আজকের বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে। ঠাকুর এখানে নিন্দা করছেন – ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা খুব বেশি মাত্রায় ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের বর্ণনা করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমাদের যে আলোচনাগুলো আছে, ওই আলোচনার ভূমিকাগুলি যদি মন দিয়ে শোনেন, তাহলে দেখতে পাবেন ওই জায়গাতে – ধর্মের উৎপত্তি কোথা থেকে, এই জিনিসটাকে নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা করা হয়। লোকেদের একটা ভুল ধারণা হল, ধর্ম বিশ্বাসে চলে। ধর্ম আদপেই বিশ্বাসে চলে না। যাঁদের মন পবিত্র, যাঁদের মধ্যে কোন স্বার্থ নেই; এনারা যখন ধ্যানের গভীরে যান, সেখানে তাঁরা সমাধির অবস্থায় চলে যান।

এই ধ্যান যে কোন ভাবে হতে পারে; যেমন প্রফেট মহম্মদ শুধু প্রার্থনা করতেন, ঠাকুরও শুধু প্রার্থনা করে, যীশু খ্রীষ্টের ব্যাপারে বলা খুব মুশকিল, কারণ ওনার কিছুটা প্রার্থনা ছিল, কিন্তু বেশির ভাগটাই তাঁর ছিল ধ্যান, কারণ ওনার মূল যে ঘটনা – তাতে দেখা যায়, সাধনার তিনটি বছর তাঁর সম্বন্ধে কারুরই কিছু জানা নেই। ভগবান বুদ্ধ ধ্যানকেই পুরোপুরি তাঁর সাধনার অঙ্গ করে নিয়েছিলেন। তার মানে ধ্যান বিভিন্ন ভাবে হয়। যদি সাধনাকে পর পর সাজাতে চান, তাহলে প্রথমে আসবে প্রার্থনা, প্রার্থনার পর আসবে ধ্যান। এই দুটি পথ, অর্থাৎ ভক্তিপথ আর জ্ঞানপথ মোটামুটি মানুষকে সমাধিতে নিয়ে যায়। আমরা যাঁদের অবতার বলি, একমাত্র ইসলামই অবতার মানে না, তাঁদের কাছে হল পয়গম্বর। কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান শ্রীরামকৃষ্ণের যেভাবে হয়েছে বা যীশু খ্রীষ্টের যেভাবে হয়েছে, মহম্মদেরও সেভাবে হয়েছে। ইসলাম অবতার মানে না, সেটা আলাদা জিনিস, কিন্তু সেই ঈশ্বর যিনি অনন্ত, তিনি পার্থিব যা কিছু আছে সব কিছুর পারে। এই সত্যকে তিনি যখন জেনে গেলেন, জিনিসটা এই, তখন ওনার মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না। জেনে যাওয়ার পর তিনি শিক্ষা দিতে শুরু করেন। শিক্ষা তিনি কাকে দেবেন বলা মুশকিল।

প্রফেট মহম্মদ যে জনজাতিতে ছিলেন, ওখানে ধর্মের কোন কালচার ছিল না। প্রফেট মহম্মদকে আল্লা বলে দিলেন, তুমি লোকেদের শিক্ষা দাও, কিন্তু কাকে তিনি বলবেন। সেখানে জিউসরা ছিল, খ্রীশ্চানরা ছিল, তারা এদের উপর হাসত – এরা হল আরবের ট্রাইবালস, এরা আনকালচার, কথায় কথায় খুন করে, এই বিয়ে করল, বিয়ে করে ফেলে দিল। এদেরকে বলত, দেখ, ভগবান আমাদের দূত পাঠিয়েছেন; কিন্তু তোমরা এমনই হতচ্ছাড়া যে তোমাদের কোন প্রফেট নেই। সেইজন্য প্রফেট মহম্মদ যখন জেনে গেলেন যে, আল্লার কথা বলতে পারছেন না। প্রথম তিনি বললেন তাঁর স্ত্রী খালেদাকে। খালেদা কিন্তু মহম্মদের কথাগুলোকে বিশ্বাস করেছে। এই করে ধীরে ধীরে মহম্মদ আরও একজন, দুজনকে বললেন। এই করে করে কিছু শিষ্য হল। ইতিমধ্যে মহম্মদের কথাও ছড়াতে শুরু হয়ে গেছে। মহম্মদের কথা ছড়িয়ে যেতেই তাঁর উপর আক্রমণ নেমে এল। মক্কা থেকে মদিনা তিনি প্রাণ ছেড়ে পালালেন। তিনি অবতারই হন, তিনি প্রফেটই হন, ঋষিই হন, ঈশ্বরজ্ঞান লাভের পদ্ধতি একই। এরপর তাঁর দরকার হয় শিষ্যের। কিন্তু বিখ্যাত কথা – গুরু পাওয়া যায় শিষ্য পাওয়া যায় না। ঠাকুর কুঠিয়ার ছাদে উঠে চিৎকার করতেন, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, বিষয়ীদের সাথে কথা বলে বলে আমার মুখ জ্বলে যাচ্ছে। আমরা এতটা এই জিনিসটাকে বুঝতে পারব না।

একটু যদি জপধ্যান করতে শুরু করেন, বা আপনাদের যাঁদের বয়স হয়ে গেছে তাঁরাও যদি একটু জপধ্যান করা শুরু করেন, আর বিষয়-বাসনা থেকে একটু সরে এসেছেন, কিছুদিন পরে দেখবেন বাকিদের সাথে এমনিতেই কথা বলতে ভাল লাগবে না। তাই না, ইয়ংরা বাসে যেতে, ট্রেনে যেতে, রাস্তাঘাটে হৈ হৈ করছে, ওগুলো দেখলে আপনার ভাল লাগবে না; তার মানে মন ওসব জিনিস থেকে সরে আসছে। বয়স্ক মানুষরা যদি সকালে দু-ঘন্টা বিকালে দু-ঘন্টা, এতটুকুও যদি জপধ্যান করেন, চারঘন্টা এমন আহামরি কিছু না, তখন দেখবেন বিষয়ীদের সঙ্গ বা তাদের কথাবার্তা শুনতে ভাল

লাগছে না। বিশেষ করে জপধ্যান করে ওঠার পর আধঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট কারুর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করবে না। এটাই ধীরে ধীরে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আমার 'টিয়া' বইতে দেখবেন, টিয়া প্রথমের দিকে বটবৃক্ষে আছে, সেখানে সব কিছুতে সে জড়িয়ে আছে। কিন্তু বিভিন্ন অনুভূতির মাঝখান দিয়ে যাওয়ার পর শেষে আবার যখন টিয়া বটবৃক্ষে ফিরে এসেছে, তখন আর সে কথা বলছে না। কোথায় অলক্ষ্যে যেন তার মধ্যে কি একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

গুরু আর শিষ্যের মধ্যে এত বেশি তফাৎ থাকে যে, বোঝান সম্ভব না। এখন আমরা কথায় কথায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বলছি, কিন্তু দুজনের মধ্যে কি সাংঘাতিক তফাৎ, এটা ধরা অসম্ভব। যদি একটু বুঝতে হয়, তাহলে এই ঘটনা দিয়ে বুঝতে পারি – ঠাকুর বলছেন, আমি যখন 'ওঁ' বলি তখন আমি একশ হাত নীচে নেমে এসে বলি। ঠাকুর সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, সমাধিতে মন আস্তে আস্তে নামতে নামতে শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওনার মন চলে গেছে সমাধিতে, সেখান থেকে তিনি আবার যখন জগতে ফিরে আসছেন, তখন তিনি বলছেন 'ওঁ' বা 'কালী', বলছেন, তখন তিনি একশ হাত নীচে নেমে এসে এই শব্দ উচ্চারণ করছেন। যাঁরা শুনছেন, তাঁরা কি শুনছেন? একশ হাত নেমে আসাটা হল আগেকার দিনের গ্রামের লোকেদের বর্ণনা, তার মানে অনেকটা নীচে নেমে এসেছেন।

আরেকটা খুব নামকরা ঘটনা। বৈষ্ণবদের তিনটে আদর্শ, সেখানে বলছেন, জীবে দয়া। ঠাকুর বৈষ্ণব মতে সাধনা করেছেন, বৈষ্ণবদের ধর্ম মানেন, সব করেন; কিন্তু জীবে দয়া বলতেই তাঁর হঠাৎ কি একটা ভাব হল, উনি থু থু করতে লাগলেন, আর বলছেন – জীবে দয়া করার তুমি কে? জীবের সেবা।

নরেন সেখানে বসে ছিলেন, তিনি সব দেখে চমকে উঠলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, বেরিয়ে এসে বলছেন – আজ এক নূতন জিনিস শিখলাম, যদি ভগবান কোন দিন সুযোগ দেন আমি এটা করে দেখাব। কোন একটা সাইবারে আমি দেখলাম, সেখানে কোন এক বৈষ্ণব ঠাকুর ও স্বামীজীর নিন্দা করছেন, বিশেষ করে স্বামীজীর – বলে কিনা দরিদ্র নারায়ণ, নারায়ণ কি কখন দরিদ্র হতে পারে? আমি ভাবি এরা সত্যিই কত মুর্খ! স্বামীজী কোথাও 'দরিদ্র নারায়ণ' বলছেন না। স্বামীজী বলছেন, দরিদ্রকে নারায়ণ রূপে দেখ। দ্বৈতবাদীদের এই সমস্যা হয়, বিশেষ করে বৈষ্ণবদের এটা একটা বিরাট সমস্যা। ভাগবত পড়বে, গীতা পড়বে, সব করবে, কিন্তু অদ্বৈত ভাব যখনই আসবে তখন আর সেটাকে নিতে পারে না, ব্রেনের সার্কিটেই নেই, অদ্বৈত ভাব এলে দ্বৈতবাদীদের ফিউজ পুরোপুরি উড়ে যায়। যত ধর্ম আছে, বেশির ভাগই হল দ্বৈতবাদী। আমাদের দেববাণীর যে আলোচনাগুলো আছে, সেগুলো একটু শুনুন বা পড়ুন ব্রেনের ফিউজ উড়ে যাবে, নিতে পারবেন না। আমাদের গীতার আলোচনা শুনে দেখুন, ব্রেনের ফিউজ উড়ে যাবে। গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রে যেখানে অদ্বৈত আসে সেখানে এরা নিজেদের মত ব্যাখ্যা করতে শুরু করে দেবে। ঠাকুর এখানে ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন।

কথামৃতে পরে একটা জায়গায় আসবে, একটা আলোচনা চলছে, সেখানে একজন বুঝতে পারছেন না বক্তার বক্তব্যটা ঠিক কি। তখন তাঁরই একজন বন্ধু পাশ থেকে বলছে, 'আরে আপনি মেনে নিন না'। ঠাকুর শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন, তুমি তো মহা আহাম্মক, না বুঝে মেনে নিতে বলছ? আমাদের এই সমস্যাটা হয়। প্রফেট আর তাঁর যে প্রধান শিষ্য, এই দুজনের মধ্যে যে কি সাংঘাতিক তফাৎ, এটা লোকেদের বোঝান যায় না। এর পরের ধাপে যে শিষ্যরা আছেন, তাদের তো কিছুই বোঝান যায় না। একটা গ্রাম্য গল্প দিয়ে অবতারের প্রধান শিষ্যদের পরের ধাপের ব্যাপারটাকে বোঝান যেতে পারে। গ্রামের রাস্তা দিয়ে রাত্রিবেলা একটা হাতি গেছে। আগেকার দিনে গ্রামের রাস্তা ধুলোর রাস্তা। গ্রামের লোকেরা কেউ কোন দিন হাতি দেখেনি। সকাল হতেই রাস্তায় গ্রামের লোকেরা দেখছে একটা অদ্ভুত পায়ের ছাপ। সবার কৌতুহল, কিসের ছাপ এটা? তখন একজন অনেক ভেবেচিন্তে বলল, 'আমি বুঝে গেছি এটা কিসের ছাপ, তোমরা কেউ বুঝতে পারবে না। একজন লোক পায়ে উখল বেঁধে

রাস্থা দিয়ে হেঁটেছে'। অবতার পুরুষরা ঈশ্বরকে নিয়ে যা কিছু বলেন, সেটা যারা শুনছে, তারা হাতির পায়ের ছাপকে কেউ পায়ে উখল বেঁধে হেঁটেছে ভেবে নেয়। এরপর অবতার চলে গেলেন, আরও কিছু দিন পর অবতারের সঙ্গীরা চলে গেলেন, অবতারের প্রধান শিষ্য চলে গেলেন। আম চলে গেল, থেকে গেল আমের আঁঠিগুলো। এই ব্যাপারটা সব ধর্মে, সব জায়গায় একই হয় – আম চলে যায়, আঁঠিগুলো থেকে যায়। এবার শুরু হয়ে গেল ভক্তির খেলা। ভক্তি যখন করতে শুরু করে, তখন সেখান থেকেই ধর্মটা শুরু হয়। এতক্ষণ ছিল একেবারে শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা।

কিছু দিন আগে এখানে আইআইটির বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকজন অধ্যাপক এসেছিলেন। মঠ থেকে তাঁদের বলা হল আমার সাথে কথা বলতে। অনেকগুলো ইস্যু ছিল, সেগুলোকে নিয়ে বলতে গিয়ে একজন বলছেন, ওনার দীক্ষা নেওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য একবার বেলুড় মঠে এসেছিলেন। বেলুড় মঠে ঢোকার পর যে কোন কারণেই হোক ওনার সেই ইচ্ছাটা চলে গেল। পরে তিনি অন্য জায়গা থেকে দীক্ষা নিলেন। উনি বলছেন, 'আমার অনেকদিন ধরে মনে হত, এই জিনিসটা আমার সঙ্গে কেন হল'। আমি তাঁকে বললাম, 'গ্রামের জমিদার আল দিয়ে যেতে যেতে পিছলে পড়ে গেল। মোসায়েবগুলি হাসাহাসি করবে, বলছেন, আমি যে পড়লাম উর একটা মানে আছে'। যেখানে কোন মানে নেই, সেখানে আপনি একটা মানে বার করছেন। আপনার প্রস্তুতি ছিল না, আপনার ইচ্ছে হল, আবার ইচ্ছে হল না। তখন ভাল কেউ থাকলে আপনাকে অন্য রকম বুঝিয়ে দিত। সব জায়গায় আপনি মানে খুঁজছেন। আমাদের এটাই সমস্যা। ঠাকুরকে প্রণাম করছেন, সেই সময় হাওয়ায় বা অন্য কোন কারণে একটা ফুল ঠাকুরের বিগ্রহ থেকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে মাটিতে পড়ে গেল, ব্যস্, ঠাকুরের ফুল পড়েছে, তাহলে আমার ইচ্ছা পূরণ হতে যাচ্ছে। কী সব আজগুবি চিন্তা-ভাবনা।

এই সমস্যা শুধু আমাদেরই না, খ্রীশ্চানদের দেখবেন ওদের কাছে 'সাইন অফ গড্' খুব পপুলার। ভগবানের ভারি বয়ে গেছে, তোমাকে সঙ্কেত পাঠাতে। বাচ্চাকে মা বোঝাচ্ছে মিরাক্যাল কাকে বলে। দশতলা বাড়ি থেকে একটা লোক পড়ে গিয়েও বেঁচে গেল, মা বলছে 'এটাই মিরাক্যাল, ভগবান মিরাক্যাল করেন'। বাচ্চা বলছে, 'না, এটা হল চান্স'। দ্বিতীয়বার পড়ে গিয়েও বেঁচে গেল, মা বলছে 'এবার তুমি কি বলবে'? বাচ্চা বলছে – coincidence, তৃতীয় বার পড়ে গেল, আবারও বেঁচে গেল, এবার কি বলবে? তখন বলছে – matter of practice। অভ্যাস করে রপ্ত করে নিয়েছে। যেখানেই দেখবেন, যোগ, যোগাযোগ, সংযোগ, বুঝবেন সবটাই হল matter of practice। ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে, তিনি আমাদের দিয়ে এটা করাবেন, সেটা করাবেন। ধর্ম যখন অনেক নীচে চলে যায়, তখন মানুষ এভাবে ভাবে।

হয় আপনি বলবেন সবটাই ঠাকুরের ইচ্ছা, যেমন ঠাকুর বলতেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বই কিছু জানি না। হয় সবটা ঈশ্বরের ইচ্ছে, না হয় সবটা আপনার ইচ্ছে। ওখানে পারসেন্টেজ চলে না, আমাদের সমস্যা হল পারসেন্টেজকে নিয়ে। কিছু জিনিসে সাইন্ অফ গড্, কিছু জিনিসে আপনার গড্। তোতাপুরী এসেছেন ঠাকুরকে অদ্বৈতের শিক্ষা দেবেন। ঠাকুর বলছেন, মাকে জিজ্ঞেস করে আসি। তোতাপুরী ভাবছেন, নিজের গর্ভধারিণী মাকে জিজ্ঞেস করতে গেছেন। মা কালীকে বাদ দিয়ে ঠাকুর কোন জিনিস করবেন না। নরেনের বিয়ে হবে বলে কথা চলছে, ঠাকুর চললেন মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে। হয় আপনি পুরোটা ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়ে চলুন, নয়তো পুরোটাই আপনার ইচ্ছাকে নিয়ে চলুন। মাঝামাঝারি থাকা মানেই আপনার পতন অবশ্যম্ভাবি, দু-নৌকাতে পা দিয়েছেন কি মরেছেন। যদি বাড়িতে আগুন লাগে, বলবেন, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হয়েছে। নিজের কেউ মরে যায়, বলবেন ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হয়েছে। আমার ক্যানসার হয়েছে, কি করোনা হয়েছে, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হয়েছে, এই মনে করে মনটাকে শান্ত রাখবেন। যদি না পারেন, তাহলে আপনি একজন ঢপবাজ। ঠিক এই কথা ঠাকুর এখন বলছেন।

এই ঢপবাজরা যখন ধর্মের মধ্যে ঢুকে যায়, তখনই সমাজে পচন আসে। এদের একটা মানসিক প্রস্তুতি আছে। কেউ ভয়ে মরছে, কেউ লোভে মরছে, কারুর এটা চাই, কারুর সেটা চাই। এদের কাছে ঈশ্বর হলেন কামধেনু। বাচ্চা বয়সে মা হল আমাদের কাছে কামধেনু। যা দরকার, মায়ের দরবারে গিয়ে আর্জি কর। পায়ে ব্যাথা হচ্ছে, মা টিপে দেবে; পেটে ব্যাথা হচ্ছে, একটা কিছু খাইয়ে দেবে সেরে যাবে, দুটো পয়সা দরকার, মায়ের কাছে যাও, খিদে পেয়েছে, মায়ের কাছে যাও। যা কিছু সমস্যা, যা কিছু দরকার মা আছে। ঈশ্বরকে আমরা ঠিক সেভাবেই নিই। যেটার অভাব সেটার জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে যাই। ভারতের নামে স্বামীজী বলছেন, মেরুদণ্ডবিহীন কাপুরুষ। এরা শুধু দেখবে, রামচন্দ্রজী নে এইস্যা বাণ মারা লঙ্কা উড়্ গয়া। নিজেরা অপদার্থ, সবাই লাথি মারছে, জুতো মারছে আর আপনি স্বপ্ন দেখছেন, এমন বাণ মারলেন রাম পুরো লঙ্কাকে উড়িয়ে দিলেন। কৃষ্ণ এমন ঘুষি মারল, সেখানেই কংস শেষ, আপনারা এটাই স্বপ্ন দেখবেন।

আর বাড়িতে যারা ভালবাসা পায় না, তারা শুধু রাসলীলা দেখবে। কিছু করার নেই, মানুষের যে অভাব, সেই অভাবকে নিয়ে যায় ভগবানের কাছে, যদি নিজের শূন্য পাত্রটাকে পূর্ণ করা যায়। একজন সাধুবাবা একজনকে জিজ্ঞেস করছে, 'ঈশ্বরের কাছে কি চাইবি'? 'কি আর চাইব, অনেক টাকা-পয়সা চাইব, একটা ভাল চাকরি চাইব, সুন্দরী স্ত্রী চাইব, ভাল বাড়ি, ভাল গাড়ি চাইব'। সাধুবাবা বলছেন, 'ছি ছি ছি! ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য চাইতে হয়'। লোকটি তখন বলছেন, 'মহারাজ, যার যেটার অভাব সে সেটাই ভগবানের কাছে চাইবে। আপনার জ্ঞান, ভক্তির অভাব আপনি জ্ঞান, ভক্তি চাইবেন। আমার এই জিনিসগুলোর অভাব, আমি এগুলোই চাইব'। না বুঝে যখন উপদেশ দিতে যায়, তখন এই রকমই হয়।

ঠাকুর শুনেছেন নরেনের টাকা-পয়সার অভাব, তিনি মার কাছে গিয়ে চাইতে বললেন। নরেন গেলেন মা কালীর কাছে, কিন্তু চাইলেন বিবেক-বৈরাগ্য। আরে লোকটার এখন টাকা-পয়সার দরকার, সে কান্নাকাটি করছে। খালি পেটে ধর্ম হয় না, তার এখন পেট ভরানো দরকার। সেটা না করে তাকে উপদেশ দিচ্ছে। উল্টোটাও তাকে শুনিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন ভাব-ভক্তি নিয়ে থাকি, তখন এই জিনিসটা থাকে। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক সাধক, সাধক মাত্রই দুই প্রকার হয় – জ্ঞানী, আর তা না হলে ভক্ত। জ্ঞানী সচ্চিদানন্দের যে চৈতন্য স্বরূপ, সেই স্বরূপকে দেখছেন। ভক্ত হল আনন্দস্বরূপ, শুধু ভালবাসা দেখেন, এর বাইরে অন্য কিছু নেই। আপনি নিজে যেটা সেটাই আপনি চাইবেন। আপনি কাঙালী, আপনার দৃষ্টি যেন-তেন প্রকারে কিভাবে ওখান থেকে শুষে নেওয়া যায়। ভগবান আপনার কাছে যেন এটিএম মেশিন, যত চাইবে তত পাওয়া যাবে।

গীতায় ভগবান বলছেন, এই চার প্রকার লোক আমাকে চায় – যারা আর্ত তারাও আমাকে চায়, যারা অর্থার্থি তারাও আমাকে চায়, যারা জিজ্ঞাসু তারাও আমাকে চায়। কিন্তু জ্ঞানীর কথায় বলছেন, *তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তা একভক্তির্বিশিষ্যতে*, এরাই আমার আপনজন, এরাই আমার প্রিয় – আমি ওর আত্মা, ও আমার আত্মা। বাকিরা যে আমার প্রিয় না তা না, কারণ ভগবানের প্রিয়-অপ্রিয় বলে কিছু হয় না। তাহলে জ্ঞানী কেন প্রিয়? কারণ জ্ঞানী আত্মা, আত্মা সবারই প্রিয় হয়। আত্মা মানে সার, সার আছে বলেই ওই জিনিসটা থাকে। সার বাদে যা কিছু আছে, আসলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়।

এখানে বিষয়ান্তরে গিয়ে বলা যেতে পারে, যে কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার আসল যে জিনিসটা সেটা সহজে নষ্ট হয় না। আসল জিনিসটার বাইরে যেটা, সেটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। যেমন দুধ, বাইরে কিছু সময় রেখে দিলে কেটে যাবে। কিন্তু দুধের আসল জিনিস ঘি, ঘিকে বার করে রেখে দিন, সেটা অনেক দিন থাকবে, সহজে নষ্ট হবে না। যেটা আপনার সার, ওটা সহজে নষ্ট হবে না। জগতে যাবতীয় যা কিছু মিশ্রণ আছে, মিশ্রণ জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়। তার মধ্যে খারাপ হয়ে যায় সেটাই, যেটা ওই জিনিসটার বাইরের জিনিস। আমাদের শরীরটা কেন খারাপ হয়? কারণ শরীরটা

বাইরের জিনিস, ফালতু জিনিস, সেইজন্য শরীর খারাপ হয়। কিন্তু যেটা আরও ভিতরের জিনিস সেটা সহজে খারাপ হয়ে যাবে না। তারও ভিতরের যে জিনিসটা, যেটা শুদ্ধ আত্মা, সেটা কোন সময়েই খারাপ হবে না, কারণ আত্মাই হল সব কিছুর সার। জ্ঞানীরা হলেন ঈশ্বরের সার, জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর হলেন তাঁর সার, ফলে উভয় উভয়ের থেকে কখন বিনাশ হয় না। ভগবান বলছেন, আমি তাকে ভালবাসি, ভালবাসা মানে ওই অর্থে। এখন স্বাভাবিক ভাবে ভিতরে যার অভাব বোধ, আমাদের যে খুব নামকরা গান, শৌর্য দাও বীর্য দাও, খুব সুন্দর গান, আমরাও এই গান করে বড় হয়েছি। কিন্তু যে শৌর্যে প্রতিষ্ঠিত সে কি কখন শৌর্য চাইবে? কখনই চাইবে না। যার অভাব বোধ আছে, সে-ই চাইবে। সারা বিশ্বে এই সমস্যা। স্বামীজী বলছেন, তোমার নিজের উপর যদি বিশ্বাস না থাকে, তেত্রিশ কোটি দেবতাও তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। তুমি যতই প্রার্থনা করে যাও, কেউ তোমার জন্য কিছু করবে না, করবে তুমি নিজেই, তাই নিজের উপর বিশ্বাস আনো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথাদির প্রতি)–হ্যাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ওই কথা বলেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে (কালীবাড়িতে) গিছিল। আমি বললুম, তোমরা কিরকম লেকচার দাও, আমি শুনব। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনিতে সভা হল, আর কেশব বলতে লাগল। বেশ বললে, আমার ভাব হয়ে গিছিল। একটু আগে যেটা বলা হল, আপনার যেটা সার, ওই জিনিসটাকে নিয়ে যখন কথাবার্তা চলে, মানুষ তখন তাতে মজে যায়। যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে থাকেন, কোথাও যদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হয়, সেখানে গেলে আস্তে আস্তে ওই সঙ্গীতের মধ্যে মজে যাবে। আবার যারা সিনেমার গান ভালবাসে, চটুল গান বা ডিস্কো যেখানে হয়, সেখানে ওরা ডুবে যাবে। কামী পুরুষ কামের বস্তু দেখলে ওখানে ডুবে যায়। ঠাকুর ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না, সেখানে কেশব সেন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করছেন। আর কেশব সেন তো একজন সাধারণ কেউ নন, ঠাকুরও কেশব সেনের ভূয়সী প্রশংসা করছেন। কেশব সেন যেটাই তখন বলছিলেন একেবারে ভিতর থেকে বলছিলেন, শুনে ঠাকুরের ভাব হয়ে গেল। ভাব হওয়া মানে তাতে ডুবে গেলেন। ভাব মানে তাই, একটা জিনিসকে নিয়ে মজে যাওয়া। এটা ঠিক সমাধি না, সমাধির ঠিক নীচে হয় ভাব, একটা মাত্র চিন্তা বা বিষয়কে নিয়ে ডুবে যাওয়া। তারপর ঠাকুর আবার বলতে লাগলেন।

পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন? – 'হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ – এই সব'? যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে। এই সমস্য প্রত্যেক ধর্মে আছে। ভগবান সর্বশক্তিমান, তাঁর ঐশ্বর্য অবশ্যই আছে, কেন থাকবে না। কিন্তু কেউ যদি ঐশ্বর্যের দিকেই যেতে চাইছে, তার মানে বুঝতে হবে তার ওইটার অভাব আছে। একবার একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, কথায় কথায় বলছিলেন – আরে সৌন্দর্য টৌন্দর্য যা দেখছেন এগুলো কিছু না, কিছু দিন থাকে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু দিন পরে এগুলো উড়ে যায়। শেষে তার ব্যক্তিত্ব কেমন, সেটাই জীবন চালায়, অন্য কোন কিছু চালায় না। কিন্তু আমরা হলাম অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, ভিতরে কোন গভীরতা নেই। গভীরতা না থাকার জন্য যেটার অভাব, শুধু সেটাকে নিয়ে ভাবছি।

ঠাকুরও যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কথা বলছেন না, তা না। স্বামী অদ্ভূতানন্দজীকে একজন ঈশ্বরকে নিয়ে কি বলেছিল, শুনে ঠাকুর লাটু মহারাজকে বলছেন, তুই বললি না কেন যে, ঈশ্বর যদি না থাকেন তাহলে এগুলো কে তৈরী করল? অন্য দিকে আবার শিখ সিপাহীরা ঠিক একই ধরণের কথা বলছে, ঠাকুর তখন ওদেরও নিন্দা করছেন। কারণ ঐশ্বর্যাদি ভগবানের সঙ্গেই থাকে, কিন্তু এগুলোর এমন কিছু গুরুত্ব নেই। আপনার উদ্দেশ্য মুক্তি, জীবনে আপনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করা, ওর বাইরে যেতে নেই। ঐশ্বর্যের বর্ণনা করছি মানে, কোথাও আমার মনে একটা সংসারপ্রীতি আছে।

আমি অনেকদিন দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলাম, দেওঘরের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের রেজাল্ট খুব ভাল হয়। বছর দুয়েক আগেও এত উচ্চমানের রেজাল্ট হয়েছে যে ভারতের প্রথম সারির পাঁচটা স্কুলের মধ্যে দেওঘর বিদ্যাপীঠ জায়গা করে নিয়েছে। অনেক আগেকার কথা, নরেন্দ্রপুর স্কুলের কোন ছাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে সেকেণ্ড কি থার্ড করেছিল। সেই নিয়ে দেওঘরে এমনি কথাবার্তা হচ্ছিল। সেখানে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী সুহিতানন্দজী ছিলেন, মহারাজ খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন – আমরা সন্ন্যাসীরাও সংসারীদের মত হয়ে যাচ্ছি। সংসারে যেমন কে কত টাকা-পয়সা রোজগার করল, কার ছেলে পরীক্ষায় কি করল, এইসব নিয়ে মাতামাতি করে, ঠিক সেই রকম আমরাও আমাদের স্কুলের ছেলে ফার্স্ট করেছে, কি সেকেণ্ড করেছে, এগুলো নিয়ে মেতে আছি। আমার বয়স তখন খুব কম, মহারাজের এই কথাটা আমার কাছে eye opener। অজান্তায়, আমরা বুঝতেও পারি না কোথা দিয়ে কিভাবে সংসারের ভাব সংসারীর মনে ঢুকে যায়। আপনি একটা স্কুল চালাচ্ছেন, আপনার দায়ীত্ব আপনি আপনার যথাসাধ্য ক্ষমতা তাতে লাগাবেন, ওখানেই সব শেষ। কিন্তু ভাল কিছু হলে সেটাকে নিয়ে আহ্লাদ করা, অপরকে বলে আনন্দ পাওয়া, এগুলো সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, এসব সংসারীরা করে। নাতির কথা যখন আসে তখন জিভটা লালিপপ খাওয়ার মত ঘুরতে থাকে আর ভিতরটা ডগমগ হয়ে ওঠে। এগুলো সংসারীদের ভাল লাগার জিনিস। ঐশ্বর্য নিয়ে কেউ কিছু বলছে, এটাও ঠিক ওইরকম; অণিমা, লঘিমার কথাগুলি যখন বলে তখন এগুলোও সেই একই জিনিস।

এটাই সংসার – সংসারে মানুষ যেটাকে দাম দেয়, আপনি অজান্তায় সেই জিনিসটাকেই চাইছেন, তবে সেটাকে আপনি ধর্মের মাধ্যমে চাইছেন। আর যেটা দিয়ে পাওয়ার কথা, সেটা দিয়ে পেতে পারছেন না বলে আপনি এবার অন্য দিক দিয়ে যাচ্ছেন। এই জিনিস আমাদের সব কিছুতেই হয়। আপনি একজন সুগায়ক, কিন্তু দেখছেন কত টাকা আয় করা যাবে। সাধনা ও সিদ্ধি দুটোই উড়ে গেছে। সিনেমা, নাটকে অভিনয় করার সুযোগ এসেছে, অভিনয় একটা বিদ্যা, কিন্তু দেখছে আমার কত গ্ল্যামার হবে, কত টাকা হবে। যে জিনিসটা মানুষকে উপরের দিকে নিয়ে যেত, সেই জিনিসটাই মানুষকে বিষয়াসক্ত করে সংসারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অজান্তায় আমরা ঢুকে যাচ্ছি সংসার ধর্মে। এরপর ঠাকুর নামকরা ঘটনার কথা বলছেন।

যখন রাধাকান্তের গয়না চুরি গেল, সেজোবাবু (রাসমণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বলতে লাগল, 'ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না'। আমাদের কাছে মালিক একজন, চোর আরেকজন, ভগবানের কাছে কে মালিক আর কেই বা চোর? দ্বৈতবাদীদের কাছে এটা একটা বিরাট সমস্যা। তাদের কাছে ভাল আলাদা মন্দ আলাদা। বাতাস ভাল আর মন্দে কোন তফাৎ করে না, আগুন ভাল আর মন্দে তফাৎ করে না, আলো ভাল আর মন্দে তফাৎ করে না, ঈশ্বরও ভাল আর মন্দে কোন তফাৎ করেন না। তাহলে তফাৎ কোথায় হয়? আমাদের বুদ্ধিতে হয়। বুদ্ধি দিয়ে আগে মন্দকে ত্যাগ করে ভালতে যেতে হয়, ভালতে গিয়ে ভাল ও মন্দের দুটোর পারে যেতে হয়। মথুরবাবু সাধারণ মানুষ, বিষয়ী মানুষ, টাকা-পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। ঠাকুরের সামনে তাই তিনি এই কথা বলছেন।

ঠাকুর তখন বলছেন, **ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব! ও গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ড্যালা! ছি! অমন হীনবুদ্ধির কথা বলতে নাই; কি ঐশ্বর্য তুমি তাঁকে দিতে পার?** ছোটবেলা যখন থেকে ঠাকুরের বই পড়তে শুরু করেছি, তখন থেকে আমরা ঠাকুরের এই কথাগুলো জানি। এখন মনে হবে কি দারুণ কথা। কিন্তু আমরা একবারও খেয়াল করে দেখি না যে, যারা ভক্ত তারা দিনে দশবার এই ধরণের আক্ষেপ ঠাকুরের উপর করে যাচ্ছে। কিছু হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বলবে – ঠাকুর এ-রকমটি কেন হল? ঠাকুর এটা কেন হল, ওটা কেন হল না? ঠাকুর এই রকম তো হওয়ার কথা ছিল না, ইত্যাদি। ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে এই রকম করতে, সবটাই ঠাকুরের। সবাইকে, সবার সব কিছু ঠাকুরকেই

দেখতে হয়, চোরকেও দেখতে হয়, গৃহস্থকেও দেখতে হয়, পুলিশকেও দেখতে হয়। যে চোর, তারও বাড়িতে দুটো লোক তার উপর নির্ভর করে আছে, তাদের মুখে দুটো অন্ন তাকে তুলে দিতে হবে। যে সিংহ তারও বাচ্চা হয়, তাকেও বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে, সেইজন্য হরিণ, ছাগল, গরু এদের সিংহের শিকার হয়ে মরতেই হবে, কিছু করার নেই। ঠাকুরকে ছাগলকেও দেখতে হয়, সিংহকেও দেখতে হয়; তাঁকে ছাগলের বাচ্চাকেও দেখতে হয়, সিংহের বাচ্চাকেও দেখতে হয়। যখন এই কথাগুলো শুনছেন, ভাবছেন তখন সব পরিষ্কার; কিন্তু যেই নিজের উপর আসবে তখন পুরোটা ঘুরে যাবে। এরজন্য বুদ্ধিকে আরও পাকতে হয়, বুদ্ধিকে আরও দৃঢ় ও স্থির হতে হয়।

তাই বলি, যাঁকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাঁকেই লোকে চায়। খুব মূল্যবান কথা, এটাই সার কথা। **তার বাড়ি কোথায়, ক'খানা বাড়ি, ক'টা বাগান, কত ধন-জন, দাস-দাসী এ খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ি, তার বাবা কি করে, তার ক'টি ভাই এ-সব কথা একদিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ঐশ্বর্য! অত খবরে আমাদের কাজ কি**।

ঠাকুরের কথাগুলো আমাদের মনকে উপনিষদের বাণী ও ঘটনাগুলিকে মনে করিয়ে দেয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির কাছে তাঁর স্ত্রী অমরত্ব লাভের উপায় জানতে চাইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই তাঁকে আত্মার কথা বলতে শুরু করলেন, মানুষ যেখানে নিজের আত্মাকে দেখে সেটাকেই সে ভালবাসে। স্বামী যখন স্ত্রীকে ভালবাসে, তখন সে স্ত্রীর জন্য ভালবাসছে না, নিজের আত্মাকে স্ত্রীর মধ্যে দেখছে বলে ভালবাসে। সন্তানকে কোন মা-বাবা সন্তানের জন্য ভালবাসে না, সন্তানের মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখে। টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, আত্মীয়, বন্ধুদের মানুষ ওই একই কারণে ভালবাসে, ওখানে সে নিজের আত্মাকে দেখে। আত্মা মানেই আনন্দ, আনন্দ মানেই আত্মা। এখানে ঠাকুর বলছেন, যাঁকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাঁকেই লোকে চায়, এর অর্থ হল, যেটা তোমার আত্মা। আত্মা মানেই আনন্দ, আনন্দ মানেই আত্মা, দুটো আলাদা কিছু না। যে জিনিসটাকে পেয়ে আপনার আনন্দ হয়, সেটাই আপনার আত্মা।

যখন আপনি কোন কঠিন বই পড়বেন, পড়তে পড়তে আস্তে করে ঘুমিয়ে পড়বেন, কারণ মস্তিষ্ক উচ্চ চিন্তা, উচ্চ ভাব নিতে পারে না। কিন্তু যে জায়গাতে আপনার আত্মা, ওটাকে পেলে আপনার ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করবে। বাচ্চা ছেলে ক্লাশে ঘুমোচ্ছে, ভাল, ঘুমোক। ওকে ডেকে বলুন ক্লাশ শেষ, এবার খেলার ছুটি; সঙ্গে সঙ্গে সাঁ করে ক্লাশ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ওর সমস্ত এনার্জি তখন ফিরে পায়, কারণ ওটাই ওর আত্মা। স্বামী সুহিতানন্দজী স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের সেবক ছিলেন। মহারাজের কাছে স্বামী প্রেমেশানন্দজীর প্রচুর কাহিনী শুনতাম। স্বামী প্রেমেশানন্দজী বসে আছেন, পরিচিত এক বয়স্কা মহিলা এসে খুব কান্নাকাটি করছে, তার স্বামী মারা গেছে। একটু বাদে, মহারাজ মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাতিটি কেমন আছে? যেমনি নাতির কথা বলা, এক গাল হাসি। এই চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল, নাতি কেমন আছে বলতেই এক গাল হাসি। কারণ ওটা তার আত্মা। আপনার essence, আপনার শক্তি কোথায়? আসলে আপনি কোনটা, যেটা হলে আপনি ঘুম থেকে জেগে উঠবেন। ঠিক ঠিক বিচার করে দেখুন, আপনি কখন ঘুম থেকে জেগে ওঠেন? যখন পরনিন্দা-পরচর্চা হয়। পরনিন্দা-পরচর্চাতে ঘুমন্ত মানুষ জেগে ওঠে। যে মরতে যাচ্ছে, সেও যখন শুনে কারুর নামে নিন্দা হচ্ছে, তখন একবার হলেও সোজা হয়ে উঠে বলবে, 'এখানে আমারও দুটো কথা আছে'। অপরের নিন্দা করতে গিয়ে আমরা সমস্ত শক্তি পেয়ে যাই। ওটা বাদে যে কোন জিনিস হলে আপনার ঘুম পেয়ে যাবে। আমাদের যেটা স্বভাব, সেই জায়গাতে গিয়ে আমরা জেগে উঠি।

ঠাকুর এখানে বলছেন, নরেনকে ভালবাসি, নরেনকে দেখে চনমনে হয়ে উঠছেন, এরপর নরেনের বাকি যা কিছু আছে সব খসে পড়ে যায়। আমাদের কাছে ভক্তরা আসে, এসেই জিজ্ঞেস

করবে, মহারাজ আপনার পূর্বাশ্রম কোথায় ছিল? লোকেরা এই রকমই, পাঁচটা ব্যক্তিগত জিনিসকে জানতে চাইবে, হাভাতে কিনা। ঠাকুর এগুলোকে আটকাচ্ছেন, উপদেশের জন্য না, বোঝানর জন্য, এটাই রিয়ালিটি। ঠাকুর বলছেন, এসব কথা একদিনের জন্য ভুলেও জিজ্ঞেস করি নাই। এরপর ঠাকুর গান শুরু করছেন, ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন। যদি আপনি সত্যিই ভক্তিলাভ করতে চান, সত্যিই যদি ঈশ্বরকে চান, অন্য কোন বিষয়ে আপনার মন ডুবে থাকবে না, ওতেই ডুবে থাকবেন।

ঠাকুর তাঁর সেই গন্ধর্বনিন্দিতকণ্ঠে গান করছেন – ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন। গান সমাপ্ত হওয়ার পর ঠাকুর আবার কথা বলছেন।

ঠাকুর শিবনাথাদির প্রতি একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন, তোমরা ঈশ্বরের অত ঐশ্বর্যের বর্ণনা কর কেন? সাধারণ লোকেরা মনে করে আমি ঈশ্বরের ভক্ত, আমার কেন এত দুঃখ, আমার কেন এত অসুবিধা হবে। লোকেরা প্রায়ই এই জিনিসগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে। সেখান থেকে ঠাকুর এবার বলছেন –

তবে দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয় তাঁর লীলা কি, দেখি। এরপর ঠাকুর বর্ণনা করছেন, কিভাবে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় গেলেন, যুদ্ধ হল, রাবণ বধ হল। বলছেন, **রামচন্দ্র রাবণবধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ করলেন; বুড়ী নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল। লক্ষ্মণ বললেন, 'রাম! একি বলুন দেখি এই নিকষা এত বুড়ী, কত পুত্রশোক পেয়েছে, তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে'। রামচন্দ্র নিকষাকে অভয় দান করে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে নিকষা বললে, 'রাম, এতদিন বেঁচে আছি বলে তোমার এত লীলা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে। তোমার আরও কত লীলা দেখবে'। (সকলের হাস্য)**

এর আগে ঐশ্বর্য নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এখানে আমরা কিছুটা সেখান থেকে আর কিছুটা নূতন কয়েকটা বিষয়কে যোগ করে আলোচনা করছি। বেদের খুব নামকরা সূক্তম্, পুরুষসূক্তমে বর্ণনা আছে ভগবান কিভাবে সৃষ্টি করলেন। সেখানে একটা খুব মূল্যবান কথা বলা হয়েছে – *এতাবানস্য মহিমা*। বর্ণনা করে বলছেন, সৃষ্টি হল ভগবানের মহিমা, এটা ভগবানেরই ঐশ্বর্য। আমরা নিত্য যে ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করি, সেখানে বলতে দেখা যায় – এই জগৎ হল ঈশ্বরের সৃষ্টি, বিভিন্ন ধর্মেও এভাবেই দেখা হয়। বেদান্তে বা কথামৃতেও কেমন একটা ঈশ্বরীয় ইচ্ছার অভিব্যক্তি, এই ভাব দেখতে পাই; বিশেষ করে বেদান্তে প্রায়ই বলতে দেখা যায় – তোমার যত ক্রিয়া, তুমি যা কিছু কর, সবটাতেই ঈশ্বরীয় ইচ্ছা আর যে জগৎকে তোমরা দেখছ, এই জগৎকে ঈশ্বরেরই মহিমার প্রকাশ রূপে দেখবে।

দেববাণীতে স্বামীজী সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউএর উপমাকে বারবার নিয়ে আসছেন। সমুদ্র যেন সচ্চিদানন্দ সাগর, আর তার ঢেউগুলি হলাম আমরা। আমরা যদি কোন সাধু-মহাত্মার কাছে যাই, তাঁরা আমাদের একই কথ বারবার বলবেন – এই জগতের পিছনে যিনি আছেন, তাঁকে সব সময় মনে রাখবে। তার মানে আধ্যাত্মিক সত্য যেটা সেটাকে যেন আমরা ভুলে না যাই। এখানে এই কলম আছে, এই কলমের পিছনে যে আসল সত্তা, সেটাও ঈশ্বরীয় সত্তা। শুধু কলমই না, এই জগতে যা কিছু আছে, সব কিছুর পিছনে আছে সেই ঈশ্বরীয় সত্তা। কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিক কি এভাবে সব কিছুর পিছনে ঈশ্বরীয় সত্তাকে দেখবেন? কখনই তিনি এই আধ্যাত্মিক সত্যকে দেখবেন না। শুধু একজন বৈজ্ঞানিকই না, আমরা সবাই মুখে যাই বলি না কেন, কেউই আমরা এই আধ্যাত্মিক সত্যকে দেখতে পারি না।

আধ্যাত্মিক সত্যকে আপনি দেখুন, নাই দেখুন, মানুন, নাই মানুন, জগতের ব্যাপারে একটা জিনিসকে আমাদের সবাইকে মানতে হবে যে, এই জগৎ হল মন আর পদার্থ, এই দুটোর খেলা। আমাদের যে মন রয়েছে, আর চারিদিকে যে বস্তু বা পদার্থ সমূহ রয়েছে, এই দুটোর যে খেলা, এই খেলাকে নিয়েই এই জগৎ। জগৎকে ছেড়ে আমরা যখন নিজের দিকে তাকাচ্ছি, সেখানেও দেখছি, আমি

নিজেও কিন্তু মন আর পদার্থের খেলা। আমার এই শরীর আছে, আমার এই মন আছে; আর এই জগতেও যা কিছু আছে, আমার সামনে যিনি বসে আছেন, তারও একটি শরীর আছে, তারও একটা মন আছে। আর যেগুলোকে আমরা জড় পদার্থ জানি, তারও একটা শরীর আছে। এই যে জড়, পদার্থ আর মন, এটারই খেলা জগৎ আর এটারই খেলা আমি নিজেও।

ফলে কি হয়, এই দুটোর মিলন খুবই স্বাভাবিক। আমি যখন নিজেকে শরীর বলে মনে করি, তখন আমার কাছে জগৎকেও শরীর বলে মনে হয়। আমি যখন নিজেকে মন বলে মনে করি, জগৎকেও আমার কাছে মন বলেই মনে হয়। যেটাই মনে হোক, এক অপরের সঙ্গে যেভাবে মেশার ঠিক সেভাবেই মিশবে। এই যে জগতের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সংযোগ রয়েছে, সাধারণ ভাবে আমরা কখনই এর মধ্যে এই যে একটা আধ্যাত্মিক ভাব রয়েছে, একটা যে আধ্যাত্মিক সত্য আছে, এটাকে আমরা দেখতে পাই না এবং দেখাটাও সম্ভব না। ফলে কি হয়? বাচ্চাদের দেখবেন, বাড়িতে যতক্ষণ আছে দেখে ভাল বলে মনে হবে, কিন্তু স্কুলে যেমনি যাবে, যতক্ষণ ম্যাডাম বা স্যার আসেননি, অন্যান্য বাচ্চার যেমনি আসে, এক অপরকে দেখে ওরা excited হয়ে যায়। ট্রেনে বা বাসে বড়দের সাথে বাচ্চা কোথাও যাচ্ছে, সেখানে অন্য বাচ্চা থাকলে কিভাবে যে ওরা excited হয়ে যায়, ওদের সামলানো মুশকিল হয়ে যায়। একটা বাচ্চাকে সামলানো যায়, কিন্তু দুটো বা চারটে বাচ্চা যদি এক জায়গায় মিলিত হয়ে যায়, সেখানে একটা বাচ্চার দুষ্টুমি গুণিতক চারটি বাচ্চার দুষ্টুমি করলে হবে না, এটা তার থেকে অনেক বেশি হয়ে যায়। কারণ, এক অপরের সঙ্গে যখন থাকে তখন তার excitement অনেক বেশি হয়ে যায়।

আমরা যখন ঘরে থাকি এমনিতে ভাল থাকছি, লকডাউনের সময় সবাই ঘরের মধ্যে বন্দি ছিলাম, সেটাতে এক রকম শান্তি ছিল। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে এলে সবারই কত excitement। চুম্বককে দেখে লোহা যেমন লাফাতে শুরু করে, আমরাও ঠিক তেমনি আমাদের মত কাউকে দেখে লাফাতে শুরু করি। এই কারণে দেখছেন না, জগতে লাফালাফাটি কত বেশি। চারিদিকে কত কিছু নিয়ে লাফালাফি। আইপিএল, ফিল্ম ফেস্টিভেল, ভোটের লড়াই, খুনোখুনি, দলাদলি, দুর্নীতি, স্ক্যাম সব দেখে জগৎকে আরও বেশি সত্য বলে বোধ হয়, এত বেশি সত্য মনে হয়ে যে, জগতের পিছনে যে একটা ঈশ্বরীয় সত্তা আছে সেটার ব্যাপারে কেউ কিছু জানেই না; যারা একটু জানে তারাও জগতের লাফালাফি দেখে সেটুকুও ভুলে থাকে। ফলে যাদের সাধারণ মন, তারা জগৎকে ঐশ্বর্য রূপেই গ্রহণ করে। যাঁরা ভক্তিমার্গে আছেন, কিন্তু বেশি উঠতে পারেননি, ঈশ্বরকে কোন ভাবে মনে করেন, যে রূপেই মনে করুন; সেখানে ওনারা ঐশ্বর্যকে এই অর্থে নেন, যাতে ভোগটা আরও বেশি হয়। এই সমস্যাটা থাকবে।

এখন জগতের প্রতি একটা স্বচ্ছ দৃষ্টি এনে জগৎকে যদি আপনি বিশ্লেষণ করতে যান, তাহলে দেখা যাবে এই সংসারে যতগুলো মন আছে, সব মনকে তিনটে শ্রেনীতে নিয়ে আস যায়। প্রথম প্রকার হল, সাধারণ মানুষ যারা জগৎকে নিয়ে উত্তেজনায় লাফাতে শুরু করেন, লজ্জা, ঘৃণা ত্যাগ করে চেষ্টা করে জগৎকে যতটা লুটে নিতে পারা যায়। ঠাকুর এই যে ব্রাহ্ম ভক্তদের বলছেন, তোমরা এত ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য কেন কর, সেখানেও কিন্তু জিনিসটা ওটাই হচ্ছে, কোথাও যেন ভিতরে এই ভাব – আমি যেন জগৎ থেকে আরও বেশি পাই। দ্বিতীয় হল জ্ঞানীদের পথ, জ্ঞানের পথে যাঁরা অনেক এগিয়ে গেছেন, তাঁরা নেতি নেতি করে সমস্ত কিছু ত্যাগ করার কথা বলেন। পপুলার যে বেদান্ত রয়েছে, সেখানে তাঁরা এটাই বলেন – এ সংসার মায়া হ্যায়। তার মানে বলতে চাইছেন, এই সংসারে যা কিছু আছে, সব কিছুকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধ আত্মজ্ঞানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, এটাই জ্ঞানীদের ভাব। তার মানে ঈশ্বরকে ধরে, ঈশ্বরের যে সৃষ্টি, আমরা এখন ঐশ্বর্যতেও থাকছি না, আমরা থাকছি একেবারে শুদ্ধ ভাবে শুধু সৃষ্টিতে। বলছেন, সৃষ্টিকে পুরো ত্যাগ করে দাও। খুব নামকরা কথা, ত্রিকাল মে জগৎ নেহি হ্যায়, সব মায়া হ্যায়, সব হটাও, ভুল যাও। এটা একটা পথ। আরেকটা পথ, যেটা আগে বলা হল, যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এমন ঝাঁপিয়ে পড়ছে যে সে নিজেকে সামলাতে পারছে না। গীতায় যে আত্মজ্ঞানীদের বর্ণনা করছেন, আর সাধারণ মানুষ সন্ন্যাসীদের কাছে যেটা আশা করে; স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে

বলছেন, *যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্*, সংসারে যখন স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ চলেন তখন তিনি যা কিছু শুভ-অশুভ পাচ্ছেন, তখন তাঁরা যেমনটি আছে তেমনটি ছেড়ে এগিয়ে চলে যান।

ঠাকুর এখানে একটু অন্য রকম বলছেন – তবে দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয়। শুধু দর্শনের পর যে সাধ হবে, তা না, তবে ঠাকুর যে অবস্থায় আছেন, সেখান থেকে বলছেন – দর্শনের পর। এই যে দর্শনের পর সাধ হয়, এটাকে সাধনা রূপেও নেওয়া যায়। তফাৎ হল – দেখবেন আমরা যে কোন জিনিসে এসে, তা বেদান্তের সাধনাই হোক, ভক্তি রূপে সাধনাই হোক, যেভাবেই সাধনা হোক; কাঁচা অবস্থায় সংসারে নামলে দুধে জলে মিশে এক হয় যায়। কিন্তু সাধনাতে সিদ্ধ পুরুষ যেভাবে ব্যবহার করেন, সাধকরা সেটাই চেষ্টা করে করেন। এখানে বলছেন, ভক্তের সাধ হয়, সাধটা হচ্ছে ঈশ্বর দর্শনের পরে, তার মানে সাধনার রূপে এটা নেওয়া যায়। যেমন নিকষার কথা বলছেন।

নিকষার এই কাহিনী দূরে থাক, বাল্মীকি রামায়ণে বা তুলসীদাসের রামচরিতমানসে নিকষার নামই নেই, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ যে কোন সাহিত্য হল সমাজের আয়না, সমাজ কি রকম চিন্তা-ভাবনা করছে, সেই জিনিসটাই সাহিত্যে আসে। নিকষার কাহিনীটা যখন সমাজে এসেছে, তার অর্থ হচ্ছে আমরা জিনিসটাকে কিভাবে দেখছি, সেটাকে একটা গল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিকষাতে কি হয়, একটা আনন্দ পাচ্ছে, কিন্তু সেই আনন্দে আপনি ডুবে যাচ্ছেন না, ওর মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন না। একদিকে যেমন তুলে ফেলে দিচ্ছে না, ঠিক তেমনি ওর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। এটাকে মধ্যম পন্থাও বলা যাবে না, এটা পুরো আলাদা জিনিস। প্রথমে বলা হল, বাচ্চার যেমন অন্যান্য বাচ্চাদের স্কুলে, খেলার মাঠে দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাচ্চাদের একজন কিছু একটা করল, সবাই সেটাই করতে শুরু করে দেবে; ভেড়া দলের মত, একটা ভেড়া যেদিকে যাবে, সব ভেড়া সেদিকে যাবে; এটাকে বলে হার্ড মেন্টালিটি।

অরুণচলের আলংএ আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, উনি ওখানকার গল্প বলতেন। স্কুলের ছেলেরা ওখানে ফুটবল খেলত, ভালই খেলত। ওখানকার বাচ্চাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একটু টাইট রাখা হত। ইন্টার স্কুল টুর্নামেন্টে ওরা দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে যেত। ছেলেগুলিকে বলা থাকত, আর যাই কর, কোন ভাবে হাই কিক্ মারবে না, অর্থাৎ উঁচু করে আকাশে কিক্ মারবে না। ছেলেগুলিও তাই করত, উঁচু করে কিক্ মারত না। কিন্তু প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড় হয়ত কোন ভাবে আকাশে উঁচু করে কিক্ মেরেছে, ওইটা দেখে এই ছেলেগুলো আর লোভ সামলাতে পারত না। তারপর এরা সবাই, খেলার মূল উদ্দেশ্যকে ছেড়ে দিয়ে বলটাকে আকাশে মারতে শুরু করে দিত। ওই দেখে প্রশিক্ষক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মাথায় হাত। যত ইশারা করছেন, কারুরই সেদিকে দৃষ্টি নেই। ওর মধ্যে ঢুকে পড়েছে, কিছু করার নেই। আসল খেলার দিকে দৃষ্টি থেকে সরে এসে আকাশে সবাই বল মারতে শুরু করে দিত। এই করে কয়েকবার ওরা টুর্নামেন্টে কখন সেমিফাইনালে, কখন ফাইনালে গিয়ে হেরে যেত। অনেক মুশকিলে ওদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। আমাদের এটাই সমস্যা, যেমনি কিছু একটা দেখলাম ওর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি, সামলান যায় না।

দ্বিতীয় যেটা বলা হয়েছিল জ্ঞানীদের নিয়ে, সব কিছুকে ছেড়ে সরে আসা। কিন্তু নিকষার ক্ষেত্রে পুরোপুরি দুটো থেকে আলাদা। এখানে বলছেন, তুমি দেখবে, দেখে ওটাকে ফেলেও দেবে না, আর ওর মধ্যে জড়িয়েও পড়বে না। এই কথা শুনলে মনে হবে, বাঃ এটাই তো ভাল। আবার অনেক সময় মনে হয়, এটা কি সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব, যদিও আমরা প্রায়ই এটা করে থাকি। বাচ্চা বয়সে যেসব স্কুলে পড়েছি, ক্লাশ টেন পর্যন্ত হোক বা ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত হোক; যখন সেখানে ছিলাম কেমন সবাই মিলেমিশে ছিলাম। আমি পাশ করে বেরিয়ে এসেছি। অনেকদিন পর স্কুলে বেড়াতে গেলাম, আমার ছোটবেলার স্কুলটা কেমন চলছে একবার দেখে আসি। সেখানে গিয়ে দেখলাম, কিছু একটা জিনিস ভাল হয়ে গেছে।

তখন আমি বললাম, বাঃ এটা কি সুন্দর এখানে হয়ে গেছে। একটা জায়গায় দেখলাম জল খাওয়ার ব্যবস্থাটা খুব ভাল হয়ে গেছে। মনে মনে বলছি, আমাদের সময় কত জলের কষ্ট ছিল, এখন জলের কত ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। কিংবা দেখছি একটা খুব সুন্দর গাছ ছিল, সেই গাছটা মরে গেছে; তখন মনে পড়ে গেল, গাছটা নেই, এই গাছের তলায় আমরা কথা খেলা করেছিল, গাছের ডাল ধর কত দোল খেতাম। অনেক বছর পর পুরনো স্কুলে গিয়ে একটা ভালা লাগা লেগে আছে, তার সাথে স্কুলের ভাল কিছু দেখে আনন্দ হচ্ছে, পুরনো কিছু স্মৃতি চিহ্ন নষ্ট হয়ে গেছে সেটা না দেখতে পেয়ে মন খারাপ করছে; কিন্তু কোথাও আমিত্ব বোধটা নেই, আমিত্ব জিনিসটা থাকছে না। যখন স্কুলে পড়তাম, তখন কত ছোটখাটো জিনিস নিয়ে কত সিরিয়াস আলোচনা করতাম। মাস্টারের চশমা পরা নিয়ে বা হাস্যকর কোন কাণ্ড নিয়ে কত হাসাহাসি করতাম। সেদিনের সেই ঘটনাগুলিকে মনে করে এখনও হয়ত হাল্কা একটু হাসি পায়, কিন্তু আগের মত ওর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে আহ্লাদে আটখানাও হচ্ছি না আর খারাপ কিছু দেখে একেবারে মুষড়েও পড়ছি না।

অনেক বছর আগে নিকষার এই ব্যাপারটা জানার পর মজা করে আমি নাম দিয়েছিলাম ‘নিকষা যোগ’। এখনও অনেককে মজা করে নিকষা যোগের কথা বলি। নিকষা যোগের বৈশিষ্ট্য হল, এর মধ্যে আমরা মজাও পাচ্ছি, কষ্টও পাচ্ছি, কিন্তু একটা সীমার বাইরে চলে যাচ্ছি না। এখানে ব্যাপারটা হল, এই জগৎ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, কিন্তু ওই ঐশ্বর্যে আমি মুগ্ধ হচ্ছি না, ওই ঐশ্বর্যে আমি সব কিছু ভুলেও যাচ্ছি না। আমিত্ব ভুলে যাচ্ছি না, আনন্দই হোক আর অবসাদই আসুক, দুটোর কোনটাতেই জড়াচ্ছি না, একটা নিউট্রালিটি এসে যায়। এটা যে শুধু জগৎকে নিয়ে হবে তা না, এই যে সরে আসা, এই জিনিসটা সব কিছুতে থাকলেই ভাল হয়। আমাদের যে সুখগুলো আছে, সেগুলো থেকেও দূরে সরে আসতে হয়, যে দুঃখগুলো আছে, সেখান থেকেও একটু সরে আসতে হয়। যাকে আমরা ভালবাসি, সেখান থেকেও আমাকে একটু সরে আসতে হয়। আর যেখানে একটা গভীর সম্পর্ক, নিজের স্বামী বা স্ত্রী, নিজের সন্তান, এদের থেকেও একটু সরে থাকতে হয়। একটু সরে থাকলে অনেক বেশি আনন্দ হয়। তার থেকেও বড় হল, অনেক বেশি শান্তিতে থাকা যায়।

আমরা অনেকবার উল্লেখ করেছি, স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন সেখানে কিভাবে রবার্টা ঈঙ্গারসোলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। ঈঙ্গারসোল বলছেন, আমার সামনে এই কমলালেবু আছে, এটাকে নিংড়ে এর সব রসটুকু খেতে হবে, এটাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। স্বামীজী তখন বলছেন, আমারও তাই উদ্দেশ্য, কিন্তু আমার তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমি জানি এই মৃত্যুটাই আমার শেষ নয়। এটা হল, একটু সরে আসা। জীবনের সঙ্গে আমরা এত নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছি যে, একটু দুঃখ হলেই আমরা ভেঙে পড়ি, একটু আনন্দ পেলেই এমন উৎফুল্ল হয়ে উঠি যে আমাদের সামলান যায় না। এভাবে হবে না, একটু সরে আসতে হবে।

নিকষা যোগে কি হয়, যিনি ভক্ত তিনি ঈশ্বরকে এত ভালবেসেছেন যে, তিনি জগৎ থেকে সরে এসেছেন। কিভাবে? যেভাবে স্কুলের কথা বলা হল। আমি বিভিন্ন সেন্টারে ছিলাম, সেখানেও এই একই জিনিস হত। আমাদের পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে জয়েনিংএর সময় দেওঘরে ছিলেন। অনেকে তাই মনে করেন উনি দেওঘরে জয়েন করেছিলেন, কিন্তু দেওঘর ওনার জয়েনিং সেন্টার না, কিন্তু একেবারে প্রথমের দিকে উনি ওখানে ছিলেন। আমার মনে আছে, আমি যখন প্রথম দেওঘরে জয়েন করেছিলাম, মহারাজ তখন দেওঘর এসেছিলেন। তিনি আমাদের খুব মিষ্টি করে বলছিলেন, জানো আমি যখন মঠে জয়েন করেছিলাম, তখন দেওঘরে এসেছিলাম, কিছু দিন এখানে ছিলাম। উনি দেখাচ্ছিলেন আমি এই ধামে ছিলাম। ডরমিটরিকে ধাম বলা হয়। তখন আমার বয়স খুব কম, মহারাজের এই ব্যাপারটা আমার কাছে তখন খুব মজা লেগেছিল। এই যে নিউট্রালিটি, আপনি ওখান থেকে সরে এসেছেন, এটাই কাম্য। ঈশ্বরকে কেউ যখন দর্শন করেন বা ঈশ্বরজ্ঞানে যখন পুরো

কেউ ডুবে যান, এই নিউট্রালিটি তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে যায়। তখন আর অনুশীলন করে করতে হয় না, তখন আমাকে টেনে নিজেকে ওখান থেকে যে সরিয়ে রাখতে হচ্ছে, তাও না।

ঠাকুর এখানে বলছেন, ভক্তের সাধ হয় তাঁর লীলা কি, দেখি; এটা একটা খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক জিনিস। আমাদের যে দৈনন্দিন জীবন, সেখানেও আমরা এই জিনিসটা দিনরাত করি, যেমন ছোটবেলার স্কুল দিয়ে বোঝান হল। কোন সেন্টারের প্রাক্তন কোন অধ্যক্ষকে কেউ মিষ্টি করে বলছেন, 'আচ্ছা এই বাড়িটা আপনার সময় হয়েছিল না? বাঃ কি সুন্দর'। প্রাক্তন অধ্যক্ষ এখন কিন্তু নিজে সেন্টারের কোন কিছুর সাথে আর জড়াচ্ছেন না। ঠাকুর এখানে যেভাবে বলেছেন, আমরা সেভাবেই নিচ্ছি। ঠাকুর মায়ের ভাবে এমন ডুবে আছেন, ঈশ্বরজ্ঞানে এমন ডুবে গেছেন, তিনি এখন এই জগৎ থেকে সরে এসেছেন, তিনি এখন অন্য জগতের হয়ে গেছেন; এই জিনিসটা ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের কিছুক্ষণের জন্য ঠাকুরের অবতারত্বটা সরিয়ে রাখতে হবে। এটা ঠিক যে প্রত্যেক কথায় ঠাকুরকে অবতার ভেবে নিয়ে এলে জিনিসগুলিকে বোঝা একটু কঠিন হয়ে যায়।

অদ্বৈত বেদান্তে প্রায়ই 'সাক্ষী চৈতন্য' শব্দটা নিয়ে আসা হয়, এখানে নিকষা কিন্তু সাক্ষী না, সাক্ষী চৈতন্যের সাথে এই জায়গার তফাৎ আছে। সাক্ষীতে কি হয়, তোমার সঙ্গে যা হওয়ার হচ্ছে, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আপনি রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন, চারটে বাচ্চা খেলছে, মজা করে দেখলেন, দেখে আপনি নিজের মত এগিয়ে গেলেন। নিকষাতে তা হচ্ছে না, নিকষা যোগে আপনি ওখানে জড়িয়ে আছেন বা জড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে একটু সরে এসেছেন। সেখান থেকে সরে আসার পর কান্নাকাটির আর কোন সম্পর্ক নেই, আবার যে আহামরি কিছু, সেটারও কোন সম্পর্ক নেই।

এরপর ঠাকুর খুব উচ্চমানের ভক্তির দিক থেকে শিবনাথকে বলছেন। কারণ ঐশ্বর্য মানেই হল, জগতে কিছু কিছু জিনিস আছে যেটাকে নিয়ে আমি থাকব।

তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্বজন্মের বন্ধু বলে বোধ হয়।

যে যেমন স্বভাবের সে তেমন স্বভাবের লোককেই খোঁজে। আমরা মেলামেশ না করে থাকতে পারি না, মেলামেশা করার জন্য লোক খুঁজব, তা যে স্বভাবেরই লোক হোক। ঠাকুর বলছেন, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। আপনার ভিতরে যা আছে তাই বেরোবে। শুধু তাই বেরোবে না, তার মত জিনিসকেই আপনি খুঁজবেন। ঠাকুর শুদ্ধাত্মা, তিনি সবাইকে শুদ্ধি প্রদান করেন। ফলে এই জগতে যাদের মধ্যে সেই জ্ঞান-ভক্তি রয়েছে, যার ভিতর বৈরাগ্য রয়েছে, আর যে শুদ্ধাত্মা; ঠাকুর তাকে দেখতে ভালবাসেন, তার সাথে কথা বলতে ভালবাসেন। আমরা যখন কোন সম্পর্ককে বেশি সম্মান দিতে যাই, আমরা তখন এটাই বলি – পূর্বজন্মের সম্পর্ক। আবার অনেক সময়ে বলে, সাত জন্মে এই সম্পর্ক যেন থাকে বা বলে, জন্ম-জন্ম যেন এই সম্পর্ক থাকে। সন্তান মাকে খুব ভালবাসে, অনেক সময় বলে, জন্মে জন্মে যেন তোমার মত মা পাই। কেউ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এই কথা বলে, কেউ বন্ধুকে নিয়ে বলে।

ঠাকুরের এই কথা শুনেই একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাস করলেন, মহাশয়! আপনি জন্মান্তর মানেন? কারণ ঠাকুর এখানে বলে দিয়েছেন, পূর্বজন্মের বন্ধু। এখানে ঠাকুর জন্মান্তর জিনিসটাকে জোর দিচ্ছেন না, জোর দিচ্ছেন সম্পর্কটাকে। কি সম্পর্ক? তোমাকে দেখে এত ভাল লাগে, দেখে মনে হয় অনেক জন্ম থেকে তোমার সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ – হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে।

এই বাক্যটা এত তাৎপর্যপূর্ণ যে এখানে ব্যাখ্যা না করলেই নয়। বেদে সরাসরি পুনর্জন্মের কথা নেই, তবে বেদের যে চারটে অংশ আছে – মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ; এর মধ্যে

ব্রাহ্মণ অংশে অনেক কাহিনী আছে, যেখানে পুনর্জন্মের ব্যাপারটা রয়েছে। বেদ খুব দৃঢ় ভাবে মানে যে, মৃত্যুর পরেও আমাদের জীবন চলে। এটাকে বেদ না মানলে বেদে যজ্ঞের যত বর্ণনা আছে, সব অর্থহীন হয়ে যাবে। কঠোপনিষদে পরিষ্কার পুনর্জন্মের বর্ণনা আসে, তার সাথে ছান্দোগ্য উপনিষদেও পুনর্জন্মের বর্ণনা পাওয়া যায়। আর গীতাতে পুনর্জন্মের কথা পুরো দমে আসে, মহাভারতে পুনর্জন্মের প্রচুর কাহিনী পাওয়া যাবে। বাল্মীকি রামায়ণে সে-রকম কিছু নেই। মনুস্মৃতি পুনর্জন্ম নিয়ে বেশি কিছু বলেন না। কিন্তু হিন্দু মন পুনর্জন্মকে মেনে চলে – হ্যাঁ পুনর্জন্ম আছে, আমরা এটাকে পুরোপুরি মেনে চলি। আর কোন শাস্ত্রে যদি একটা জিনিস না বলা থাকে, তার মানে এই নয় যে, তিনি এটা মানেন না। কোন কারণে হয়ত সেই জিনিসটাকে আলোচনা করা হয়নি, বা জিনিসটা এত বেশি obvious যে, সেটাকে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি। গীতার খুব নামকরা শ্লোক *বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন* – আমারও অনেক জন্ম হয়েছে, তোমারও অনেক জন্ম হয়েছে, আমার সব জন্ম মনে আছে, তোমার কোন জন্মের কথা মনে নেই।

উপরের কথাগুলি দিয়ে বোঝা যায়, আমরা হিন্দুরা পুনর্জন্মকে পুরোদমে মানি। এখন ব্রাহ্মভক্ত হঠাৎ জন্মান্তর নিয়ে প্রশ্ন করাতে ঠাকুর বলছেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। একটা জিনিসকে আমরা কিভাবে জানি? কোন কিছুকে জানার এই ভাবটাকে সংস্কৃতে বলা হয় 'প্রমাণ'। প্রমাণ হল, একটা জিনিসকে কিভাবে জানা হয়। খুব নামকরা প্রমাণ হল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যেখানে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানছি। আমরা প্রায়ই এই কথা বলি – সাক্ষ্য প্রমাণ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে আমরা যেটা জানি, সেটা হল শেষ প্রমাণ। আচার্য শঙ্কর, যিনি হিন্দু দর্শনকে একটা দিশা দিলেন, তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণকে খুব উচ্চ স্থান দিয়েছেন, কিন্তু ওটাকে শেষ কথা রূপে মানছেন না। পাশ্চাত্য দর্শনে কিছু কিছু পণ্ডিত আছেন, যাঁরা এটাকে শেষ কথা বলে মনে করতেন, যে মতকে Realism বলা হত।

কিন্তু তাঁরা পরে দেখলেন এতে অনেক সমস্যা আছে, যার জন্য তাঁরা ধীরে ধীরে এটাকে পাল্টে নিলেন। দ্বিতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হল – অনুমান, যেটা লজিক দিয়ে চলে। যাঁরা কাঠখোট্টা তাঁরা কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকে নিয়ে চলেন, অনুমান প্রমাণকে মানেন না। চার্বাক দর্শন বলেন অনুমান প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অঙ্গ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অনুমান প্রমাণের পারে আরেকটি প্রমাণ আছে, সেটা হল শাস্ত্র প্রমাণ। ধর্ম শুরু হয় এই শাস্ত্র প্রমাণ থেকে। শাস্ত্র প্রমাণ হল, যে জিনিসগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, যুক্তি দিয়ে জানা যায় না; যেমন ধর্ম, পুনর্জন্ম, ঈশ্বর, অবতার, মুক্তি, বন্ধন। এগুলো একমাত্র জানা যায় শাস্ত্র প্রমাণ দিয়ে। শাস্ত্র যে কথাগুলো বলেছেন, তাঁর প্রত্যেকটা কথা হল সত্য। কারণ এই জিনিসগুলো আমরা যুক্তিতর্ক দিয়ে জানতে পারব না, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়েও জানতে পারব না। অন্যান্য ক্লাশে আমরা এর উপর অনেক বিস্তারে আলোচনা করেছি, কথামৃতে অত বৃহৎ আলোচনাতে যাওয়ার দরকার নেই।

কেন ধর্মের ব্যাপারে আমরা শাস্ত্র প্রমাণকেই গ্রহণ করব? আচার্য শঙ্কর খুব সহজ যুক্তি দিচ্ছেন – ঈশ্বর আদি তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের না, সেইজন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না, অনুমান দিয়েও জানা যাবে না। আর ঋষিরা যে কথাগুলো বলে গেছেন, সেগুলোকে আমাদের সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, কারণ মিথ্যা কথা, ভুলভাল কথা বলাতে তাঁদের কোন স্বার্থ ছিল না। তার সাথে তাঁদের চরিত্র এত উচ্চমানের, তাঁদের পাণ্ডিত্য এত উচ্চমানের যে ঋষিদের সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। যাঁরা ভগবানকে সংশয় করেন, তাঁরা ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে সংশয় করেন না, তাঁরা যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে সংশয় করেন না। কিন্তু যীশুকে নিয়ে কিছু যে কাহিনী আছে, সেগুলো ওনারা মানতে পারেন না, বুঝতেও পারেন না বলে সেটাকে তাঁরা সংশয় করেন। সেটা অন্য জিনিস, আমরা সেটাকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি না।

এই শাস্ত্র প্রমাণে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আসে, কিছু কিছু জায়গায় এটাকে নিয়ে আলোচনাও করা হয় – এটাকে বলে ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য বাংলা ঐতিহ্য না, সংস্কৃতির ঐতিহ্য। ঐতিহ্য মানে, কিছু কথা আছে যেগুলো আমাদের পরম্পরায় একটা লোকালিটিতে চলে আসছে। যেমন কোন এক গ্রামের লোকেরা বলে, আমাদের গ্রামের অমুক গাছে একটা ভূত আছে। এখন বাবা-ঠাকুরদার আমল বা তারও আগে থেকে গ্রামের লোকেরা শুনে আসছে, গ্রামের সবাই এটাকে মেনে নিয়েছে। যতদিন না ওটাকে contradict না করা হয়, ততদিন মেনে চলতে হবে যে, ওই গাছে ভূত আছে – এটাকেই বলে ঐতিহ্য। ঐতিহ্যকে খুব উচ্চমানের প্রমাণ বলে মনে করা হয় না, তবে যতক্ষণ না ওটাকে contradict না করা হয়, ততক্ষণ ওটাকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে নিতে হবে।

এখানে ঠাকুর এত কিছু বোঝাতে যাচ্ছেন না, কারণ ঠাকুরের উদ্দেশ্য পুরো অন্য। এখানে ব্রাহ্মভক্তকে যে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে কেন পুনর্জন্ম মানতে হয়, পুনর্জন্ম কিভাবে আছে, এগুলোর মধ্যে ঠাকুর ঢুকছেন না। ঠাকুর এখানে ঐতিহ্য জিনিসটাকে, যেটা পাঁচজন মানেন, গুরুজনরা যেটা বলে আসছেন, যতক্ষণ আপনার কাছে তার বিপরীত জ্ঞান না এসে থাকে ততক্ষণ ওটাকে মেনে চলতে হয়। মেনে চললে সবারই শান্তি আসে, যাঁরা মানেন তাঁদেরও কোন অশান্তি হয় না, আপনারও তাতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল, তার উপর দুটো চারট বই পড়ে নিয়ে, দু-চারটে লেকচার শুনে, নিন্দুকদের কিছু কথা শুনে নিয়ে, আমাদের স্বভাবেই দাঁড়িয়ে গেছে যে, যা কিছু আছে সব কিছুকে গালাগাল দিয়ে দেয়। ঠাকুরে এখানে ঐতিহ্য জিনিসটাকে নিয়ে আসছেন, একটা জিনিস পরম্পরাতে একটা সমাজে চলছে, সেটাকে মেনে নিতে হয়। মানলে সবারই শান্তি হয়। যেমন হিন্দুরা আগে পেঁয়াজ খেত না, এখনও সারা দেশে, বিশেষ করে বাংলাতে তো প্রচুর পরিবার আছে যারা এখনও পেঁয়াজ খায় না, বাড়িতে পেঁয়াজ রসুন ঢোকে না। সেখানে আপনার কি তর্ক করার আছে, আপনি কেন বোঝাতে যেতে চাইবেন যে, মেডিক্যালি পেঁয়াজ-রসুন খাওয়াতে কোন দোষ হয় না। সে এখন মানছে না, ছেড়ে দিন। যখন ওর মনে হবে তখন খেতে দ্বিধা করবে না।

ঠাকুর এখানে কোন অশান্তিতে যাচ্ছেন না, হ্যাঁও বলছেন না, নাও বলছেন না। বলছেন, "**ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝব**"? এরপর ঠাকুর পিতামহ ভীষ্মের কথা বলছেন। মহাভারতের যুদ্ধের সময় অর্জুনের বাণে বিধ্বস্ত হয়ে ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন। পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সবাই ভীষ্মের শরশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে। **তাঁরা দেখলেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল পড়ছে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'ভাই, কি আশ্চর্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদছেন'**। কথামৃতের এই কথাগুলো পড়ার সময় আমার খুব আশ্চর্য লাগে, ঠাকুর মহাভারতও ভাল জানতেন, যা যা বলছেন, কোথাও কোন ভুল নেই, একেবারে perfect বলছেন। 'তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদছেন', খুব ইন্টারেস্টিং সেনটেন্স, যেখানে অর্জুন নিজের দৃষ্টিতে ভীষ্মদেবকে দেখছেন।

সাধারণত ঘোর বিষয়ী মানুষ, শরীরের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে আছে। যদি জেনে যায় যে, তাকে কিছু দিনের মধ্যেই মরতে হবে, শোনার পর কাঁদতে শুরু করে। কিন্তু যারা একটু ওখান থেকে উপরে উঠে এসেছে, তারা অত মৃত্যুকে নিয়ে ভাবে না, তবে এটা ঠিক, আমার মৃত্যুতে অপরের যাতে কষ্ট না হয়, সেটা নিয়ে চিন্তিত থাকে। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ তো সবই জানেন, মজা করে ভীষ্মকে বলছেন, এই দেখুন অর্জুন কি বলছে? তখন ভীষ্মদেব বলছেন, **'কৃষ্ণ, তুমি বেশ জানো, আমি সেজন্য কাঁদছি না। যখন ভাবছি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং ভগবান নিজে সারথি, তাদেরও দুঃখ-বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে করে কাঁদছি যে, ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না'**। ঠাকুর এখান থেকেই শুরু করেছিলেন, ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝব?

ভগবানের কার্য কিছুই বোঝা যায় না – এখানে দুটো জিনিস বুঝতে হবে। মাঝখানে করোনা নিয়ে ঝামেলা শুরু হল, তখন অনেকেই টিপ্পণি দিতে শুরু করলেন – কোথায় তোমাদের ভগবান এখন? ভগবান তো বাঁচাতে পারলেন না কাউকে। সেখানে আমি মজা করে লিখেছিলাম যে, একমাত্র হিন্দুরাই ভগবানকে মৃত্যু রূপেও আরাধনা করেন, আমাদের মা কালী মৃত্যুরূপা। এটা আমাদের কাছে কোন সমস্যা না। গীতাতেও ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ*, আমি কাল, মানুষকে নাশ করার জন্যই আমি এখন এই রূপ ধারণ করেছি। সেটাও ছেড়ে দিন। ভক্তও না, ভক্তের থেকেও অনেক উপরে, যেখানে ভগবান পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যুদ্ধে সারথি, তিনি ঠিক করে দিচ্ছেন কি করবে, কি করবে না, তাঁদেরই দুঃখের শেষ নেই। ঠাকুর ভগবান, সেই ঠাকুরের নরেন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে চারিদিকে কত কষ্ট করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শ্রীশ্রীমা গয়াতে গিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন, হে ঠাকুর, আমার এই ছেলেগুলোর জন্য যেন একটা থাকার জায়গা হয়। আর শ্রীমা সারদাদেবী, যাঁকে আমরা ঠাকুরের লীলাসহধর্মিণী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীরূপে দেখছি, তাঁরই দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই। সেখানে তাঁর ভক্তের আর কতটুকুই বা হবে। আমাদের সমস্যা কি হয়, যে কোন জিনিসকে যখন আমরা বোঝার বা মাপার চেষ্টা করি, সেটা আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে করি। পরে দেখবেন একটা ঘটনা আসবে, ঠাকুর একজনকে কিছু কথা বলার পর ভাল বলাতে বলছেন, একটা থ্যাঙ্ক্যু বল? বলছে, 'থ্যাঙ্ক্যু বললেই কি হয়ে যাবে'? হ্যাঁ, হবে না কেন; বিভীষণকে রামচন্দ্র রাজা করবেন, তখন বিভীষণ বলছেন, আমার রাজ্য-টাজ্য লাগবে না। শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বোঝাচ্ছেন, মুর্খরা বলবে, রামচন্দ্রকে এত সাহায্য করল, কিন্তু কি পেল?

আমাদের বুদ্ধি কার্য-কারণ সম্পর্কে বাঁধা। যেখানেই মানুষের বুদ্ধি লাগবে, সেখানেই দেখবেন শুধু কার্য-কারণ আর কার্য-কারণ। আপনি জীবনে যখনই দুঃখ পাবেন, যখনই কোন কষ্ট পাবেন, দেখবেন তখন আপনি কার্য-কারণের একটা সম্পর্ক তৈরী করে জীবনকে মাপতে যাচ্ছিলেন, দেখলেন ওটা মিলল না। কার্য-কারণ যখন না মেলে তখন আমাদের কষ্টের শেষ আর থাকে না। আমাদের সমস্ত সমস্যার মূলে এই একটি জিনিস – সব জায়গায় আমরা কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি ভক্ত আমার কেন এই রকম হল, আমি সত্যবাদী আমার কেন এত কষ্ট আসছে, আমি রোজ ঠাকুরের জপ করি, আমার কেন কষ্ট হল? কেন তোমার কষ্ট হবে না, ঠাকুর কোথায় বলেছেন যে, যে সত্যি কথা বলবে তার কোন কষ্ট হবে না? ঠাকুর কোথায় বলেছেন যে, আমার যে ভক্ত তার কষ্ট হবে না? ঠাকুর কোথায় বলেছেন, যে আমাকে ভালবাসবে সে মরবে না, তার রোগ শোক হবে না? ঠাকুর যখন মহাভারতের এই গল্পগুলো নিয়ে আসছেন বা হিন্দু পরম্পরাতে যে এত কাহিনী ছড়িয়ে আছে, এটা দেখানো যে, দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-নিরানন্দ, জীবন-মৃত্যু এগুলোর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এই যে কার্য-কারণের সম্পর্ক, তার সাথে আমাদের বুদ্ধি যেমনটি আছে তেমনটি আমরা মাপি।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এ্যারোপ্লেন বানিয়েছিলেন, ওদের বাবা ছিলেন খুব গোঁড়া খ্রীশ্চান। বাবা দুজনকে বোঝাচ্ছেন, খুব নামকরা কথা – ভগবান যদি চাইতেন মানুষ উড়বে, তাহলে তাকে ডানা দিতেন। কারণ আমাদের কাছে ওড়া মানে ডানা। প্রথমের দিকে লোকের যখন ওড়ার চেষ্টা করেছিল, তখন তারা বড় বড় ডানার মত বানিয়ে বাড়ির উপর থেকে ঝাঁপ দিত যদি উড়তে পারে। কিন্তু মানুষের শরীর এমন ভারী যে যে কোন ডানা ওই শরীরকে সামলাতে পারে না। এখন যদিও কিছু গ্লাইডার আদি হয়েছে, কিন্তু সেখানেও দেখবেন ডানাগুলি বিশাল আকারের। আগেকার দিনে এই জিনিস তৈরী করা সম্ভবই ছিল না। রাইট ব্রাদার্সরা এমন একটা মেশিন বানালো, যার ভিতরে ওরা ঢুকে রয়েছে; তার মানে নিজের ডানার ব্যাপারটাই ছেড়ে দিল। এই হচ্ছে ব্যাপার, এটাকে অনেক সময় বলে out of the box thinking। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের যে বুদ্ধি, সেখানে যে কার্য-কারণ সম্পর্ক, এগুলো সব এলাকার পারে, আমরা এই নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি।

ভগবান হলেন শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি কার্য-কারণের বাইরে। আমরা যে এই নানা রকমের জিনিস ভাবতে থাকি – ভগবান এটা কেন করলেন, এটা কি করে করলেন? এই ধরণের প্রশ্ন যারা করে, এদের থেকে বোকা কেউ হতে পারে না। যখন আমরা বলি, ঠাকুরের ইচ্ছা বা ভগবানের ইচ্ছা, যদি আপনি এটা বলতে চাইছেন যে, বাপু আমার কাছে এর কোন উত্তর নেই এটা কেন হচ্ছে, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু যদি বলেন, আমার ভাল টাকা-পয়সা হয়েছে, ঠাকুরের কৃপায় হয়েছে, একদিক থেকে যদি এই কথা বলেন যে, আমি পূর্ণ সমর্পিত; তাহলে আপনার ছেলে যদি মারা যায়, তখন আপনাকে বলতে হবে, ঠাকুরের কৃপায় এই রকম হয়েছে। কিন্তু সেখানে আপনি বলেন না। ঠাকুরের ইচ্ছা বলার যদি অর্থ হয়, আমার কাছে উত্তর নেই, তাহলে ঠিক আছে। অন্য কোন অর্থে নিলে বুঝতে হবে, কোথাও আমরা দু-নম্বরী করছি। কারণ ঈশ্বরের কার্য কখনই বোঝা যায় না। যাঁরা বলেন, ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের কৃপা; ঠাকুর বলছেন, খুড়ী জ্যাঠীদের কোঁদল শুনে এই কথাগুলো বলছে, এর কোন দাম নেই। যাঁরা ঈশ্বরের পথে এসে গেছেন, আসার পরেও যদি এমন কিছু ব্যবহার করেন, যেখানে বলছেন এটার কোন দাম নেই, তখন এগুলো ভাল কথা না।

তারপরে আরও সমস্যা হয়, শুধু কার্য-কারণ থাকে না, আমরা নিজের মত বার করে নিই। দুটো শালিক দেখলে দিনটা ভাল যাবে, একটা শালিক দেখলে এই রকম হবে, তিনটে শালিক দেখলে ঝগড়া হবে, এগুলো আপনি নিজের মন থেকে বানিয়ে নিয়েছেন। এসব ঐতিহ্য শ্রেনীতে পড়ে না, শাস্ত্র প্রমাণ তো কোন মতেই না। ঠাকুর সেইজন্যই বলছেন, ভগবানের কার্য কিছুই বোঝা যায় না। এখন জন্মজন্মান্তর আছে কি নেই, এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে কি করে আমরা বলব! শাস্ত্র যদি মেনে চলেন খুব ভাল, যদি না মানেন তাও খুব ভাল, যদি তাতেই আপনার মনের শান্তি হয়ে যায়, খুব ভাল, এই নিয়েই থাকুন। পরে আবার দেখা যাবে, এগুলো যদি না নেওয়া হয়, তাতেও কত রকম অশান্তি হয়।

এরপর সমাজগৃহে সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হয়েছে। উপাসনান্তে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়ে জগন্মাতাকে প্রণাম করতে করতে বলছেন – "**ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম**"। আমাদের একজন মহারাজ খুব মজা করে এখন যারা বেশি বেদান্ত নিয়ে ফটর ফটর করে, এদেরকে বলতেন, এরা হচ্ছে ইদানীং কালের ব্রহ্মজ্ঞানী। ঠাকুরও যে ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম বলছে, তিনি প্রশংসার সুরে বলছেন না। এখানেই সপ্তম পরিচ্ছেদ শেষ। এর পরের যে পরিচ্ছেদ তাতে ঠাকুরের সার্কাসে যাওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। দিনটা হল ১৫ই নভেম্বর। এতক্ষণ ২৮শে অক্টোবরের কথা হচ্ছিল।